প্রবন্ধ-সংকলন

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রবন্ধ-সংকলন

সম্পাদক
নিখিল সেন

এভারেস্ট বুক হাউস
কলিকাতা ১২

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম যে সকল মনীষী তাঁহাদের লব্ধ ও অধীত বিদ্যার দ্বারা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আচার্য রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থগুলির কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ও হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্কলন তাঁহাকে অমর করিয়াছে। এই সব্যসাচী সাহিত্যস্রষ্টার বাংলা প্রবন্ধগুলি এতকাল সাময়িক পত্রিকার পাতা হইতে যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই ইহা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। শ্রীমান নিখিল সেন রমেশচন্দ্রের তিরোভাবের ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে যে বাঙালীর এই কলঙ্ক ক্ষালন করিলেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে রমেশচন্দ্রের চারিটি সাহিত্য বিষয়ক, একটি সুদীর্ঘ ঋগ্বেদ সম্পর্কিত এবং কয়েকটি জাতিগঠনমূলক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত এতদিনে বঙ্গীয় সুধীজনের নিকটে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন—ইহা মন্দের ভাল। এই গ্রন্থ বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান পাক ইহাই কামনা করি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তার সার্বজনীনতা। সমাজের, অভিজ্ঞতার এবং মননশীলতার এমন খণ্ডীভবন ও বিশেষীকরণ তখন ছিল না। বস্তুতঃ সে যুগের সকল চিন্তানায়কের রচনা অনুশীলন করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পাতা ওলটালে দেখা যাবে, তার মধ্যে যেমন একদিকে গল্প উপন্যাস ও কিছু কবিতাও ছাপা হচ্ছে তেমনি ছাপা হচ্ছে—বরং প্রচুরতরভাবে ছাপা হচ্ছে—ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণা। বাঙালীর মন তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাড়া পেয়ে দিকে দিকে সকল বিষয়ের পুনর্বিচার করতে ছুটেছিল, সে খতিয়ে দেখছিল এতদিন যে সমাজ যে ধ্যান-ধারণা যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ছিল তার মূল্য কি। উনবিংশ শতাব্দীই হল এই পুনর্বিচারের যুগ, দিকে দিকে তার পরিচয়। রামমোহন রায় এর প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে শুধু যে হিন্দুধর্মের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে মোহমুক্ত বুদ্ধির উদার অনুশীলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, সমাজের ক্ষেত্রেও যে নতুন তাগিদ আসছিল সে তাগিদও তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি চিরাচরিত জমিদারী ছাড়াও নানারকম ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। বহু পরে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা চিন্তা করলেও দেখা যায়, তিনি একাধারে লিখেছেন, বাংলা গদ্য ও বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি করেছেন, ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, রাজনীতি সম্বন্ধে লিখেছেন, কৃষকের অবস্থা আলোচনা

করেছেন। আর উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল গিরিশৃঙ্গের মধ্যে যিনি গৌরীশঙ্করের মত বিদ্যমান সেই বিদ্যাসাগরের কথা আলোচনা করলে তো একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার ও নতুন রূপদান তাঁর সুমহৎ কীর্তি, এরই জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি আরও অনেক বড়; দিকে দিকে সমাজের সংস্কার—বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ, অব্রাহ্মণকে সংস্কৃত কলেজে পাঠদানের সুযোগ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা—কোন্ দিকে তাঁর সুমহৎ কীর্তি আজও তাঁর জয় ঘোষণা করছে না? এইভাবে গত শতাব্দীর সকল বড় বাঙালীর কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, তাঁদের চিন্তা ভাবনা ও আগ্রহ কোনও একটী বিশেষ বিষয়ের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতেই আটকে যায় নি, নানাবিষয়ে তাঁরা চিন্তা করেছেন এবং যেসব বিষয়েই চিন্তা করেছেন সেইসব বিষয়েই তাঁরা কিছু না কিছু নতুন আলোকপাত করে গিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র দত্তও এই কথার ব্যতিক্রম ন'ন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন রাজপুরুষ, সরকারী কর্মচারী। সে যুগে ভারতীয়দের দুর্লভ নানা সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন, কমিশনার হয়েছিলেন, নানা উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল সরকারী নথিতে ভাল ভাল মন্তব্য লিখে গেলেই পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা সে নিষেধ মানে নি। তাঁর জাগ্রত চিত্ত বহুদিকে ধাবিত হয়েছিল। এই বাংলা সংকলনে তাঁর ইংরেজী রচনার কোনও উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই বাংলা সংকলনেই যে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে সেগুলি বিষয়ানুক্রমিক সাজালে দেখা যায়, প্রবন্ধগুলি অন্ততঃ তিনটি বিভাগে পড়ে—(১) সাহিত্যিক (২) সামাজিক-অর্থনৈতিক (৩) পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। এর সঙ্গে তাঁর উপন্যাস, কবিতা —বিশেষতঃ ইংরেজী কবিতা—এবং অন্যান্য রচনার কথা চিন্তা করলেই তাঁর প্রতিভার বহুমুখীনতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

রমেশচন্দ্রের যে প্রবন্ধগুলি এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি পড়লেও লক্ষ্য করা যাবে, সকল সময়েই রমেশচন্দ্রের রচনার মধ্যে দুটী লক্ষণ খুবই পরিস্ফুট। প্রথমটী হল তাঁর মোহমুক্ত বিচারশীল মন। দ্বিতীয়টী হল, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"মনুষ্য দেহের সৌন্দর্য বল তেজ ও গৌরব সমস্তই মৃত্যুর পর লোপ প্রাপ্ত হয় এবং অবয়বখানি বিকৃত ও পূতিগন্ধপূর্ণ হয়,—জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্মও সেইরূপ সৌন্দর্য পবিত্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া জঘন্য আচার ব্যবহারে পরিবৃত হয়।" বস্তুতঃ রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অনুবাদ এবং সে সম্বন্ধে নানা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তারও মূলে আছে এই বিচারবুদ্ধি। তিনি নিজেই লিখেছেন, "বাঙালীমাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্মে দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্মব্যবসায়িগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,—গলাবাজিতে পয়সা আসে।...এসময় বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিনি বলিলেন, 'ভাই,—উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর।'...পাঠকগণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন?"

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : পৃঃ ১৫]

এই গ্রন্থে সংকলিত তাঁর 'ঋগ্বেদের দেবগণ' নিবন্ধেও এই মনের পরিচয় আছে।

সাহিত্যিক যে প্রবন্ধগুলি এখানে সংগৃহীত হয়েছে তার সাহিত্যিক মতামতের মূল্য পাঠকেরা সহজেই বিচার করতে পারবেন, সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটীর উল্লেখ করি। বর্তমান কালে

প্রমথ চৌধুরীর মত একজন দিক্‌পাল ভারতচন্দ্রের চরম সুখ্যাতি করে গিয়েছেন। তাঁর মতের অমর্যাদা না করেও বলা যায় ভারতচন্দ্রের মূল্য পুনঃ নিরূপণের যথেষ্ট অবকাশ আছে। রমেশচন্দ্র সাহিত্যিক তত্ত্ব বা অলংকার শাস্ত্রের বিচারে কাব্যবিচার করেন নি, কিন্তু তাঁর সহজ অনুভূতির কষ্টিপাথরে বিচার করে তিনি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা ভাল করে পড়ার যোগ্য। অন্য কতকগুলি সাহিত্যিক প্রবন্ধে সাহিত্য বিচারও আছে, ইতিহাস বিচারও আছে। যেমন সমাজবিজ্ঞানীর চোখে তিনি 'উন্নতির যুগ' বিচার করেছেন। এক অতি বিস্তৃত পটভূমিকায় ইতিহাসের নির্যাস তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—যে রকম বিরাট পটভূমিকা আজকালকার রচনায় প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

৩.

এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক রচনা ও দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাঁর মতামত প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা দরকার। গত যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র অনন্য—হয়তো শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁরা তাঁর The Economic History of India দুই খণ্ড পড়েছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন কি গভীর পাণ্ডিত্য, কি অসাধারণ পরিশ্রম, কি অপূর্ব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থখানিতে। রাজকর্মচারী হয়েও তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের শোষণের যে নগ্নরূপ নানা তথ্যপ্রমাণাদি সহ উপস্থিত করেছেন তার তুলনা সহজে মেলে না। এই দিকে তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ—তাঁর এই বিষয়ের রচনাবলী যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তিনি যে মত পোষণ করতেন তার অনেকখানি পরিচয় এই গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটী

অর্থনৈতিক প্রবন্ধের মধ্যে মিলবে। বারবার তিনি বলেছেন ঃ "ভারত-বাসীকে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের শিল্প তাহাদের কৃষির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া উচিত।" ইংলণ্ড হতে যে নিদারুণ শোষণ হচ্ছিল তারও পরিচয় কয়েকটি প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। ভূমিকর সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের একটী বিশিষ্ট মত ছিল। তিনি বারবার বলেছেন, ভূমিরাজস্ব কম এবং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং ভূমিকর সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তিনি যে কালে এই কথা বলেছিলেন সেই কালের পটভূমিকা হতে বিচ্ছিন্ন করে এ কথার বিচার করা উচিত নয়। সেকালে দেশে শিল্প ও অন্যান্য জীবিকা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, কৃষিই ছিল জীবনের প্রধানতম অবলম্বন। একটা সুনির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধির অভাবে এইদিকে যা আয় হয় তা সবই যদি কৃষকের হাত হতে অপরের হাতে চলে যায় তাহলে কৃষকদের দুরবস্থা হবে একথা সহজেই অনুমেয়। সেইজন্যই রমেশচন্দ্র এবিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ও স্থায়ী সীমানা নির্দেশ করার কথা বলেছিলেন। আজ দেশের অবস্থা বদলেছে, অন্যান্য জীবিকা গড়ে উঠছে, অন্যান্য কারণ দেখা দিয়েছে, সমাধানও হয়তো অন্য পথে হবে —কিন্তু যে যুগে যে অবস্থায় রমেশচন্দ্র এই কথাটা বলেছিলেন সেই যুগে সেই অবস্থায় এ কথাটা প্রণিধানযোগ্য ছিল।

৪.

রমেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় একটী সংকলন গ্রন্থে দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ তাঁর অনেক রচনাই ইংরেজীতে। বাংলা রচনার মধ্যেও উপন্যাসগুলির পরিচয় এই প্রবন্ধ সংগ্রহে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু যেগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তা হতে রমেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার অনেকখানি নিদর্শন পাওয়া যাবে। তা হতে আগ্রহান্বিত হয়ে যদি অনেকে রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনা পাঠ করেন তাহলে দেশের প্রভূত মঙ্গল।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

নিবেদন

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তকে আমরা জানি, সুদক্ষ সিভিলিয়ানরূপে। প্রথম বাঙালী বিভাগীয় কমিশনার। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও আমাদের নিকট অপরিচিত নন্। বাংলায় তিনিই প্রথম 'শতবর্ষ উপন্যাস'-এর প্রবর্তক। তাঁর 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-র সঙ্গে কম-বেশী কোন বাঙ্গালী পাঠকের না পরিচয় নেই? ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত। এই ক্ষেত্রে তিনি উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর সাধক। তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে তাঁর কুন্দনন্দিনী বা রোহিনীকে পরিশেষে খুন করেই সব সমস্যার সমাধান করেছেন, রমেশচন্দ্র সে সহজ সুলভ পথের আশ্রয় নেন নি। তিনি তাঁর পরিণত বয়সের সামাজিক উপন্যাস 'সমাজ', 'সংসার' বা 'সংসার-কথা'-য় বিধবা বিবাহ আর অসবর্ণ বিবাহের দুঃসাহসিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। খামাকা খুন খারাপির আশ্রয় নিয়ে সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজেন নি। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে উপন্যাস-সম্রাটের এখানটায় পার্থক্য।

কবি রমেশচন্দ্র দত্তও বিশেষ করে তাঁর ইংরেজী কাব্য ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ, Lays of Ancient India, Mahabharata, বা Ramayana-র জন্য শিক্ষিত পাঠকের নিকট আশা করি আদৌ অপরিচিত নন। রমেশচন্দ্র ইংরেজী ও ক্লাশিক্যাল সাহিত্যের জারক রসেই জারিত। কবি মধুসূদনের মত তিনিও প্রথম ইংরেজীতে লিখতে শুরু করেন এবং রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র Bengal Magazine ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Mookerjee's Magazine-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। Arcydae ছিল তাঁর ছদ্মনাম।

রমেশচন্দ্র তাঁর ইংরেজী রচনা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীলও ছিলেন। মাইকেলের মত 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' বলে খেদোক্তি করেননি। বরং লণ্ডন থেকে তিনি তাঁর দাদাকে ১৯০৩ সনে এক পত্রে জানিয়েছিলেন: 'My fame as an English writer may live or perish early;

but so long as it lasts it will be connected with three works—my 'Civilisation', my 'Epics' and my 'Economic History'. [*Life and Work of R. C. Dutt : J. N. Gupta. Pp. 307*].

রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীর একটা তালিকা আমরা পরে দেবার চেষ্টা করব। তাঁর ইংরেজী রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ইংলণ্ড থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক মাক্স্‌মূলার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের উপক্রমণিকা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

'পৃথিবীতে এরূপ সুবৃহৎ প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয় দুর্লভ। দত্ত মহাশয় তাঁহার অনুবাদ পুস্তকে এই গ্রন্থের সারাংশ যেন ফটোগ্রাফ্ যন্ত্রে প্রতিবিম্বাঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন ভারতের আর্যগণ বিস্ময় ভক্তি সহকারে যে সকল মহাত্মার কীর্তন করিয়াছেন, এখনও করিয়া থাকেন, তাহা দত্ত মহাশয় আজ পাশ্চাত্ত্যগণেরও সম্যক বোধায়ত্ত করিলেন।'

শুধু ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ নয়, রমেশ দত্তের, The Peasantry of Bengal (1874) ; The Economic History of India, (1759-1827), India in the Victorian Age (1837-1900) প্রভৃতি দুরূহ তথ্যপূর্ণ অর্থনৈতিক গ্রন্থের জন্যও তিনি কি দেশে কি বিদেশে, সর্বত্র অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছেন।

বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একদা বঙ্কিমচন্দ্র অনুযোগ করেছিলেন। লিখেছিলেন :

"বাংলার ইতিহাস আছে কি? সাহেবরা বাংলা ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত ভারী যে ছুড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্সাল লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাংলার ইতিহাস লিখিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলে বাংলার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাংলার প্রকৃত ইতিহাস নাই।"

"বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" [বঙ্গদর্শন (১২৮৭)]

বাংলার সাহিত্যকারের ইতিহাস চাই। আর এ ইতিহাস শিক্ষিত বাঙালীকেই লিখতে হবে। তাই বুঝি রমেশচন্দ্র ইতিহাস রচনায় ব্রতী

হয়েছিলেন। তবে তিনি কেন প্রথমে ইংরেজীতে ইতিহাস লিখতে সুরু করেছিলেন, এর জবাব লোকেন্দ্রনাথ পালিত দিয়ে গেছেন 'সাধনা' (১২৯৯ মাঘ) পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন: "যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলা ভাষায় লিখিতেন না ?"

রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য-রসিক মনের আর একটি নিদর্শন তাঁর 'The Literature of Bengal' (1877) গ্রন্থখানি। Ar. Cy. Dae. ছদ্মনামেই পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং বইখানি উৎসর্গ করা হয় তাঁর কাকা কবি রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুরকে। ১৮৯৫ সনে বইখানির পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণে লেখকের পুরো নাম ছাপা হয়েছিল। নব আবিষ্কৃত তথ্য বা কোন সমস্যার নতুন মীমাংসা না থাকলেও যথার্থ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টির প্রথম স্বাক্ষর মেলে বইখানিতে। জাতীয় আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রমেশচন্দ্র এই পুস্তকে শুধু বাংলার সাহিত্যের নয় বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসও চিত্রিত করেছেন। তাঁর কথায়:

"The literature of every country, slowly expanding through successive ages, reflects accurately the manners and customs, the doings, and the thoughts of the people. And thus, although no work of a purely historical character has been left behind by the people of Ancient India, it is possible to gain from their works on literature and religion a fairly accurate idea for their civilization and the progress of their intellect and social institutions."

এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বুঝি রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—'To trace as far as possible the history of the people, as reflected in the literature of Bengal'. সমালোচকদের নিকট বইখানি বাংলার সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস বলেই পরিগণিত। বিদ্বৎ সমাজেও বইখানি সমাদৃত হয়েছিল।

এই পুস্তকে লেখক বাঙ্গালী জাতির পর পর তিনটি যুগ নির্ণয় করে গেছেন। প্রথম যুগ, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগ, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যুগ। দ্বিতীয় যুগ, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬০০ শতাব্দীর

শুরু থেকে ১৮০০ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত। এই যুগ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরমণি, কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের যুগ আর তৃতীয়, অর্থাৎ বর্তমান যুগের সূচনা, উনিশ শতকের শুরু থেকে। এই যুগ হোল রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের।

স্বদেশের ইতিহাস ও স্বদেশের সাহিত্যের নব প্রেরণায় রমেশচন্দ্র শুধু উদ্বুদ্ধ হননি, ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচারিত করতেও তিনি ছিলেন উন্মুখ। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ও সাহিত্যের প্রতীক তাঁর রচিত ইংরেজী গ্রন্থগুলি ইংলণ্ড থেকে তিনি নিজে অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রিত করে স্বল্প মূল্যে বিতরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

শুধু সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়, কর্মজীবন থেকে দীর্ঘকাল ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডে বসে স্বদেশ সেবা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ নিয়ে দেশময় প্রচণ্ড আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। রমেশচন্দ্র বিলেতে থেকে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ভারতের রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৮৯৮ সনে নভেম্বর 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি যে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার খানিকটা অনূদিত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি:

'ভেবে দেখলে ভারতবর্ষের প্রজাগণের ঘরে এখন বলতে যা কিছু আছে, তা তাদের পুরবধূগণের গাত্রাভরণ, দুই-দশ ভরি স্বর্ণ রৌপ্য মাত্র। এই এখন ভারতের জাতীয় ধনসম্পত্তি। কৃত্রিমতায় রৌপ্যমুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি করে গভর্নমেণ্ট ভারতের এই জাতীয় যথা সর্বস্বের অনূন্য এক পঞ্চমাংশের বিলোপ সাধনে সমুদ্যত। যারা একে নির্ধন তাদের প্রতি আবার এরূপ আচরণ করলে, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হবে। (২) ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে পঞ্চমাংশের প্রায় চতুরাংশ প্রজা, হয় প্রত্যক্ষে নয় পরোক্ষে কৃষিজীবী। এই দরিদ্র দুরবস্থাগ্রস্থ প্রজাগণ প্রায়শঃ রৌপ্য মুদ্রাতেই রাজকর দিয়ে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ঐ মুদ্রার মূল্য বর্ধনে প্রকারান্তরে তাদের করবৃদ্ধি করা হবে—সে ত মুমূর্ষের অঙ্গে অসি প্রহার মাত্র; ইত্যাদি।'

তখনকার ভারত-সচিব মর্লের সঙ্গে রমেশচন্দ্র যখন রয়াল কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন তখন তাঁর দেশের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে সব পত্র বিনিময় হয়েছিল, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের Speeches

and Papers (in 2 Vols.) বিশেষ করে স্মরণীয়। বিলেতে বসে কলিকাতা 'মিউনিসিপাল বিল' সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যে ভাবে বৃটিশ জনমত গঠনের সহায়তা করেছিলেন তাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখন এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিলেন:

"দত্ত মহাশয় লর্ড জর্জ হ্যামিলটন এবং সর্ হেনরি ফাউলার প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্লামেণ্টের সভ্যগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, এবং তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করার আয়োজন করেছেন। 'কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল' সম্বন্ধে যদি আকাঙ্ক্ষিত বা কোন পরিবর্তন ঘটে মহাত্মা দত্ত মহাশয়েরই স্বদেশহিতব্রতের শুভ ফল জানিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের কথায় সত্যি বলতে হয়, "তাঁহার (রমেশচন্দ্র দত্তের) চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ।"

[চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে' রমেশচন্দ্র-স্মৃতি-সংগ্রহে রক্ষিত।]

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব, এমন কোন দিক নেই যা উনিশ শতকের শেষ অর্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রমেশচন্দ্রের প্রসাদ-গুণে পুষ্টিলাভ করেনি। যদিও অধিকাংশ রচনা তাঁর ইংরেজীতে, বঙ্গ-ভারতীর আরাধনাতেও তিনি কখনও বিরত ছিলেন না। কিন্তু রমেশচন্দ্রের প্রতিভার স্বীকৃতি কেবল তাঁর রচিত উপন্যাস কয়টি আর 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র অনুবাদ-সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। প্রাবন্ধিক রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিভা-দীপ্তির সম্যক স্বীকৃতি লাভ হয়েছে কই? 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য'-র ইতিহাসে প্রবন্ধকার রমেশচন্দ্রের স্থান দূরে থাক, নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই কেন?

অবশ্য, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ইতিহাসের সূচনা তখন খুব বেশী দিনকার নয়। উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুরের মিশনারী পাদরী কেরী আর

মার্শম্যান ও তাঁদের সাহায়ক রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রমুখদের দৌলতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। বাংলা গদ্য তার চলার সহজ গতি লাভ করে তখনকার সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন,' (এপ্রিল, ১৮১৮), 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮) আর 'তত্ত্ববোধিনী' (আগস্ট, ১৮৪৩) প্রভৃতির মারফৎ। যুগপুরুষ রাজা রামমোহন ও তাঁর বৈদান্তিক ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের কাঠামো পরিণতি লাভ করে। বস্তুতঃ 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখকগণ বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনার যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, তাই পরে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে পরিপুষ্টি দান করেছিল বলা চলে। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন নানা দিক থেকে। সে যুগের নাম করা প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে ছিলেন অগ্রণী। বাংলা সাহিত্যের 'সব্যসাচী'রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখদের হাতে বাংলা গদ্য সত্যই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তারপর মে, ১৮৭২ সনে আত্মপ্রকাশ করল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্গদর্শনের প্রধান প্রাবন্ধিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আর তাঁর প্রধান সহায়কদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকবর্গ। ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'বান্ধব' পত্রের মারফৎ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়তা করেন। এ যুগেই ইংরেজী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, মেধা ও প্রতীভা-দীপ্তি নিয়ে বাংলা গদ্য তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের আসরে হলেন অবতীর্ণ। রাজকর্মের গুরুদায়িত্বের মধ্যে তিনি বঙ্গ-ভারতীর বিশেষ সেবা করে যেতে পারেন নি। লিখতে পারেন নি অজস্র। তবু যে কটি প্রবন্ধ নিবন্ধ তিনি লিখে গেছেন, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তা অতুলনীয়। রমেশচন্দ্রই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বেদ ও অর্থনীতি বিষয়ক দুরূহ শাস্ত্রের সক্ষম আলোচনা শুরু করেন। 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র ঋকগুলি সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্রের হাতে কী সহজ সাবলীলতার সঙ্গেই না বাংলায় রূপায়িত হয়েছে! 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র তিন শতাধিক পৃষ্ঠার মূল্য ছিল মাত্র দশ আনা। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'ঋগ্বেদে দেবগণ'-এ প্রাচীন আর্যসভ্যতার কি সুন্দর আলেখ্যই না তিনি তুলে ধরেছেন ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি প্রস্তাবে।

শ্রাবণ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ থেকে বৈশাখ, ১২৯৩ পর্যন্ত 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর অব্রাহ্মণ হয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু ধর্মের আলোচনা করতে গিয়েছিলেন বলে 'কূপমণ্ডুক' গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাতে নির্যাতনও তাঁকে কম পেতে হয়নি। তিনি কিন্তু তাদের গলাবাজীতে ক্ষান্ত হননি। বিদ্যাসাগরের কথা: 'ভাই উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর'—শিরোধার্য করেই বুঝি এগিয়ে গিয়েছিলেন আপন সংকল্পে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদা তাঁর 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রমেশচন্দ্রকে। রমেশচন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন: 'আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গলা রচনাপদ্ধতি জানি না!'

রমেশচন্দ্রের এই জবানবন্দী দিয়েই আমরা এই 'প্রবন্ধ-সংকলন' শুরু করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় তিনি বাংলা লিখতে শুরু করেছিলেন। উপন্যাস রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়:

"সাহিত্য আমার বিষাদ সময়ের চিত্তপ্রসাদন, নির্জনতায় শান্তি বিধায়ক এবং অবিরাম শ্রমসার কর্মক্ষেত্রে একমাত্র বিশ্রামভূমি। দক্ষিণ শাহবাজপুরের জলপ্লাবনান্তে যখন আমি তথায় গিয়া প্রান্তরে পট্টবাস সংস্থাপন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, সে সময়ে আমি প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে একাকী বসিয়া গ্রাণ্ট্ ডফ্ কৃত সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পাঠ করিতাম, এবং অনেক সময়ে এরূপও ঘটিত যে, শিবাজীর কোন চরিত্রকাহিনী চিন্তা করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল! আমি যখন ত্রিপুরা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করি, তখন টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসখানা সততই আমার কাছে থাকিত। এই সময়ে আমি প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলাম।"

'নবজীবন' (অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত), 'নব্যভারত' (দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত), 'ভারতী ও বালক' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত),

'সাধনা' (সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'মুকুল', 'ভারতী', 'ভাণ্ডার', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় রমেশচন্দ্রের বহু রচনা ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা সাময়িক পত্রের একনিষ্ঠ সেবক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলীর মোটামুটি একটা তালিকা 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় (ক্রমিক সংখ্যা ৬৬) লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সম্প্রতি কোন কোন 'লেখক' ব্রজেন বাবুর শ্রমলব্ধ সাহিত্য সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার নতুন তালিকা সংকলনেও প্রয়াসী হয়েছেন। ['রমেশচন্দ্র দত্ত ও মনন সাহিত্য'— 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৬৬]

এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষে রমেশচন্দ্রের লেখা স্বনামে বা ছদ্ম-নামে যে প্রকাশিত হয়নি, সঠিক তা বলা যায় না। সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, পুরাতত্ব বিষয়ে এ সব প্রবন্ধাবলীতে রমেশচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, মনীষা ও স্বদেশপ্রেমের শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এমন নয়, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় নবজাগৃতির প্রতিচ্ছবিটিও প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়।

ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ হয়েছে ; সংক্ষিপ্ত সংস্করণেরও অভাব হয়নি। কিন্তু প্রাবন্ধিক রমেশচন্দ্র আজ অপাংক্তেয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী আজও কোন পুস্তকাকারে স্থান পায়নি। জীর্ণ কীটদষ্ট এই সব সাময়িক পত্রের পুরাতন ফাইল থেকে ধূলা ঝেড়ে পুস্তকাকারে আজও প্রকাশিত হয়নি এমনি সব প্রবন্ধ সংকলন করে এই 'প্রবন্ধ-সংকলন' প্রকাশ করা গেল। রচনাগুলি বর্তমানে একরূপ অপ্রাপ্য। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বাংলা প্রায় সব কটি প্রবন্ধই এই সংকলনে চয়ন করা হয়েছে শুধু 'ভারতী'তে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) প্রকাশিত 'হিন্দু দর্শন', 'ভাণ্ডারে' প্রকাশিত (ফাল্গুন, ১৩১২) 'বারাণসী শিল্পসমিতি' সঞ্চয়ন নিবন্ধটি এবং 'দুদিনের স্বদেশ যাপন' ('ভারতী' ১৩০৭) ছাড়া। 'নব্যভারতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (১২৯৭ পৌষ-বৈশাখ ১৩০০) রমেশচন্দ্রর 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। আর এই অনুবাদ রমেশচন্দ্রের নিজেরও ঠিক করা নয়। তাই এই সংকলনে সংযোজিত করা হয়নি। বারান্তরে করবার সংকল্প রইল। সেই সঙ্গে রমেশচন্দ্রের সচিত্র ভ্রমণ

কাহিনী 'অমৃতসর' ও 'উড়িষ্যা' প্রবন্ধ দুটিও ('মুকুল'—আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩০২) আর 'ইয়োরোপে তিন বৎসর' ('Three Years in Europe'—ভগবানচন্দ্র দাস অনূদিত) গ্রন্থটিও প্রকাশ করার বাসনা রইল।

রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এই প্রবন্ধ সংকলন করতে গিয়ে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত মহাশয়ের। বস্তুতঃ 'সনৎদা'র অকৃপণ ও অকৃত্রিম সহায়তা লাভে বঞ্চিত হলে এ-সংকলন আদৌ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। বেলভেডিয়ার জাতীয় পাঠাগারের এ্যাসিস্টাণ্ট লাইব্রেরীয়ান সুলেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর আদিত্য ওহ্‌দেদার এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুও নানাবিধ তথ্যের সন্ধান ও উপদেশ দিয়ে আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে রমেশচন্দ্র দত্তের এই 'প্রবন্ধ-সংকলন'-এর সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে শুধু কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন নি, মনীষী রমেশচন্দ্রের প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিই অর্পণ করেছেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। রমেশচন্দ্রের চিত্রের ব্লকটি 'বিশ্ব-ভারতী' গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এজন্য পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীসুশীল রায় ধন্যবাদার্হ!

এই প্রসঙ্গে 'এভারেস্ট বুক হাউসে'র কর্তৃপক্ষ বন্ধুবর শ্রীবিভূতি ঘোষের এই প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশে উৎসাহ ও উদ্যোগের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই সংকলনের নির্দেশিকাটি নানা কাজের ফাঁকে তৈয়ারী করে দিয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন শ্রীমতী আরতি সেন। তাঁকে অবশ্য আনুষ্ঠানিক সৌজন্য জ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন। আর পাণ্ডুলিপি অনুলেখনের ব্যাপারে অশেষ সহায়তা পেয়েছি কল্যাণীয়া সন্ধ্যা সেনের কাছ থেকে।

মনীষী রমেশচন্দ্রের অর্ধশত মৃত্যুবার্ষিকী (জন্ম: ১৩ই আগস্ট, ১৮৪৮: মৃত্যু: ৩০শে নভেম্বর, ১৯০৯) উপলক্ষ্যে এই 'প্রবন্ধ-সংকলন' প্রকাশ করা গেল। পুস্তকাকারে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত এই রচনাগুলিকে নানান জীর্ণ

পুরাতন পত্রিকার ফাইল থেকে (অনেক ক্ষেত্রে কীটদষ্ট ও পাঠোদ্ধারে সম্পূর্ণ অসমর্থ) উদ্ধার করে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে হয়েছে। সতর্কতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দু'এক ক্ষেত্রে যে ভুলত্রুটি থেকে যায়নি, এমন নয়। প্রেসের সহযোগিতার একান্ত অভাবে মুদ্রাকর প্রমাদও কিছু কিছু থেকে গেছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে তা ক্ষমার চক্ষে দেখবেন। আমার কাজ সংকলকের; কেবল পরিবেশকের। সাধারন পাঠকের নিকট—বিশেষ করে ছাত্র মহলের নিকট—রমেশচন্দ্রের সাহিত্য: অর্থনীতি: ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব বিষয়ক এই 'প্রবন্ধ সংকলন' সমাদর লাভ করলেই, শ্রম সার্থক মনে করব। রমেশচন্দ্রের বাংলা-ইংরেজী রচনা নিয়ে বহু এষণা ও গবেষণার আজ অবকাশ রয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা
কলিকাতা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৯

নিখিল সেন

আপন কথা

রমেশচন্দ্র তাঁর বাল্যচরিত সম্বন্ধে স্বয়ং লিখেছেন ঃ

'আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব (ঈশানচন্দ্র দত্ত) ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে বাঙ্গলার নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলাম। সেই সব শৈশবের বৃত্তান্ত স্মরণ হলে আমার এখনও বড় আনন্দ হয়। তখন এদেশে রেলগাড়ি চালু হয়নি। সে বড় সুখের দিন ছিল। এখন কলিকাতা হ'তে লাহোর বা বোম্বাই যেতে যত সময় লাগে তখন, এমন কি, যশোর যেতে হলেই তার বেশি সময় লাগত। কারণ, পাল্কী বা নৌকা ছাড়া যাতায়তের অন্য কোনরূপ উপায় ছিল না। ফলে তখনকার লোকে এখনকার মত এত বেশী দেশ দেখতে পেত না বটে, কিন্তু অল্প যা দেখত, তাতেই তাদের শহর, পল্লী, পথ ঘাট, হাট-বাজার নদী নালা, ইমারত দেবমন্দির ইত্যাদি নানাপ্রকার দৃশ্য দেখবার অধিকতর সুযোগ সহজেই ঘটত। আমরা উক্তরূপ যানেই বীরভূম গিয়ে সেই সুখকর স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করি। আমার জননীর হিন্দু ধর্মে বড়ই নিষ্ঠা ছিল; তাঁর সঙ্গে আমি একবার বক্রেশ্বর তীর্থের প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে গিয়েছিলাম।

'এর কিছুদিন পরে আমরা কুমারখালীতে এবং তারপরে বহরমপুরে যাই। উভয় স্থানেই আমি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। বাঙ্গলার সর্বপ্রথম ছোটলাট স্‌র ফ্রেডরিক্ হ্যালিডে বাহাদুর বহরমপুরে যে দরবার করেছিলেন, তাতে আমার পিতার ও তত্রত্য অপরাপর রাজ কর্ম্মচারিগণের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তখন আমি দরবার বা রাজনৈতিক কোন ব্যাপারের কিছু মর্ম বুঝতাম না; আমার মনে হয়েছিল কেবল সে প্রদেশের সুশ্যামল ক্ষেত্র ও পল্লীসমূহের শান্তিময় সৌন্দর্য। সে বড় সুখের দিন ছিল, বিষম ম্যালেরিয়া শক্র তখনও বঙ্গদেশ অধিকার করে নাই। এদেশের জলবায়ু তখন বেশ স্বাস্থ্যকর, এবং লোকও সব সুস্থ, সরল ও সদানন্দ; তাতে তাদের মানসিক বৃত্তিরও বেশ উৎকর্ষ লাভ হত।

'তার পরে আমরা আমাদের জনক জননীর সঙ্গে পাবনায় গিয়ে দুই বৎসর বাস করি। সে সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 'সিপাহী বিদ্রোহ' উপস্থিত; প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন যুদ্ধ সংবাদ আসত। কোম্পানী বাহাদুর পাবনাতে

একদল ফৌজ রেখে ছিলেন। এই ফৌজের লোকেরা মধ্যে মধ্যে বড়ই অত্যাচার উৎপীড়ন করত। শেষে যখন বিদ্রোহের উপশম হল, ফৌজ চলে গেল, তখন শহরের লোক সব শান্তিলাভ করল। ফৌজদল পাবনা পরিত্যাগ করবার পূর্বে একদিন 'ম্যাক্‌বেথ' ইংরেজী নাটকের অভিনয় করল। আমি পতৃদেবের নিকট ঐ নাটকোল্লেখিত ঘটনাবলী শুনে রাখলাম। পরে এরূপ আগ্রহ ও আহ্লাদের সঙ্গে তার অভিনয় দেখলাম যে তা আর জীবনে ভুলবার নয়।'

রমেশচন্দ্র ইংলণ্ড থেকে তাঁর দাদার (স্বর্গীয় জে. সি দত্ত) নিকট যে সকল পত্র লিখতেন, তাতে লণ্ডনে তাঁর বিদ্যাভ্যাসের বিষয় ও সিবিল্ সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মেধাবী রমেশচন্দ্রের মননশীলতার পরিচায়ক হিসেবে এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃতি করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

'এক বৎসর ধরে দারুণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের সিবিল্ সার্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য যে, এই এক বৎসরকাল যেরূপ অবিরাম কঠিন পরিশ্রম করেছি, পূর্বে আর কখনও সেরূপ করিনি। আমরা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয়ে অধ্যয়ন করতাম, এবং তা ছাড়া অন্য সময়েও ঐ কলেজেরই কোন কোন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতাম। ঐ সকল অধ্যাপক আমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন তা জীবনে ভুলবার নয়। তাঁরা আমাদের সঙ্গে আচার্যের ন্যায় গৌরব সূচক ব্যবহারের পরিবর্তে যেন যথার্থ হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহসূচক আচরণই করতেন। তন্মধ্যে যে মহাত্মার নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলাম, তাঁদের একজন ছিলেন অধ্যাপক হেন্‌রি মার্লে; আর একজন ছিলেন ডাক্তার থিওডোর গোল্ডষ্টুকার। প্রথমোক্ত মাহাত্মার ন্যায় অকৃত্রিম সৌজন্যশালী দয়াশীল অকপটহৃদয় ইংরাজ মহাপুরুষ আমি আর কখনও দেখি নি। ইনি আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। আমরা এঁর কাছে যেমন কলেজে অধ্যয়ন করতাম, তেমনিই আবার অন্য সময়েও পাঠ্যবিষয়ক নানা উপদেশ গ্রহণ করতাম। তিনি নানা ভাবে তৃপ্তির সঙ্গে আমাদিগকে আপ্যায়িত করতেন। তাঁর বাসভবনটি আমাদের

নিজের বাটী বলেই মনে হত। তাঁর পাঠাগারের ভিত্তিগুলি স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ গ্রন্থাবলীতে সুসজ্জিত ; সেই গৃহে বসে তিনি শিষ্যগণকে প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরে নানাবিধ শিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করতেন। শেষোক্ত সদাশয় ব্যক্তি একজন জর্মান দেশীয় মহাপণ্ডিত। আমরা কলেজে তাঁর কাছে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করতাম। তাঁর কাছে গিয়েও আমরা প্রয়োজনানুসারে অন্য সময়ে উপদেশ গ্রহণ করতাম। তিনি সাধারণতঃ পরের বক্তব্যের প্রতিবাদ আর নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতেই শুধু ভাল বাসতেন। এমনি ধারা কিছুটা উদভ্রান্ত ভাবাপন্ন হলেও, অগাধ পাণ্ডিত্য, অকপট সহৃদয়তা ইত্যাদি সদ্‌গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁকে যেন যথার্থই মহৎ চরিত্রের মূর্তিমান বিগ্রহ বলে মনে হত। যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্যের সবিশেষ মর্ম অবগত হতেন, প্রধানতঃ তাঁরাই তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সাতিশয় সমাদর প্রদর্শন করতেন।

'আমরা কলেজের অধ্যাপনাগৃহে অথবা পুস্তকাগারে প্রায় সারা দিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাম, এবং ভেজনান্তে একবার ভ্রমণে বার হতাম ; ফিরে এসে একটু চা পান করে পড়তে বসতাম, এবং যতক্ষণ সাধ্য পাঠ্যাভ্যাসে নিরত থাকতাম। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে সত্বর স্নান ও প্রাতভোজন সমাপন করে পুনর্বার কলেজে যেতাম।

'এইরূপে এক বর্ষ কেটে গেল। পরীক্ষা এসে উপস্থিত। পরীক্ষার্থী ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা তিন শতেরও অধিক। ঐ সংখ্যার মধ্যে মাত্র প্রথম পঞ্চাশটি পরীক্ষার উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় আমাদের ভাগ্যে যে কিরূপ ঘটবে, তা তখন অনুমান করা অসাধ্য। ঐ সকল পরীক্ষাথী ছাত্রের অনেকে আমাদিগের ন্যায় লণ্ডন অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজ কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করেছেন, আবার অনেকে রেন্ সাহেবের নিকট মাত্র এই পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করে প্রতিবৎসর অনেক ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। অবশিষ্ট ছাত্রগণ অপরাপর বিদ্যালয় হতে নিজ নিজ বিশিষ্ট শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করে এসেছেন।

'শিক্ষাবিভাগে এরূপ কঠিন পরীক্ষা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই পরীক্ষা প্রায় একমাসেরও অধিকাল ধরে চলল। পরীক্ষার বিষয় বহুপ্রকার ; কিন্তু রক্ষা এই যে, সকলকেই যে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই

'প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই তার মনোমতো কয়েকটি বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা দিতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষিত ছাত্রের সর্ববিষয়ের পরীক্ষার ফলের সমষ্টি করে, ঐ সমষ্টি-ফলের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্বের বিচার হয়। আমি পরীক্ষার নিমিত্ত মাত্র পাঁচটি বিষয় মনোনীত করেছিলাম;—১ম ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা; ২য়, গণিত; ৩য়, মনোবিজ্ঞান; ৪র্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং ৫ম সংস্কৃত।'

'প্রত্যেক বিষয়েই কতকগুলি লৈখিক আর কতকগুলি মৌখিক প্রশ্ন দেওয়া হয়। আমার মৌখিক পরীক্ষার বিষয় একটু লিখছি। পড়লে বুঝতে পারবেন। ইংরাজীতে আমি যে সকল সাহিত্য বা ইতিহাসাদি পড়েছিলাম সে সমস্ত গ্রন্থের একটা তালিকা দিয়েছিলাম। প্রত্যেক ছাত্রকেই ঐ রূপ দিতে হয়। আমার পরীক্ষক মহাশয় ঐ সুদীর্ঘ তালিকা দেখে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করেলেন:

'তুমি এই পুস্তকগুলি সবই কি পড়েছ?'

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম: 'হাঁ; পড়ছি।'

'পরক্ষণেই মনে হল, তার মধ্যে যে গ্রন্থগুলি সবিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়েছি, মাত্র সেগুলির কথা স্বীকার করলেই ভাল করতাম। কিন্তু পরীক্ষক মশায় বড়ই সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ঐ সকল গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে কিনা, তার পরীক্ষা না করে, মাত্র সাধারণতঃ আমার ঐ সকল গ্রন্থের মর্মবোধ হয়েছে কিনা, তারই পরীক্ষা করতে লাগলেন,—'সেক্স্পিয়রের নাটকগুলির মধ্যে কোন্‌খানি তোমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলে বোধ হয়?' 'কি গুণেই বা সেই বা সেখানিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বোধ কর?' 'ঐ সকল নাটকের বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে কোন কোনটির বর্ণনানৈপুণ্য তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা সমধিক বিস্ময়কর ও প্রশংসার্হ বলে বোধ হয়?' 'ঐ চরিত্রের প্রশংসার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে বল।' 'কেহ কেহ বলেন, কবিবর গ্রে বিরচিত কবিতার রচনাভঙ্গি কোন কোন বিষয়ে মহাকবি মিল্‌টনের কবিতার সদৃশ; এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?' 'মিল্‌টন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ. এ উভয়ের রচনায় কি সাদৃশ্য আছে বলে অনুমান কর?' 'অমুক অমুক গ্রন্থাকারের রচিত অমুক অমুক বিষয় সম্বন্ধে তোমার কি মত?'—ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত নানাবিধ প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করলেন—'দেখছি, তোমার গ্রন্থ তালিকার

মধ্যে রজার্স প্রণীত 'ইতালী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছ; আচ্ছা, বল দেখি, উক্ত গ্রন্থাকারের কবিত্ব সম্বন্ধে তোমার কিরূপ মত?' 'তাঁর রচনাভঙ্গির কোন বিষয় তোমার নিকট সবিশেষ প্রশংসনীয়?' অবশেষে প্রশ্ন করলেন,— Of all the fairest cities of the earth none is so fair as—তার পরে কি? আমি অমনি উত্তর করলাম, 'Florence'. পরীক্ষক মশাই বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। পরীক্ষান্তে বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার পরীক্ষার ফল ভালই হবে। পরীক্ষক মশাই এমন সদাশয় যে যখন কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈত ঘটতে লাগল, তখন তিনি আমাকে অবাধে আমার পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত হেতু ও যুক্তি প্রদর্শন করার অবসর দিতে লাগলেন, এবং ঐ সকল হেতুবাদ শুনে সন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। লৈখিক পরীক্ষাও আমি ভালই দিয়েছিলাম। যখন পরীক্ষার ফল বার হল, তখন দেখে আহ্লাদিত হলাম, ইংরেজী পরীক্ষায় ৩২৫ জন ছাত্রের মধ্যে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, এবং ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪২০ নম্বর পেয়েছি।

'কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব আমাদের সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন। আমি তাঁর নিকট চমৎকার পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ফলতঃ, মাত্র দৈবক্রমেই সেরূপ ঘটেছিল। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শনের একটি স্থানের অর্থ আমি মাত্র আভাসে বুঝে তারই ইংরাজি অনুবাদ করে দিয়েছিলাম; কিন্তু আমার সহ পরীক্ষার্থী অপর হিন্দু ছাত্রদ্বয় সংস্কৃতে অধিক জ্ঞান সত্ত্বেও ঐ প্রশ্নের উত্তর করতে পারেন নি; তাতে আমি তাঁদের অপেক্ষা অধিক নম্বর পেয়ে গেলাম। কিন্তু, আমি বেশ বুঝেছিলাম, যে বাস্তবিক পক্ষে আমি ঐরূপ অধিক নম্বর পাবার উপযুক্ত নই; কারণ, তাঁরা যে আমার অপেক্ষা সংস্কৃত ভাল জানতেন, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। সংস্কৃতে আমি ৫০০ শতের মধ্যে ৪৩০ নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্তু, এই বিষয় আমাদের অপেক্ষা ইংরাজ পরীক্ষার্থীগণের অনেক সুবিধা। কারণ, তাঁরা সংস্কৃতের পরিবর্তে গ্রীক ও লাটিন ভাষায় পরীক্ষা দেন। তাতে ১৫০০ নম্বর নির্দিষ্ট; সুতরাং আমরা সংস্কৃতে যতই পাই না কেন, তাঁরা গ্রীক্ লাটিনে তা অপেক্ষা প্রায়ই অনেক অধিক নম্বর পেয়ে থাকেন। গণিত শাস্ত্রের পরীক্ষকগণের মধ্যে একজন ছিলেন সেই প্রসিদ্ধ গণিতগ্রন্থ প্রণেতা টড্‌হাণ্টার সাহেব; তিনিও বড় উদার প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু, আমি গণিতে বড় বেশি

নম্বর রাখতে পারি নি। মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমি যথেষ্ট নম্বর পেয়েছিলাম। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন সদাশয় ডাঃ কার্পেণ্টার।

'পরীক্ষান্তে পরীক্ষার ফল বার হতে প্রায় এক মাসের অধিক কাল কেটে গেল। আমরা বড়ই উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই এক মাসকাল কোনরূপে কাটালাম; পরে, ফল বার হলে দেখলাম, আমি উত্তীর্ণ পঞ্চাশ জনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। সেদিন আমার মনে যেরূপ আহ্লাদ হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত। আমার বন্ধুদ্বয়ও (বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি) উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে দুরূহ ব্রতে ব্রতী হয়েছিলাম, সে ব্রত আজ সম্যক্ উদ্‌যাপিত!'

[রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত : সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়।
Life and work of R. C. Dutt. : J. N. Gupta.]

রমেশচন্দ্রের-গ্রন্থাবলী

বাংলা :

১। বঙ্গবিজেতা (উপন্যাস)। বনগ্রাম ১২৮১ সাল (১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৪)। ১২৮১ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জনাঙ্কুরে' প্রথম প্রকাশিত।

২। মাধবীকঙ্কণ (উপন্যাস)। কৃষ্ণনগর ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই)।

৩। জীবন-প্রভাত (উপন্যাস)। দক্ষিণ শাহবাজপুর ১২৮৫ সাল (৮ই নভেম্বর ১৮৭৮)। ১২৮৫ সালের ১ম-১০ম সংখ্যা 'বান্ধবে' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত।

৪। জীবন-সন্ধ্যা (উপন্যাস)। ত্রিপুরা ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)।

৫। শতবর্ষ ॥ বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে ॥ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)।

৬। ঋগ্বেদ সংহিতা : ইং ১৮৮৫-৮৭।

মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ)। আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)।

বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

৭। হিন্দুশাস্ত্র, ১—৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংকলিত ও অনূদিত)। ১৩০০—১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

প্রথম খণ্ড :

১ম ভাগ—বেদ সংহিতা ... সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত

২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ঐ

৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র ঐ

৪র্থ ভাগ—ধর্মশাস্ত্র ... কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

৫ম ভাগ—ষড়্ দর্শন ... কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড :

৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ ... হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৭ম ভাগ—মহাভারত ... দামোদর বিদ্যানন্দ

৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... ঐ

৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ ...আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

৮। সংসার (উপন্যাস)। (৫ মে, ১৮৮৬)।

২য় বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৯। সমাজ (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)।

১৩০০ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৩০১ (বৈশাখ-আষাঢ়) সালের 'সাহিত্য'-এ ১০ম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত।

১০। সংসার-কথা (উপন্যাস)। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)।

'সংসার'-এর পরিবর্তিত সংস্করণ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

[১৮৭৯ সনের নভেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র দত্ত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম শিক্ষা' ("ভারতবর্ষের আর্যদিগের আগমন থেকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী কর্তৃক ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ পর্যন্ত"; নামে একখানি সুলিখিত পাঠ্য পুস্তকও প্রকাশ করেছিলেন।]

ইংরেজী :

1. Three Years in Europe (being extracts from letters, sent from Europe.). By a Hindu. Calcutta 1872.

2. The Peasantry of Bengal (being a view of their condition under the Hindu, the Mahomedan and the English rule, and a consideration of the means calculated to improve their future prospects.) Calcutta 1874.

3. The Literature of Bengal...from the earliest times to the present days with copious extracts from the best writers. By Ar Cy Dae. Calcutta 1877.

4. A History of Civilisation in Ancient India (based on Sanskrit literature). Vols. 1-3. Calcutta 1889-90.

5. Lays of Ancient India (selections from Indian Poetry rendered into English Verse.) London 1894.

6. Rambles in India during Twenty-four years, 1871 to 1895. With maps and illust. Calcutta 1895.

7. Reminiscences of a Workman's Life (Poems). "For Private Circulation only." Calcutta 1896.

8. England and India (a record of progress during a hundred years 1785-1885). London 1897.

9 Mahabharata The Epic of Ancient India condensed into English Verse with an introduction by the Rt. Hon. MaxMuller, Illust. London 1899

10. Ramayana. The Epic of Rama, Prince of India condensed into English Verse. Illust. London 1900.

11. Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India. London 1900

12.. The Lake of Palms (a Story of Indian Domestic Life.) London 1902.

13. The Economic History of India (1757-1837). London 1902.

14. Speeches and Papers on Indian Questions :
1897-1900. Calcutta 1902.
1901-1902. Calcutta 1902.

15. India in the Victorian Age : an Economic History of the People (1837-1900). London 1904.

16. Baroda Administration Report :
1902-03 and 1903-04 1905,
1904-05 1906,
1905-06 1907.

17. Indian Poetry : Selections rendered into English Verse. London 1905.

18. The Slave Girl of Agra (an Indian Historical Romance) London 1909.

(এ ছাড়া ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’-র (ইং ১৯০২) পরিশিষ্টে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল ও সার রমেশ মিত্র সম্বন্ধেও তিনি একটি নিবন্ধ সংযোজন করে গিয়েছেন ।)

[‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’—নং ৬৫]

॥ সূচী ॥

বিষয়			পৃষ্ঠা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অনেক জন বিখ্যাত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ,—পদ্যে মধুসূদন, গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তির কথা আজ লিখিতেছি না; বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশকে তিনি যেরূপ সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন, সে কথা লিখিতেছি না; বঙ্গবাসীকে যে মহৎ শিক্ষা, উদ্যম ও গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা লিখিতেছি না। যিনি বঙ্কিমবাবুর জীবনী লিখিবেন, তিনি এ সমস্ত কথার আলোচনা করিবেন, গত ৩০ বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিম-ময়, তাহা তিনি প্রকটিত করিবেন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য কি ছিল? খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় গদ্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু সীতার বনবাস ও চারুপাঠ বিদ্যালয়ে পঠিত হইত, আমাদের মেয়েরা পাঠ করিত,—শিক্ষিত যুবকের জীবন ও চেষ্টা, উদ্যম ও স্পর্দ্ধা ঐ পুস্তকের দ্বারা কতদূর গঠিত ও প্রতিফলিত হইত? ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের কবিতা সরল ও সুমিষ্ট, কিন্তু জাতীয় জীবন ও জাতীয় উদ্যম, আশা ও উৎসাহ সে কাব্যে কতদূর প্রতিফলিত হইত?

৩০ বৎসর হইল দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইল! তাহার পর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাবলী, প্রচারের প্রবন্ধাবলী, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র,—আর কত নাম করিব? তীব্রগামী পর্ব্বত-নদীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বজ্রনাদে বহিয়াছে,—বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে, জাতীয় জীবন চেষ্টা, জাতীয় ভাব ও কল্পনা ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রতিফলিত করিয়াছে,—জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়াছে! অদ্য আমরা বঙ্গসাহিত্যের স্পর্দ্ধা করি, যে সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবন-ব্যাপিনী চেষ্টার ফল!

কিন্তু এ সমস্ত কথা লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। এ কথা আজ আমি লিখিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন আমার মাননীয় বন্ধু ছিলেন,—বন্ধু সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতেছি।

যখন আমার ১০।১২ বৎসর মাত্র বয়স ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন, উভয়েই ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য্য হইতে অবসর

লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন, এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভাল বাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন, আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন,—সেই আমি বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখিলাম! আমি তখন ১০।১২ বৎসরের বালক, বঙ্কিমবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিলেন,—সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলেন নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায়, তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি যে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।...

তাহার দশ বৎসর পরের কথা বলি। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান যশস্বী লেখক হইয়াছিলেন,—আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন!

ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। ইংরাজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না! গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে! এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল,—তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম "বঙ্গ বিজেতা" প্রকাশ করিলাম।...

তাহার ১০।১৫ বৎসরের পরের কথা বলি। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে যখন আমি রাজকার্য্য হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিতগণের

সাহায্য লইয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন একটা বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে কথা অনেকেই জানেন। উন্নতমনা, সাহসী, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে সে সময়ে যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। চারিদিকে অপবাদ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া "প্রচার" নামক কাগজে বঙ্কিমবাবু আমায় যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন! তাঁহার উৎসাহ বাক্য আমি ঋগ্বেদের এক খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া আপনার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম।...

তাহার পর আর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমি যখন যে উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি বঙ্কিমবাবুর নিকটে উৎসাহ পাইয়াছি। ইংরাজি ভাষায় আমি যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিয়াছি, সেটী দেখিয়া বঙ্কিমবাবু আনন্দিত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রের সার অংশ যখন খণ্ডে খণ্ডে প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে উৎসাহ দান করিলেন, সে কার্য্যে নিজে সহায়তা করিতে ব্রতী হইলেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান, কিন্তু আমার গলার শব্দ বুঝিতে পারিলেন,—আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে আমার সহিত কথা কহিলেন,—আমার একখানি ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন। সে সময়ে কেন আমার ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন, জানি না।

তাহার পরদিন শুনিলাম, যিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে রাজা স্বরূপ ছিলেন,—আজীবন আমার বন্ধু স্বরূপ ছিলেন,—তিনি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে আজি বাঙ্গালী মাত্র আকুল,—তাঁহার বন্ধুদিগের হৃদয়ের শোক প্রকাশের সময় এখন নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও মহত্ত্ব সকলেই জানেন; তাঁহার হৃদয়ের সদ্গুণগুলি অল্প লোকেই বিশেষ করিয়া জানেন।

নব্যভারত:
বৈশাখ, ১৩০১

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় চিন্তার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ,—এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখা যায়। আমি দুই চারিটী কথাতে এই বিষয়ে কি লিখিব? সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণ বিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে;—তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছে,—আবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশা ও উদ্যমকে জ্বলন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—আবালবৃদ্ধবনিতা সকল সহৃদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্তৃত করিয়াছেন।

বড়লোকের ইতিহাস এইরূপ। আমরা এখানে ধনবান্, উপাধিবান্ বা কেবল বিদ্যাবান্‌কে বড়লোক বলিতেছি না, যাঁহারা গাড়ি ঘোড়ায় চড়েন, যাঁহারা অসংখ্য উপাধি ধারণ করেন, যাঁহারা বড় পদ বা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। জগতে যে সমস্ত কর্ম্মিষ্ঠ লোক আপনাদের কর্ম্মের অঙ্ক জাতীয় ইতিহাসে অঙ্কিত করিয়াছেন,—অপ্রতিহত বল ও অপ্রতিহত তেজে যাঁহারা সময়ের গতি চিহ্নিত করিয়াছেন,—বিদ্যাক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা স্বীয় ধীশক্তিতে সমস্ত যুগ রঞ্জিত করিয়াছেন,—আমরা সেই ক্ষণজন্মা লোকের কথাই বলিতেছি। তাঁহারা নিজ সময়ের চিন্তা, উদ্যম ও উৎসাহ দ্বারা গঠিত, এবং তাঁহারা কতকটা সেই সাময়িক চিন্তা ও উদ্যমকে গঠন করেন।

যাঁহারা বলেন,—এই মহারথিগণ সময়ের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কেবল নিজ বলে বলবান্,—তাঁহারা ভুল বলেন। সক্রেটিস্ কেবল নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী নহেন,—গ্রীকদিগের তাৎকালিক অসামান্য চিন্তা-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ মাত্র। লুথর নিজ বলে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করেন নাই। সেই সময় নূতন জ্ঞানালোক ইউরোপে প্রকাশিত হওয়ায় তাৎকালিক আচার অনুষ্ঠানের অনিষ্টকর নিয়মগুলি ইউরোপের মহা পরাক্রান্ত ও নব বলে বলীয়ান্ জাতিদিগের অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—লুথর তাঁহাদের মুখপাত হইয়া সেই

নিয়মগুলি তিরোহিত করিলেন। নেপোলিয়ন কেবল নিজ তেজে পূর্ণ হইয়া জগৎ বিপর্য্যস্ত করেন নাই,—ফরাসী-বিপ্লবের অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া নেপোলিয়ন বিস্ময়কর ও অতুল্য তেজ জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন।

আবার যাঁহারা বলেন,—এই মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ সময়ের দাস,—সময়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত,—সময়ের বলে বলবান্, তাঁহারাও ভুল বলেন। সময় প্রস্তুত হইলেও একটী নেতার আবশ্যক হয়। আলেকজেণ্ডারের ন্যায় অসীম সাহসী বীর জন্মগ্রহণ না করিলে গ্রীকদিগের বীরত্ব ও সভ্যতা জগতে ব্যাপৃত হইত না। জ্ঞান ও বাণিজ্যের উৎকর্ষের সহিত, লোকে দেশবিদেশ আবিষ্কার করিতে লাগিল, কিন্তু কলম্বসের ন্যায় ক্ষণজন্মা, অসীম সাহসী বীর জন্মগ্রহণ না করিলে অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অকূল আটলাণ্টিক মহাসাগর পরিক্রম করিতে কে সাহসী হইত? তাহার পর শতাব্দীদ্বয় আবিষ্কার-পূর্ণ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিভা দ্বারাই সে আবিষ্কারগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল। কোপর্নিকস ও গ্যালিলিও যে সকল আবিষ্কার করিলেন, শেক্ষপীয়র যে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিলেন, ডেকার্ট যে অপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত প্রভাহিত করিলেন, সে সমস্ত অনেকটা সময়ের গুণে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলি ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শক্তি অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল। ফলতঃ সময়ের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাকে বাছিয়া লয়,—ব্যক্তিগত প্রতিভাকে অবলম্বন করে, এবং ক্ষণজন্মা মহারথীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পায়। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সকল মহারথীর সম্বন্ধেই সে কথা বলা যায়।—

"ত্বাং ধুরিয়ং যোগ্যতয়াধিরূঢ়া
দীপ্ত্যা দিনশ্রীরিব তিগ্মরশ্মিম্।"

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্। ৩।৫০।

উপরে আমরা বড় জাতির বড় ইতিহাসের কথার উল্লেখ করিলাম। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষীণ জাতি,—কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতির নিয়ম একই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন লোক,—আমাদের বঙ্গদেশের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া,—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে।

একথা যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের এই শতাব্দীর ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য

জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য উন্নতির আলোক সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বলতম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল,—আধুনিক উদ্যম, উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্ন প্রকারে সে সভ্যতা গ্রহণ করিলেন। পল্লবগ্রাহিগণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ, উদ্যম, স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বধর্ম্ম-প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন, দেশে মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্ম্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ, সেই ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দেশপ্রিয়তা প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ বিকাশ পাইল।

শতাব্দীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলতা হইল, কতকটা নূতন বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কথা জানিবার ইচ্ছাও বলবতী হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই পরস্পর-প্রতিঘাতী উর্ম্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল। এই প্রতিঘাতী চিন্তা-তরঙ্গ, এই জাতীয় বল ও জাতীয় উদ্যম মধুসূদন দত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও আচারে বিধ্বস্ত এবং তাঁহার যশোলিপ্সাও প্রথমে বিদেশীয় পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শেষে জাতীয় ভাবে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল।

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি !
 ... ...
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে ;—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?

যা ফিরি, অজ্ঞান তুই—যা রে ফিরে ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

এই সুমধুর কথাগুলি কেবল মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস নহে,—সেই সময়ের বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস। সেই সময়ে শিক্ষিত ধীশক্তি-সম্পন্ন সকলেই পরধন-লোভে মত্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঘরে আসিয়া পৈতৃক ধন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভ্রমণ, সেই ভিক্ষাবৃত্তি ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের পক্ষে ফলশূন্য হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদিগের পক্ষে মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই আমরা নিজের ধন চিনিতে পারিয়াছি, সেই উৎসাহবলেই আমরা পৈতৃক রত্ন আহরণ করিতেছি। এই সুফলটী শতাব্দীর চরম ফল,—এই সুফলটী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ দেশের জন্য সমর্পণ করা,—এইটী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল,—এইটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সামান্য অনুকরণশীল ব্যক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ এই;—পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার মন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, অজীর্ণতা-ক্ষুব্ধ হয় নাই। জ্ঞানরত্ন সকল স্থান হইতেই আহরণীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা আরও সমুজ্জ্বল করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমরা গত ত্রিংশৎ বৎসর ক্রমান্বয়ে দেখিয়াছি।

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা,

সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ ও ওস্‌মানের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব, প্রখরা বিমলার চাতুর্য্য ও জগদ্বিমোহিনী কমনীয়তা, শান্তিময়ী আয়েসার প্রগাঢ় নিঃশব্দ হৃদয়ভাব, গড়মন্দারণ, দেবমন্দির, কতলু খাঁর গৃহে উৎসব,—এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অবিনশ্বর! কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মহারথী বঙ্কিম এই অমৃত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিলেন,—বঙ্গবাসিগণ সে অমৃতসাগরে ভাসিল।

নিন্দুকগণ নিন্দার তান তুলিলেন। দুর্গেশনন্দিনী বিদেশীয় ভাবে পূর্ণ, বঙ্কিমবাবু বিদেশীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, বঙ্কিমবাবু বিকৃত-মস্তিষ্ক! কিন্তু সে নিন্দা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর জয় জয় নাদ দেশ পূর্ণ করিল,—গগনে উত্থিত হইল। দুর্গেশনন্দিনীতে বিদেশীয় শিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ওস্‌মান ও জগৎ সিংহের উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। আয়েসার প্রগাঢ় নিভৃত হৃদয়ের ভাব বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিমলার অপূর্ব্ব জিঘাংসা ও বৈরনির্য্যাতন বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিদেশীয় শিক্ষা লাভ করিয়া—বহু বিদ্যা লাভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এইটী আধুনিক সময়ের ভাব, এই ভাব বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী কি দোষ?

শেক্ষপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজি সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাচীনকালে রোমীয় কবি ভর্জিল গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গবাসিগণ ইংরাজি সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নলাভ করিতেছেন,—একটু উদ্যম, উৎসাহ, স্বদেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সদ্‌গুণগুলি আর একটু অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পুস্তকের কথা বলিলাম। তাঁহার কমনীয় কল্পনা হইতে উদ্ভূত সকল চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যার আকাশে যেমন একটীর পর একটী জ্যোতিস্ময় নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া শেষে নৈশ গগন জ্যোতির্ম্ময় করে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি সেইরূপ একটীর পর একটী ফুটিয়া সাহিত্যাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিল। অরণ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার

চিত্রটী কি অপূর্ব্ব, কি বিস্ময়কর! দেশবিদেশেবিচারিণী গিরিজায়ার গীত কি সুমধুর, কি হৃদয়গ্রাহী! গরীয়সী সূর্য্যমুখী, প্রশান্তমতি কমলমণি, দুঃখিণী কুন্দনন্দিনী, আর চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, ভ্রমর, দেবী চৌধুরাণী,—কত নাম করিব? প্রভাতে নিকুঞ্জবনে বন-পুষ্পগুলি যেরূপ একে একে ফুটিতে থাকে, বঙ্কিমের হৃদয়-কুঞ্জে কল্পনাপুষ্পগুলি সেইরূপ স্বতই ফুটিতে লাগিল। সেগুলিও সেইরূপ সুন্দর,—সেইরূপ সুমধুর!

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতাম,—অদ্যও তাহা করিতেছি, এবং ভরসা করি বহুদিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিতে থাকিব। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙ্গালীর ন্যায় ফিরতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু ধনসঞ্চয় হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণকারী। এখন আমরা দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল, প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্দ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি, দেশীয় আচার-ব্যবহারে বীতরাগ নহি; দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্ম্মে অবহেলা করি না। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্দ্ধা হইয়াছে, জাতীয় ধন চিনিয়াছি, জাতীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ। আমরা যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

এ উন্নতি যে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা সাধিত, তাহা নহে। এটী কতকটা ইংরাজি শিক্ষার ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতিও বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়ি নাই, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার কি মত, তাহাও জানি না। কিন্তু মতামতের আলোচনা এখানে করিতেছি না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটী লক্ষণ,—একটী চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জ্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির

স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজ বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ ঐক্যলাভ করিতে শিখিতেছেন,—প্রাচীন ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই ঐক্যসাধনের এক মাত্র মন্ত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :
শ্রাবণ, ১৩০১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে আর নাই, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বঙ্গবাসীদিগের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি ইদানীন্তন বঙ্গ সাহিত্যের প্রণেতা, তিনি বঙ্গ সমাজের সংস্কার-কর্ত্তা, তিনি হৃদয়ের ওজস্বিতা ও দাক্ষিণ্য গুণে জগতের একজন শিক্ষাগুরু। গুরু আজি পাঠশালা বন্ধ করিলেন, কিন্তু, তাঁহার কীর্ত্তিমণ্ডিত চিত্রখানি ধ্যান করিয়া দুই একটী বিষয়ে আজি শিক্ষা লাভ করিব।

যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, আজ তাঁহারা নিজ শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ করিতেছেন। সে সময়ের বঙ্গ সমাজ অদ্যকার সমাজের মত নহে, তখনকার সাহিত্য অদ্যকার সাহিত্যের ন্যায় নহে। প্রাচীনা গৃহিণীগণ অথবা দোকানী পসারী লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, যুবকগণ ভারতচন্দ্র আওড়াইতেন, শাক্তগণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন, নব্য সম্প্রদায় নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেন অথবা দাশুরায়ের ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পাঠক কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামৃতের পাতা উল্টাইতেন, শাক্ত পাঠক কেহ কেহ মুকুন্দরামের চণ্ডীখানি খুলিয়া দেখিতেন। এই ছিল বাঙ্গালা পদ্যের অবস্থা, সুমার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

এইরূপ কালে ক্ষণজন্মা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহস্র সদ্‌গুণের মধ্যে তাঁহার ওজস্বিতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রধান গুণ। যেটী কর্ত্তব্য সেটী অনুষ্ঠান করিব; যেটী অনুষ্ঠান করিব সেটী সাধন করিব, এই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সংকল্প। সমস্ত সমাজ যদি বাধা দিবার চেষ্টা করে, সিংহবীর্য্য ঈশ্বরচন্দ্র সে সমাজব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অলঙ্ঘনীয় সংকল্প সাধন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র আজি আমাদের এই পরম শিক্ষা দান করিতেছেন, এই শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হস্তে, পরের হস্তে নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বঙ্গভাষায় সুমার্জ্জিত নির্ম্মল হৃদয়গ্রাহী গদ্যগ্রন্থ নাই। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাহার সৃষ্টি করিলেন, সংস্কৃত ভাষার অমূল্য-ভাণ্ডার হইতে সুন্দর সুন্দর পবিত্র গল্প ও পবিত্র ভাব নির্ব্বাচন করিলেন, সংস্কৃত রূপ মাতৃভাষার সাহায্যে নূতন বাঙ্গালা ভাষায় সেই গল্প ও সেই ভাব

প্রকাশ করিলেন, নিজের হৃদয়গুণে, নিজের প্রতিভাবলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়া বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, কোন্ বাঙ্গালী ভদ্র মহিলা এই পুস্তকগুলি পড়িয়া চক্ষুর জল না বর্ষণ করিয়াছেন? কোন্ সহৃদয় বাঙ্গালী অদ্যাবধি যত্নসহকারে না পাঠ করে? ঈশ্বরচন্দ্রের একটী সঙ্কল্প সাধিত হইল,—নির্ম্মল সুমার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতেই বিদ্যাসাগর নিরস্ত রহিলেন না। আপনি যে পথে গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন স্বদেশবাসী-গণকে সেই পথে লইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি নাই। কিন্তু সংস্কৃত কে শিখায়, কে শিখে? টোলে পড়িতে যাইলে অর্দ্ধেক জীবন তথায় যাপন করিতে হয়,—তখনকার পণ্ডিতগণ বলিতেন, এরূপ না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। তবে কি শিক্ষিত হিন্দুগণ চিরকাল ঐ পবিত্র ভাষায় বঞ্চিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুদিগের পৈতৃক রত্নরাজি ও অনন্ত ভাণ্ডার হিন্দুদিগের চিরকাল অবিদিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুজাতির গৌরবস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য কেবল অল্পসংখ্যক লোকের একচেটিয়া ধন হইয়া থাকিবে?

বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা একচেটিয়া উঠিয়া গেল, সহস্র সহস্র দেশানুরাগী যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত সরল প্রণালী-দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুরতা আস্বাদন করিল, প্রাচীন গ্রন্থের, প্রাচীন রীতির, প্রাচীন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিল—ক্রমে আজি হিন্দু-সমাজ সেই প্রাচীন পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইতে চলিল। স্বার্থপর লোকের কি এ সমস্ত গায়ে সহে? হিন্দু-ধর্ম্মের ভণ্ডামি করিয়া যাহারা পয়সা আদায় করে, তাহারা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ কর,—আবার শিক্ষিত দেশহিতৈষীদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত কর,—আবার স্বার্থপরদিগকে সেই ভাণ্ডারের প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য নষ্ট হয়, কিন্তু ভাণ্ডারীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম লোপ হইয়া উপধর্ম্মের অন্ধকারে দেশ পুনরায় আবৃত হয়, তাহাতে হানি কি? ভাণ্ডারীদিগের পয়সা আদায়ের উপায় হয়।

বৃথা আশা! জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—হিন্দু-জাতি আপনাদিগের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান, প্রাচীন ধর্ম্ম পুনরায় চিনিতে পারিয়াছে, তাহারা সে ধনে আর বঞ্চিত হইবে না।

তাহার পর? তাহার পর—বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নির্জ্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুনারী-দিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করাতে স্বার্থপর পুরুষে কত বাধা দেয়, তাহা আমরা আধুনিক ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা নিজে আর্য্যসন্তান বলিয়া দর্প করেন, তাঁহারাই বাল্যবিবাহ, বিধবার চিরবৈধব্য প্রভৃতি অনার্য্য প্রথাগুলি সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যাঁহারা নিজে হিন্দুয়ানীর গর্ব্ব করেন, তাঁহারাই রমণীগণকে অশিক্ষিত রাখা ও দাসীর ন্যায় ব্যবহার করা প্রভৃতি অহিন্দু আচারগুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কুপ্রথা ও কুতর্কের একমাত্র ঔষধি আছে;—এ সমস্ত অহিন্দু আচার প্রতিবিধান করিবার একমাত্র উপায় আছে;—সে ঔষধি ও সে উপায়,—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা।

অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে ইহার কিরূপ বল ছিল, সহজে অনুভব করা যায়। সামান্য লোকে এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত;—কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়-শূন্যতা, নির্জ্জীব জাতির নিশ্চলতা,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্ম্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অত্যাচার, গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্য্যদিগের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জ্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমাদিগের নির্জ্জীব বঙ্গ সমাজে এরূপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই,—পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ্ব, এরূপ সংকল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ সিংহবীর্য্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষ-সিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা, জড়তা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন

জারি করাইলেন; বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয় লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইল।

আর একটী মহৎ কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সন্তানাদি না হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের বিধান আছে, নচেৎ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য দেহের সৌন্দর্য্য, বল, তেজ ও গৌরব সমস্তই যেরূপ মৃত্যুর পর লোপ প্রাপ্ত হয় এবং অবয়বখানি বিকৃত ও পূতিগন্ধ পূর্ণ হয়,—জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্ম্মও সেইরূপ সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া নানারূপ জঘন্য আচার ব্যবহারে পরিবৃত হয়। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কারণ ও আবশ্যকতা বিস্মৃত হইয়া এখনকার স্বার্থপর বিলাস লালসাপরায়ণ পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ করাই হিন্দু আচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ভণ্ড ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ এই কুপ্রথাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এইরূপেই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যাহা কিছু সরল পবিত্র ও সমাজের উপকারী ছিল, তাহা বিকৃত বা বিলুপ্ত বা জঘন্য আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং মনুষ্য জীবন বহির্গত হইলে পূতিগন্ধপূর্ণ শব লইয়া আহারপ্রিয়-কীটের যেরূপ উল্লাস হয়, জাতীয়-জীবন-শূন্য হিন্দুদিগের বিকৃত আধুনিক অহিন্দু আচরণ ও রীতিগুলি পয়সা-প্রিয় ভণ্ডগণের সেইরূপ উল্লাসের কারণ হইয়াছে। কোন সংস্কার আরম্ভ হইলেই তাহাদিগের একচেটিয়া রোজকারের উপায় হ্রাস হয়,—সুতরাং "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন দ্বারা বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাহাতে বিফল-প্রযত্ন হইলেন। আমাদিগের বিদেশীয় রাজা সত্যই বলিলেন, "যদি তোমাদের সামাজিক কোনও কুপ্রথা উঠাইবার ইচ্ছা থাকে, সমাজ সে বিষয়ে যত্ন করুক,—আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল দণ্ডনীয় অপরাধমাত্র আমরা নিষেধ করিতে পারি।" রাজা এবাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন,—পাশব অপরাধ দুই একটী আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য্য হইতে

অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য যে তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার প্রকৃত দেশহিতৈষিতা ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথিগুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম, অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙ্গালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, এ কথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্ম্মে দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্ম্ম ব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্ব্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,—গলাবাজিতে পয়সা আসে! ধর্ম্মের দোকানদারগণ অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল,—গালিবর্ষণে পয়সা আসে! এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিনি বলিলেন, "ভাই,—উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমাকে সাহায্য করিব।" পাঠকগণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার এবং দেশের নাম লইয়া পয়সা উপায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন? সর্ব্বসাধারণকে প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্রে দীক্ষিত করা,—এবং হিন্দুশাস্ত্র সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার নাম লইয়া রোজকারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা, অবগত হইলেন?

আজি সে মহাপ্রাণ হিন্দু অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর নাই,—সমস্ত দেশের লোকে তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে, তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলা হইতে আমিও এক বিন্দু অশ্রুবারি মোচন করিলাম। কিন্তু আমাদের রোদন যদি অশ্রু বিন্দুতেই শেষ হয়, তাহা হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করিতেও অযোগ্য। তাঁহার জীবন হইতে কি কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না? তাঁহার কার্য্য-পরম্পরা আলোচনা করিয়া কি কোন উপকার লাভ করিতে পারি না?

ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী

সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধহয় একটু সোজা পথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,—একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটী সমাজের উপকারী, যেটী প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অভিমত, সে প্রথাটী যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি। যেটী সমাজের অপকারক, যেটী হিন্দুধর্ম্মের অনভিমত, সে প্রথা যেন ক্রমে ক্রমে বর্জ্জন করিতে শিখি। প্রাচীন শাস্ত্রে ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যেন আস্থা হয়। উপনিষদাদি প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থপাঠে যেন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা দেশে প্রচারিত হয়,—প্রস্তর ও মৃত্তিকার পূজা যেন বিলুপ্ত হয়। আর্য্য সন্তানগণ যেন প্রাচীন আর্য্যের ন্যায় নিজের দেবকে স্মরণ করিয়া নিজে আহুতি দিতে শিখেন;—ধর্ম্মানুষ্ঠানে কালীঘাটের পাণ্ডাকে মোক্তারনামা দিবার আবশ্যক নাই। এবং মনুর সন্তানগণ যেন মনুর আদেশ অনুসারে নারীকে সম্মান করিতে শিখেন, যোগ্য বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, অল্পবয়স্কা বিধবা পুনরুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত করেন, বহু বিবাহ প্রথা বর্জ্জন করেন, এবং পাশব আচরণ বিস্মৃত হইয়া মনু-সন্তানের নামে যোগ্য হয়েন। হত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন, এবং পাপীর সংসর্গ, এইগুলি মনুর মতে মহাপাতক। এই দোষের জন্য যদি সমাজ দোষীকে দণ্ডিত করিতে শিখেন, তবেই সমাজ আর্য্যনামের যোগ্য হইবে, এবং ক্রমশ উন্নতি লাভ করিবে।

সমাজ কাহাকে বলে? মনুষ্য জড় হইয়াই সমাজ হয়। যদি আমরা প্রত্যেকে একটু করিয়া সৎপথে যাইতে প্রয়াস করি, ভণ্ডামির কথা না শুনি, অসৎ কার্য্যে বিমুখ হই, তাহা হইলে সমাজ উন্নতির পথে চলিবে। সে দিন রথযাত্রা হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড রথ, তাহাকে টানে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই, কিন্তু শত শত লোকে দড়ি ধরিল, সকলে একটু একটু করিয়া টানিল, রথ হড় হড় করিয়া চলিল। আমরা সকলে যদি আমাদিগের ক্ষুদ্র বল ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দু সমাজকে সনাতন প্রশস্ত পথে চালিত করি, সমাজ সেদিকে চলিবে। যদি আমরা সেটুকুও না করিতে জানি, তবে আমাদিগের শিক্ষা বৃথা, আমাদিগের হিন্দু নামে অভিমান বৃথা,—এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃথাই আমাদিগের মধ্যে জন্ম ধারণ করিয়া আজীবন আমাদিগের জন্য শ্রম করিয়া গিয়াছেন।

নব্যভারত:
ভাদ্র, ১২৯৮

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই। এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকের মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্ত ও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারত-চন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা একবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটি আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী, কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অদ্য কয়েকটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশরূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥

চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে ॥
পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী ॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তব ঘরে,
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥
পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার ॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥
চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
হৈমবতী হৈল কোপমতি।
আপন স্বভাবে রামা, চলিলা ভ্রূকুটি ভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি ॥
হইয়া উন্মত্তবেশা, যান দেবী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়,
বৃষভেরে করিয়া সাজন ॥

মুকুন্দরাম।

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বামকর তলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দু পাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ১॥

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥

ভারতচন্দ্র।

দক্ষের শিবনিন্দার কথাও সেই রূপ। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক, যথা—

পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতিভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান তার কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দ্ব্যর্থ, যথা—

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়;
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই;
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বর্ণনায়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

লয়ে নানা রুদ্র, ক্রুদ্ধ বীরভদ্র,
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর, ভাঙ্গিয়া করে চূর,
কেহ নিবারিতে নারে॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, পুথি লয় কাড়িয়া,
ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার,
পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে হেথা ধায়, দানা ধরে তায়,
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন, ছিঁড়িল বসন,
শ্রুবের মারিয়া বাড়ি॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
... ...
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
... ...
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীমশব্দ ভাসিছে॥
উর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥

এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তৎপরে উমার জন্মকথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব নামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কামদেবের ভস্ম হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

কামকান্তা কান্দে রতি, কোলে করি মৃত পতি,
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তল ভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণ তলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক বিস্মৃত হৈয়া, পাসরিলা প্রাণপ্রিয়া,
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সঙ্গতি লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিত।

তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন হৈল বিপরীত ॥
মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে ॥

মুকুন্দরাম

পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থাল কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
দুই সঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
পিরীতির এ নহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছে খেলা ॥
না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এতদিন ইহা নাহি জানি ॥

ভারতচন্দ্র।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তপস্যাস্থানে মহাদেব দ্বিজ বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :—

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্‌
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা,
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥

কুমারসম্ভব।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেব ও গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কহ নিরুপমা, কার বোলে রামা,
বাঞ্ছিলা কেন জটাধরে।
হইয়া সুন্দরী, ভজহ ভিখারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে ॥
শুন গো চন্দ্রমুখি, তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবন মোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবন মনোহর,
ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি ॥

অবশেষে মহাদেব নিজরূপ ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন। পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন। এই সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন। পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাদেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিণী নারী আপনাদিগের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরামের এই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি ॥
এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি।
সদা কোয়া জ্বরের ঔষধি পাব কাথ ॥

ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাঁকুই দুর্ব্বার।
গোছে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার॥
ফুলে যদি গোদ কোয়া জ্বর করে বল।
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল॥
প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সূতার করি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সূতা এক পণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে॥
চক্ষু খায়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে।
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে॥
গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত।
পূর্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত॥
আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন।
ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি॥
আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুটী চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা॥
কেহ বলে মোর পতি বড়ই নিগুর্ণ।
কত বা পুষিব দিয়া মা বাপের ধন॥
আর জন কহে সখি মোর পতি খোঁড়া।
নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করি যোড়া॥
আর সতী বলে সখী মোর পতি কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভূজা॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে॥

লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি।
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী॥
আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা।
অন্যের সংসার ভাল মোর বড় জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে।
রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে॥
সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যে লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে হোক্ না ভাবিহ ব্যথা।
মনোদুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা॥
যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।
পতি সেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥

এই বর্ণনাটীতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বর্ণনাটী সরল ও স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম যাহাই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক। নারীগণ আপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু পতি সেবাই যে নারীর পরম ধর্ম্ম, এই মহীয়সী কথাও স্মরণ করিতেছে। এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কিরূপে নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাজে অপাঠ্য।

দেব-দেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম দুইটী উপাখ্যান লিখিয়াছেন, একটী কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যা; অপরটী শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান। দুইটী উপাখ্যানই সরল ভাষায় লিখিত, দুইটীতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ও নরনারীর সুখদুঃখ সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু পশু বধ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্লরা সেই পশু মাংস হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামী গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করে। চণ্ডীর অনুগ্রহে সেই কালকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী রূপে কালকেতুর ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী যে পরিচয় দিলেন, সেটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হইতে সম্পদের সুখ ॥
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে ॥
গঙ্গা বড় আউচালি, সদাই পাড়িছে গালি,
স্বামীর সোহাগ পরতাপে।
দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে ॥
দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,
অহি সঙ্গে হয়ে গেল মেলা।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তাহে হইল সতীনী প্রবলা ॥
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী ॥
আমার কর্মের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,
পাঁচমুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
পরিতাপে হয়ে গেনু কালী ॥
প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়,
অলক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল ॥
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।

ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মালা ॥
কি হবে বিষম সুখ, তাতে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম অরি।
সাত সতীনীরা মারে, বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাতসতা পরাণের বৈরী ॥
যে ঘরে সতীনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষ জ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একলা ॥
এবে বিধি হৈল সখা, বীর সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে ॥

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিচয় দান ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

চণ্ডীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া চারিদিক হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন ধূর্ত্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্য ভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য।

ভেট লয়ে কাঁচ কলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগা ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া যোড়ে কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্বমান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইনু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিলে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমল হাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥
গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥

বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া তিন শালা,
চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই আট বেটী, এই হেতু সাত বাটী,
ধান্য দিলে নাহি দিব বাড়ী ॥
হাল বলদ দিয়া খুড়া, দিবাহে বিচার পুঁড়া,
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা।
আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা,
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবা ॥

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে কোথায় পাইব? বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের পাঠকগণ বিমোহিত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্ব্বলা নাম্নী এক দাসীর যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর; তাহার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। দুই সপত্নীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু ধূর্ত্তা দাসী দুর্ব্বলা কালসর্পের ন্যায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ সাধন করিল; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল,—

শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা।
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥
ঋতুমতী ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥
কলাপিকলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢলঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥
কদম্বকোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন ॥
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবন বিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥

আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন ॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্রমে খুল্লনার প্রতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায় লহনা পুনরায় ছোট সপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুই সপত্নীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটী করিয়া বড়মার নিন্দায় ছোটমার মনস্তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইল :—

আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে ॥
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা।
ভবানীপ্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা ॥
আমারে আপনা বলে রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে ॥
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁঝী।
সাধুর নিকটে তার আলাইও পাজী ॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতীকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার ॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা ॥
দোলার ছাট খুঞা বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনারে ॥

আবার তাহারই পর বড়মার নিকট আসিয়া ছোটমার নিন্দা আরম্ভ করিল :—

আর শুনেছ বড়মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত ॥
যেই সদাগরের পাইলে ভেড়ী সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া ॥

অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষিত করি গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা।
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাপনা॥
উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন।
গুরুজন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন॥
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ॥

তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল, দুর্ব্বলা হাটে খাদ্য ক্রয় করিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারলাম না।

দুর্ব্বলা বাজারে যায়, পাছে দশ ভারি ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে মুখে পান গুয়া,
পরিধান তসরের শাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়,
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই॥
আলু কিনে কচু কুমড়া, সের মূলে পলাকড়া,
পাকা আম্র কিনে বোঝা মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি, কিনিল নবাৎচিনি,
পণে পণ মূলে পান নিলে॥
মূল্য দিয়া পণদশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জঠর কমঠ কিনে রুই।

খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই ॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান, সরস গুবাক পান,
কিনিলেক কর্পূর চন্দন।
শাক বেগুণ সারকচু, খাম আলু কিনে কিছু,
বিশা দুই কিনিল লবণ ॥
বাছে কিনে তাল শাঁশ হিঙ্গ জিরা রস বাস,
চই মেথি জোয়ানি মহুরী।
মৃগবাস বরবটি, কিনিল সরস পুঁঠি,
সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি ॥
রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোল, পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুর দাসী, আট কাহনেতে খাসি,
তৈল সের দরে দশ বুড়ি ॥
কুড়ি মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পাণিফল,
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুল গাবা, করুণা কমলা টাবা
সেরে জুঁখে কিনে ফুলবড়ি ॥
তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বড়ি।
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড় ॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা দরে কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
বেসাতি দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
মাগ্যে লয় তারে কিছু ভাট ॥
কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ডকলা,
চিড়া দই দেয় ভারি জনে ॥

আগে পাছে ভারি জন, হুয়া আসে নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুরা সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম। আসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক নায়িকার ন্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ু-দত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নরনারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্র কুৎসিত সমাজ-বিশেষের কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
মাঘ, ১৩০১

কবি কালিদাস

কবি কালিদাসের নাম জগদ্বিখ্যাত। ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিতগণ শকুন্তলা, কুমার, রঘুবংশ ও মেঘদূত পড়িয়া কবির উপমাপটুত্ব, কল্পনাশক্তি ও মাধুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হয়েন। সুন্দর বসন্তকালের উপবন যেরূপ স্বভাবতঃই মধুর, কালিদাসের কাব্য যেন সেইরূপ স্বভাবতঃই মধুর বলিয়া বোধ হয়, সে মাধুর্য্যে শরীর পুলকিত হয়, মন আনন্দিত হয়। আর উপবনে যেমন স্বভাবতঃই রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া থাকে, তাঁহার কাব্যে সেইরূপ যেন রাশি রাশি উপমা আপনা হইতে ফুটিয়া রহিয়াছে,—যে দিকে দেখি সেই দিকে আলো করিয়া রহিয়াছে। কন্বমুনির আশ্রমে নবপ্রেমবিদগ্ধা অরণ্য বালা,—হিমালয়ের স্নিগ্ধ সানুতে হরপ্রণয়াভিলাষিণী পুষ্পালঙ্কার বিভূষিতা ভূধরকন্যা,—পুরুরবার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী স্বর্গত্যাগিণী প্রণয়বিহ্বলা উর্ব্বশী,—এইরূপ এক একটী চিত্র যেন এক একটী হৃদয়গ্রাহী রত্ন!—কল্পনা সাগর মন্থন করিয়া মানবজাতি ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল বা মধুর লাবণ্যবিভূষিত রত্ন অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয় নাই!

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এই কালিদাস বিক্রমাদিত্য রাজার সভাকবি ছিলেন,—সভার নয়টী রত্নের মধ্যে প্রধানতম রত্ন ছিলেন। অভিধান রচয়িতা অমর সিংহ, জ্যোতিষবেত্তা বরাহমিহির, ব্যাকরণাভিজ্ঞ বররুচি, বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি, প্রভৃতি আটজন মহাপণ্ডিত সেই সভায় ছিলেন,—কালিদাসকে লইয়া নয়জন। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা হয় ঐ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস কোন্ সময়ের লোক।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে বিক্রমাদিত্যের অব্দকে সম্বৎ বলে, এবং এই সম্বৎ অব্দ ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; অতএব বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দের লোক এইরূপ প্রতীতি ছিল।

আরও শুনিয়া আসিতেছি যে বিক্রমাদিত্য শক নামক এক জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে শকারি কহে। শকগণও খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা জানা আছে। অতএব বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেকার লোক এইরূপ প্রতীতি ছিল।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। কথাটা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে শক জাতি (Scythians) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। রুষ দেশে ভল্‌গা নদী যেখানে কাস্পীয় হ্রদে মিলিত হইয়াছে তথা হইতে বহু দূর পশ্চিম পর্য্যন্ত ও বহুদূর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শকদিগের আদিম ভূমি ছিল। ফলতঃ এক্ষণে তাতার, কসাক্ প্রভৃতি ভ্রমণশীল জাতিগণ ইউরোপ ও আসিয়ার যে যে খণ্ডে বিচরণ করে, পূর্ব্বকালে সেই সেই প্রদেশ শকদিগের জন্মভূমি ছিল।

খৃষ্টের সাতশত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা একবার পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণদিকে অবতীর্ণ হইয়া অনেক দেশ প্রদেশ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল। পশ্চিমে বাবিলন ও আসিরীয় রাজ্যের সীমা হইতে পূর্ব্বে পারস্য দেশের মরুভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করিয়া শকগণ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল। অবশেষে মিদীয় দেশের বিক্রমশালী রাজা সৈয়াক্‌জারিস্ শকদিগকে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এবং দক্ষিণ আসিয়া বর্ব্বরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

মিদীয়দিগের পর পারসীকগণ আসিয়াতে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সাইরস, দারা প্রভৃতি পারসীক রাজাগণের কথা ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের হস্তে পারসীক রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পর পার্থীয় রাজাগণ আসিয়াতে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। পারস্যের উত্তর পূর্ব্বে তাঁহাদের নিবাস, এবং খৃষ্টের ২৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২৩৬ বৎসর পর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শত বৎসর তাঁহারা আসিয়াতে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইউরোপে রোমরাজ্য ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, কিন্তু ক্রাসস্, আণ্টনী, মরিস প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ রোমীয় সেনাপতি পার্থীয়দিগের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল।

এই পার্থীয়দিগের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টের অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শক জাতীয় বর্ব্বরগণ আর একবার দক্ষিণে আসিয়া আচ্ছাদন করিয়াছিল। তাহারা এরূপ বিক্রমশালী ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ছিল যে দুই জন পার্থীয় সম্রাট্ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। বাকৃট্রীয়া নামে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে গ্রীকদিগের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শকগণ ১২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সে রাজ্যটী গ্রাস করিল, এবং অনেক দিন তথায় রাজত্ব করিতে লাগিল।

ইহা অসম্ভব নহে যে এই স্থানের শক রাজগণ মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত, এবং ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাহারা বিক্রমাদিত্য নামীয় কোন ভারতবর্ষের সম্রাট দ্বারা পরাস্ত হইয়াছিল। অসম্ভব নহে যে শকদিগের এই পরাজয়ের সময় হইতে সম্বৎ অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে কোন বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ঐ সময়ে শকদিগের পরাজয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্বৎ অব্দ ৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে একজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন, এবং তিনি শকদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার পরের ঘটনাগুলি আলোচনা করা যাউক।

শকগণ অনেক যুদ্ধের পর পার্থীয় রাজগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পারস্য রাজ্য হইতে বিদূরিত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে কনিষ্ক নামে একজন শক রাজা কাশ্মীর ও সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিলেন, এবং তিনি যে অব্দ চালাইয়াছেন তাহাকে এখনও শকাব্দা বলে। কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে তুরেনীয় বিবেচনা করেন, কিন্তু হিন্দুগণ তাঁহার অব্দকে শকাব্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই শকাব্দা খৃষ্টের পর ৭৮ বৎসরে আরম্ভ হয়, সুতরাং কনিষ্ক নামক শক রাজা কাশ্মীরে খৃষ্টের ৭৮ বৎসর পর রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

তাহার পরও ভারতবর্ষ বিশ্রামলাভ করিল না। বিজাতীয়গণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। শকদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া বাক্‌ট্রীয়া দেশের গ্রীকগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খৃষ্টের দুই তিন শত বৎসর পর কাবুল প্রদেশের অধিবাসী কাম্বোজগণ অসিহস্তে ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। এবং খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পর হূন নামক তুরেণীয় বর্ব্বরগণ চীনদেশের নিকট হইতে পঙ্গপালের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া, আসিয়া ও ইউরোপ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে শকগণ যেরূপ উৎপাত করিয়াছিল, খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পরে হূনগণ সেইরূপ ভয়ানক উৎপাত করিয়া মেদিনী কম্পিত করিল। তাহাদের অসংখ্য সেনা ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়া প্রায় আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত হূনবিজয় বিস্তার করিল, এবং অদ্যাপি তাহাদিগের সন্ততি হাঙ্গেরি প্রদেশে বাস করিতেছে। আসিয়াতে তাহারা পারস্য প্রভৃতি রাজ্য বিপর্য্যস্ত

করিয়া ফেলিল। তখন পারস্যদেশে পার্থীয় সম্রাটগণের রাজ্যকাল শেষ হইয়াছে, সাসনীয় বংশীয় পারসীক সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেছেন। এই সাসনীয় বংশের ফিরোজ নামক সম্রাট ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অচিরে হূনদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া নিহত হয়েন। বহরাম গোর নামক আর একজন পারসীক সম্রাট হূনদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষে ছদ্মবেশে পলাইয়া আইসেন, এবং কথিত আছে যে একটী হিন্দুরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

৫৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা নওশরবান্ বিদেশীয় শত্রুদিগকে দূর করিয়া পারস্যরাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি হিন্দু রাজাদিগের মিত্র ছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র ভক্তি করিতেন, এবং "পঞ্চতন্ত্র" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান।

ভারতবর্ষে খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দীতে মহাবল পরাক্রান্ত গুপ্ত রাজগণ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা হূনদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন, অনেকবার জয়লাভ করেন, এবং অনেকবার পরাস্ত হয়েন। হূনগণ মালব প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিল। কিন্তু অবশেষে কোন হিন্দু রাজা তাহাদিগকে এবং অন্যান্য বিদেশীয় শত্রুদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেন। বোধ হয় তিনিও বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি পারসিক সম্রাট্ নওশরবানের সমকালের লোক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ; আমাদের কবি কালিদাস খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বের শকবিজেতা কোন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন না, খৃষ্টের পরের ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূন বিজেতা কোন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন ?

এই গুরুতর বিষয় বিচার করিতে বসিলে অনেক ভাল ভাল সাক্ষীর "জবানবন্দী" লওয়া আবশ্যক! প্রথম সাক্ষী কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহ্লন পণ্ডিত। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে কনিষ্ক রাজার পর ৩০ (ত্রিশ) জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, তাহার পর যে মাতৃগুপ্ত রাজা হয়েন তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার বন্ধু ছিলেন। অতএব কহ্লন পণ্ডিতের সাক্ষ্যতা দ্বারা প্রমাণ হয় যে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজা কনিষ্কের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের লোক, অর্থাৎ খৃষ্টের পাঁচ শত কি সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হুয়েন সাং। তিনি খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পর ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বলেন যে তাঁহার আসিবার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শীলাদিত্য বলিয়া একজন রাজা ছিলেন, এবং শীলাদিত্যের পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। অতএব তাঁহার সাক্ষ্যতাদ্বারাও প্রমাণ হয় যে অনুমান ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন।

তৃতীয় সাক্ষী রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির। তিনি যে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই নিজের জন্ম সময়ের তারিখ দিয়া গিয়াছেন, সে তারিখ ৫০৫ খৃষ্টাব্দ।

চতুর্থ সাক্ষীও রাজা বিক্রমাদিত্যের আর একজন সভাসদ্, ব্যাকরণ প্রণেতা বররুচি। তিনি যে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন খৃষ্টের পূর্ব্বে তাহার চলন ছিল না, খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের পুস্তকেই তাহার চলন দেখা যায়।

পঞ্চম ও শেষ সাক্ষী স্বয়ং কবি কালিদাস। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতেই তাঁহার সময় কতকটা নিরূপণ করা যায়।

কালিদাসের নাটকে যে প্রাকৃত ভাষা দেখা যায় তাহাও খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের প্রচলিত ভাষা, পূর্ব্বের নহে। কালিদাসের মহাকাব্যে যে হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম নহে। এমন কি কালিদাস ভারতবর্ষের যে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন তাহাও খৃষ্টের পরকালীন ভারতবর্ষের বর্ণনা, অধিক তর্কে আবশ্যক নাই, তিনি যে হূন জাতির কথা রঘুবংশে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সে হূন জাতির নাম ও অস্তিত্ব খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে সভ্য জগতে বিদিত ছিল না। পঞ্চম শতাব্দীতে হূনগণ জগৎ আচ্ছাদিত করিল এবং পারসীকগণ, রোমীয়গণ ও হিন্দুগণ এই ভীষণ জাতির পরিচয় পাইল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূনগণ পঞ্জাবে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা সেই সময়ের ভ্রমণকারীদিগের পুস্তক হইতে জানা যায়।

অতএব কালিদাস যে খৃষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ বিশ্বাস অগত্যা ত্যাগ করিলাম। কালিদাস খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

ইতিহাসে দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে জগতে এক একটী মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। আধুনিক সময়ের মধ্যে ইউরোপে লুথরকৃত বিপ্লব ও

ফরাসীরাজবিপ্লব তাহার উদাহরণ স্থল। প্রাচীনকালে বুদ্ধকৃত বিপ্লব ও আলেকজাণ্ডার ও চন্দ্রগুপ্ত ও অশোককৃত বিপ্লব তাহার অন্য উদাহরণ। কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতেও সেইরূপ একটী বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল।

হূন জাতি এবং গথ ও সাক্‌সন জাতি এবং ফ্রাঙ্ক ও বাণ্ডল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির উৎপাতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রোম রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

বর্ব্বরগণ ইতালী প্রদেশ ছাইয়া পড়িল, এবং ফ্রান্‌স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে যেটুকু রোমীয় সভ্যতা দীপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল। অতএব পশ্চিম ইউরোপ কালিদাসের সময়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, প্রাচীন সভ্যতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, আধুনিক সভ্যতার ঊষাচ্ছটাও দৃষ্ট হয় নাই। ইউরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ ল্ নগরে ক্ষীণ রোমীয় সভ্যতা ও রাজত্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও স্তিমিত ও নিস্তেজ। তথাপি সেই সময়ের জষ্টিনিয়ন নামক রোমক সম্রাট বর্ব্বরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমীয় সভ্যতা ও রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন, এবং রোমীয়দিগের আইন সংগ্রহ করিয়া আপন নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপের ত এই দশা। আসিয়াতেও হূন ও তুর্কীদিগের উৎপাতে অনেক রাজা রাজ্যচ্যুত ও প্রাণে নষ্ট হইলেন। কিন্তু ৫৩১ খৃষ্টাব্দে নওশরবান পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শান্তি সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার বাহুবলে পারস্য রাজ্য সিন্ধুতীর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিল। এব· তিনি হিন্দু, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে লাগিলেন।

জষ্টিনিয়ন ও নওশরবানের সমকালিক সম্রাট রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনিও বর্ব্বরদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা রক্ষা করিলেন, এবং তিনিও শাস্ত্র ও কাব্যালোচনা দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াচেন।

পাঠকগণ এখন দেখুন খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিপ্লব কিরূপ। ঘোর বর্ব্বরদিগের উৎপাতে জগৎ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, তাহার মধ্যে তিন জন মহাত্মা সম্রাট্ বাহুবলে সেই বর্ব্বরদিগকে প্রতিহত করিয়া প্রাচীন রোমীয়, পারসীক ও হিন্দু সভ্যতা রক্ষা করিতেছেন। তিনজন সম্রাট্ই কাব্যপ্রিয় এবং কবিশ্রেষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত, এবং তাঁহাদের সময়ের কাব্য অদ্যাবধি রোমে, পারস্যে ও ভারতবর্ষে আদৃত।

এইরূপে অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তুলনা করিয়া পাঠ করিলে আমরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে পারি, এবং ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি স্থির করিতে পারি। ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি, কেবল একটী কথা বলিতে বাকী আছে। যে সময়ে জষ্টিনিয়ন কনষ্টাণ্টিনোপ্‌লে, নওশরবান্ পারস্য দেশে, এবং বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, আরব দেশে সেই সময়ে একটী শিশু মাতৃ স্তন্যপান করিয়া মক্কানগরের পথে ঘাটে খেলিয়া বেড়াইত। সেই শিশুর নাম মুহম্মদ, এবং কালক্রমে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপরি উক্ত তিনটী দেশ, এবং আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অন্যান্য নানা দেশে মুসলমান জয় পতকা উড্ডীন করিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে সভ্যজগতের কিরূপ অবস্থা তাহা আমরা বলিলাম। ভারতবর্ষের তখন কিরূপ অবস্থা তাহা কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রঘুবংশ ও মেঘদূতে তাৎকালিক ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ ও অনেক জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় ঐরূপ একটি বিবরণ আছে, নবীনবাবুকৃত [নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর] তাহার সুন্দর অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

৩৪

এইরূপে বহু দেশ পূরব অঞ্চল
অতিক্রমি রঘুরাজ চতুরঙ্গ দলে,
উত্তরিলা অবশেষে সাগরের পার
তাল বনে পূর্ণ যাহা ঘোর অন্ধকার।

৩৫

বাঁচাইলা নিজ প্রাণ সুখী দেশপতি[১]
প্রণমিয়া পরন্তপ রঘুর চরণে,
প্রচণ্ড নদীর বেগে বাঁচে রে যেমতি
বিনম্র বেতসলতা নমি কায়মনে।

১। বঙ্গদেশের কোন এক রাজা।

৩৬

পরাজিলা রঘুরাজ নিজ ভুজবলে
তরীযোগে সমাগত বঙ্গ রাজদলে,
নির্ম্মিলা বিজয়স্তম্ভ দ্বীপের উপরে
শত মুখে যথা গঙ্গা পশেন সাগরে।

৩৭

উন্মূলিয়া শালি ধান্য রোপিল আবার
দেখ যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ
প্রণমি রঘুর পদে প্রসাদে তাহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য তাঁরে দিলা বহুধন।

৩৮

বাঁধিয়া হস্তীর সেতু দিলীপনন্দন
সসৈন্যে সুবর্ণরেখা হইলেন পার ;
লইল উৎকলরাজ শরণ তাঁহার,
কলিঙ্গের[১] পথ তাঁরে করে প্রদর্শন।

৩৯

কাঁপিল মহেন্দ্র গিরি সেনা পদ ভরে
গিরিশিরে প্রতাপ প্রকাশে রঘুবীর
যেমতি গম্ভীর বেদী দ্বিরদের শিরে
নিবেশে অঙ্কুশ-ধার নিষাদী সুধীর।

৪০

যুঝিলা মাতঙ্গপৃষ্ঠে কলিঙ্গ ঈশ্বর
প্রহারিলা নানা অস্ত্র রঘুর শরীরে
বর্ষিছিলা শিলা রাশি যেমতি ভূধর
গিরি-পক্ষ ছেদকালে ইন্দ্রের উপরে

১। বঙ্গদেশ হইতে মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

৪১

কলিঙ্গের বাণবৃষ্টি সহি বীরবর
শরজালে হইলা জর্জ্জর কলেবর
জয়ার্থে সে বাণে স্নান করিয়া যেমতি
জিনিলা কলিঙ্গনাথে সূর্য্যকুলপতি।

৪২

লভি জয় রঘুসেনা উল্লাস অন্তরে
রচিল আপন ভূমি পর্ব্বত শিখরে
পান করি নারিকেল-সুরা মুগ্ধকরী
তাম্বুলের পত্রপুটে শত্রু যশঃ হরি।

৪৩

মুক্তি দিলা কলিঙ্গেরে দিলীপ নন্দন
স্বরাজ্য তাঁহারে রঘু দিলা পুনর্ব্বার
জয়লক্ষ্মী একমাত্র করিলা হরণ
বীরধর্ম্মে . না হরিলা রাজত্ব তাঁহার।

৪৪

পূর্ব্বদিকে জয় করি কোশল রাজন্
চলিলা দক্ষিণে (যথা অগস্ত্য উদয়)
পয়োনিধি-উপকূল করিয়া আশ্রয়
পূগময় তটপথে চলে সেনাগণ।

৪৫

রাজসৈন্য সমাগমে কাবেরী তটিনী
জলক্রীড়া বিলোড়িতা সাগর-ভামিনী
গজমদে বিলাসের সৌরভ বিস্তারে
সন্দিগ্ধ সাগর তাই হেরি এ নদীরে।

৪৬

উত্তরিলা রঘুবীর মলয় অচলে[১]
শোভে যার উপত্যকা অতি মনোহর
কলরবে এল বলে উড়ে শুকদলে
সেনা সন্নিবেশ হেথা কৈলা বীরবর।

৪৯

দক্ষিণে ভানুরও তেজ হয় ম্রিয়মান
তথায় প্রচণ্ড তেজা পাণ্ড্য রাজগণ[২]
কে পারে তাঁদের তেজ করিতে দমন
রঘু হস্তে সেই তেজ হইল নির্ব্বাণ।

৫০

তাম্রপর্ণী[৩] নদীগর্ভে সাগর মিলনে
জনমে যে মুক্তা, যাহা যশোরাশি প্রায়
সঞ্চয়িলা পাণ্ড্যরাজ, দিলীপ নন্দনে
দিলা আজি উপহার নমি তাঁর পায়।

৫৩

চলিল পশ্চিমে সেনা ছাড়ি সহ্যগিরি[৪]
সমুদ্র প্রবাহ প্রায়; যেই পারাবার
জামদগ্ন্য শরে দূরে গিয়াছিল সরি
সেনা-স্রোতে সহসনে মিলিল আবার।

৫৪

রাজসৈন্য ভয়েতে কেরল নারীগণ
বেশ ভূষা ছাড়ি ব্যস্তে করে পলায়ন
পাছে ধায় সেনাদল ধূলারাশি হায়
লাগিছে তাদের কেশে কুঙ্কুমের প্রায়।

১। ভারতবর্ষের দক্ষিণে মলয় অচল।

২। ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণে পাণ্ড্য জাতির রাজ্য ছিল। মাডুরা নগর তাহাদের রাজধানী, রোম রাজ্যের সহিত পাণ্ড্যদিগের বাণিজ্যাদি ছিল।

৩। সিংহল দ্বীপের প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী। প্রাচীন গ্রীকগণ এবং চীন ভ্রমণকারীগণ সিংহল দ্বীপকে এই নাম দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। সহ্যগিরি—পশ্চিম ঘাট।

৫৯

মদ মত্ত করিগণ দন্তের প্রহারে
লিখিয়াছে শত ক্ষত ত্রিকূট অচলে
রঘুর বিজয়কীর্ত্তি বর্ণনের ছলে
জয়স্তম্ভরূপে অদ্রি দিক শোভাকরে।

৬০

পারস্যের[১] রাজকুলে করিবারে জয়
স্থল পথে তথা রঘু করিলা গমন
তত্ত্বজ্ঞানে পথে যথা চলে যোগিজন
করিতে ইন্দ্রিয়-রূপ রিপুর বিজয়!

৬১

যবনীর[২] মুখ-পদ্মে মদরাগ ছটা
ঘুমাইলা রঘুরাজ যবনে বিনাশি
অকালে ঢাকিলে সূর্য্যে জলদের ঘটা
ফোটে কি বালার্ক রাগে কমলের হাসি।

৬২

অশ্বপৃষ্ঠে মহাবল যবন নিকর
যুঝিল রঘুর সহ আঁধারি অম্বর
উঠিল ধূলার রাশি না চলে নয়ন
শিঙ্গারবে শত্রুপক্ষে মিলে সেনাগণ।

৬৩

চলিল উত্তরে রঘু লয়ে সেনাগণে
জিনিতে উদীচী দেশে নৃপতি নিকরে
তীক্ষ্ণশরে যথা রবি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
শোষিয়া উদক্ রাশি চলেন উত্তরে।

১। কালিদাসের সময়ে পারস্যরাজ নওশরবানের রাজ্য ভারতবর্ষের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২। বাকট্রীয়াদেশের গ্রীকগণকেই হিন্দুগণ প্রথমে যবন (Ionion) বলিত। তাহারা পশ্চিম ভারতবর্ষে সর্ব্বদা যুদ্ধ ও রাজ্য অধিকার করিত। তাহারা শ্বেতবর্ণ; কবি তাহাদিগের রমণীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

৬৭

সিন্ধুতীরে গড়াগড়ি দিয়া কুতূহলে
ভুলিল পথের শ্রম তুরঙ্গ নিকরে
লেগেছে কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম কেশের
কাঁপাইয়া স্কন্ধ তাই দ্রুত বেগে চলে।

৬৮

হূনদেশে বীরগণে বধি রণস্থলে[১]
লভিলা অতুল যশ কোশল রাজন্
পতিহীন হূনাঙ্গনা বদন মণ্ডলে
শোকজাত রক্ত আভা করি আরোপণ।

৬৯

না পারি রঘুর তেজ সহিতে সমরে
নাম তাঁর পদাম্বুজে কাম্বোজের[২] পতি
নমিল অক্ষোট বৃক্ষ তাহার সংহতি
যাহে বেঁধেছিল রঘু মাতঙ্গ নিকরে।

৭০

লভিলা কাম্বোজে জিনি কোশল ঈশ্বরে
উপহার স্বর্ণ রাশি চারু অশ্ব দল
অপার ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল করতল
গরব রহিত তবু তাঁহার অন্তরে।

১। হূনগণ খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে সভ্যজগতে অবিদিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। কালিদাসের সময়, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূনদিগের পঞ্জাবে একটি হূন রাজ্য ছিল। ইহাদিগের মুখ রক্তিমবর্ণ, কবি তাহা কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

২। কাবুল প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ। তাহারা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা তাৎকালিক ভারতবর্ষের অনেক দেশের কথা জানিতে পারিলাম। সুহ্মদেশ ও বঙ্গদেশ, সুবর্ণরেখা পারে উৎকল ও কলিঙ্গ, কাবেরী পারে পাণ্ড্য রাজ্য ও পশ্চিমে কেরল রাজ্য, পশ্চিম দিকে পারসীক, যবন, হূন ও কাম্বোজ জাতিগণ,—এই সকলের পরিচয় পাইলাম। এইরূপে রঘুবংশের অন্যান্য অংশ এবং মেঘদূত পাঠ করিলে ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত অনেক দেশ ও অনেক জাতির কথা জানিতে পারি। আমাদিগের প্রাচীন কাব্যগুলি আদরের ধন, যত্ন সহকারে সেগুলি অনুশীলন করিলে তাহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারি॥

ভারতী ও বালক :
পৌষ, ১২৯৯

কবি ভবভূতি

ভারতবর্ষের কাব্যজগতে কালিদাস ও ভবভূতি কবিশ্রেষ্ঠ। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইখানি অসামান্য, অতুল্য ও অনন্ত কাব্যরত্নখনি ছাড়িয়া দিলে, সংস্কৃত আর কোনও গ্রন্থই শকুন্তলা ও উত্তরচারিতের সমতুল নহে। কল্পনাপটু ও কারুণ্যরসপ্রধান হিন্দু কবিদিগের কল্পনা হইতে শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের ন্যায় সুন্দর কাব্য কখন নিঃসৃত হয় নাই। হিন্দুজগতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকটেই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের যেরূপ আদর, অন্য কোনও কাব্যের সেরূপ আদর নাই।

অনেক প্রগল্‌ভ বালক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়? প্রশ্নটী শুনিলে, বিবাহের সময় যে জিজ্ঞাসা করে, বর বড়, না কনে বড়,—সেই কথাটা মনে পড়ে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বর বড় হইতে পারেন, মাধুর্য্য ও কমনীয়তায় কনে বড়। বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিতে কখন কখন বর বড়, অনেক সময়ে কনে বড়। লেখাপড়ায় এতদিন বর বড় ছিল, এখন বলা যায় না, অনেক কনে "বি এ"-উপাধি সম্প্রাপ্তা! কাব্য ও উপন্যাস লেখায় আজকাল কনে বড়,—আমরা হার মানিয়াছি।

কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়, এ কথা সহজে মীমাংসা করিবার যোগ্য নহে; প্রগল্‌ভ বালকে যাহাই বলুক, যাঁহারা কবিত্বের মর্ম্ম হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন। অনেক গুণে কালিদাস বড়, আবার অনেক গুণে ভবভূতি বড়। কালিদাসের রচনা মধুর ও সুললিত, ভবভূতির রচনা সেরূপ মধুর নহে, স্থানে স্থানে কর্কশ। কালিদাসের উপমাগুলি যেন উপবনে রাশি রাশি বন্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ বিচিত্র, সেইরূপ সুগন্ধ ও সুন্দর—হৃদয় মুগ্ধকারী। ভবভূতির সেরূপ উপমাচাতুর্য্য নাই। তদ্ভিন্ন কালিদাসের কল্পনায় যেন আবিষ্কার-ক্ষমতা অধিক আছে, কল্পনা হইতে যে জগৎটী যখন সৃষ্টি করেন, কি কণ্বমুণির আশ্রম, কি উমার জন্মস্থান, কি যক্ষের প্রবাসভূমি, সে জগৎটী যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, পাঠক সেই জগতে বিচরণ করিতে করিতে যেন বহির্জগৎ ভুলিয়া যান, তাহার প্রাণমন কবির জগতে স্নিগ্ধ ও আনন্দিত হয়। ভবভূতির কল্পনায় এরূপ আবিষ্কারক্ষমতা নাই। আরও বোধ হয়,

মানব হৃদয়ের সরলতা, কমনীয়তা, মধুরতা বর্ণনা করিতেও কালিদাস ভবভূতি হইতে সুপটু, এবং বহির্জগৎ বর্ণনায় কালিদাস অতুল্য। উদাহরণস্থলে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার হৃদয়ের সরলতা ও কমনীয়তা দেখ, এবং যক্ষবর্ণিত ভারতবর্ষের শৈল ও নদী, পুরী ও প্রান্তরের বর্ণনা দেখ।

এই সমস্ত গুণে কালিদাস বড়, কিন্তু ভবভূতিও নির্গুণ নহেন। মানব-হৃদয়ের তীব্র তেজ, তীব্র দর্প, তীব্র দুঃখ বর্ণনায় ভবভূতি কালিদাসকে পরাস্ত করেন। মালতীমাধবে যেরূপ ভয়াবহ বর্ণনাসমূহ আছে, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতার বনবাসে যেরূপ দুঃখের পর অধিকতর দুঃখের উচ্ছ্বাসে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতা ও রামের প্রগাঢ় প্রণয়, তাহাদের বিচ্ছেদে ভীষণ বেদনা, তাহার পর পূর্ব্ব কথা স্মরণে রামচন্দ্রের হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা, এ সমস্ত যেরূপ ভবভূতির তীব্র লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কালিদাসের লেখনীর সেরূপ ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। শকুন্তলার শোক বর্ণনা সীতার শোক বর্ণনার সমতুল নহে ; দুষ্মন্তের মনস্তাপ রামচন্দ্রের মনস্তাপের নিকট যৎসামান্য বোধ হয়। ফলতঃ মনুষ্য হৃদয়ের তীব্র ও গভীর ভাবগুলি বর্ণনা করিতে ভবভূতি ভারতবর্ষে অতুল্য। যে গুণে ইংরাজী কবিদিগের মধ্যে শেক্সপীয়র প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, সে গুণ ভারত কবিদিগের মধ্যে ভবভূতির অধিক পরিমাণে আছে। 'ওথেলো' পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় যেরূপ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়, উত্তররামচরিত পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় সেইরূপ ব্যাকুল ও অধীর হইয়া উঠে। আমরা কবিদ্বয়ের দোষগুণ বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে কে বড় তাহা ছাঁদনাতলার সুন্দরীগণ নির্ণয় করিয়া লইবেন। এখন কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা, হিন্দুদিগের অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করে। কবিগণ আকাশ হইতে পড়েন নাই, এই আমাদের হিন্দু সমাজেই বাস করিতেন, হিন্দু রাজাদিগের সভা ভূষিত করিতেন, হিন্দু শ্রোতাদিগকে তুষ্ট করিতেন। কোন্ সময়ের কি প্রকার সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ রাজার সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। কালিদাসের কথা আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র লিখিয়াছি। খৃষ্টের অনুমান ৫৫০ বৎসর পর যখন বিক্রমাদিত্য রাজা, বিদেশীয় আক্রমণকারীগণকে পরাস্ত ও বিদূরিত করিয়া সিন্ধুতীর হইতে মগধ প্রদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, যখন উজ্জয়িনী-রাজধানীতে

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে জড় করিলেন, তখন সেই পণ্ডিত-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস সেই সভায় বিরাজ করিতেন। বিদ্যার আলোক, জ্ঞানের আলোক, কাব্যের আলোক সেইকালে যেরূপ ভারতক্ষেত্রে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, সেরূপ তাহার পর আর কখনও হয় নাই।

সেই সময়েই, কালিদাসের কিছু পূর্ব্বে, মগধ দেশে পাটলীপুত্র নগরে জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং পৃথিবী যে প্রত্যহ ঘুরিতেছে এ কথাও তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়। আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন, "নৌকারোহী ব্যক্তি যেরূপ নদীর তীরের দিকে চাহিয়া মনে করে, তীরস্থ স্থির-বস্তুগুলি পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, সেইরূপ পরিবর্ত্তমান জগতের লোকে মনে করে যে, আকাশের স্থির তারাগুলি প্রত্যহ সরিয়া যাইতেছে. অর্থাৎ উদয় হইয়া অস্ত যাইতেছে।"

আর্য্যভট্টের পর বরাহমিহির নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত কালিদাসের সময়ের লোক, এবং বিক্রমাদিত্যের সভার এক পণ্ডিত ছিলেন। পাঁচটী প্রাচীন সিদ্ধান্ত একত্রিত করিয়া তিনি "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন. এবং "বৃহৎসংহিতা" নামক আর একটী গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃহৎসংহিতায় নানা কথা আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের কথাও আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক নানা হিন্দুদের, অর্থাৎ রাম, বলি, বিষ্ণু, বলদেব, সুভদ্রা, সাম্ব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, পার্ব্বতী, বুদ্ধদেব, সূর্য্য, লিঙ্গ, যম, বরুণ, কুবের এবং গণেশের কথা, এবং তাহাদিগের প্রতিমাগঠনের নিয়মাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহিরের পর ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, এবং "ব্রহ্ম স্ফুটসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ত গেল জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা। অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ আলোচনা হইতেছিল। বৈয়াকরণ বররুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, কেন না, নাটকাদিতে তখন প্রাকৃত ভাষার চলন হইতেছিল। অমরসিংহ তাঁহার চিরস্মরণীয় অভিধান লিখিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে রচিত সুন্দর মন্দির তাঁহারই নির্ম্মিত এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। ধন্বন্তরী

বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত উজ্জয়িনীর সভা আলোকিত করিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্যের সেই পণ্ডিতমণ্ডলীবেষ্টিত সভায় যখন কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হইত, অথবা জগতে অতুল্য বর্ণনাকাব্য মেঘদূত যখন মেঘগম্ভীর শব্দে পঠিত হইত, তখন ভারতবর্ষের গৌরবের দিন, ভারতবাসীদিগের কি সুখের দিন ছিল!

ভারবিও সেই সময়ে, কি তাহার কিছু পরে "কিরাতার্জ্জুনীয়" রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার দেশকাল ঠিক করা যায় না। খৃষ্টের ৬১০ খৃষ্টাব্দ পরে হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নামক আর একজন প্রসিদ্ধনামা সম্রাট্ ভারতসাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে মগধপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং কান্যকুব্জ তাঁহার রাজধানী ছিল।

হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তখন বিশেষ দ্বেষভাব ছিল না। এখন যেমন অনেক হিন্দু বৈষ্ণব হয়, তখন সেইরূপ অনেক হিন্দু বৌদ্ধ হইত। বৈষ্ণবগণ যেমন সংসারত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইতে পারে, অথবা সংসারে বাস করিতে পারে, বৌদ্ধগণ সেইরূপ সংসারী হইয়া থাকিত, অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুকী হইয়া মঠে বাস করিত। ভারতবর্ষে তখন অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং মগধদেশে নালন্দার যে প্রসিদ্ধ মঠ ও বিনয় বিদ্যালয় ছিল জগতে সে সময়ে সেরূপ বিদ্যামন্দির ছিল না। একজন চীন ভ্রমণকারী সেইকালে নালন্দার মঠে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "এখানে সমস্ত দিনে শাস্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর শেষ হয় না, প্রাতঃসন্ধ্যা এখানে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক চলিতেছে, বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরকে শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতেছে।" এই চীন ভ্রমণকারী বহুবৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান নগর দর্শন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি হিন্দুদিগের দেবমন্দির এবং বৌদ্ধদিগের মঠ ও বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট শিলাদিত্য বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তিনি কান্যকুব্জে যে একটী বৌদ্ধ মহাপূজা সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিংশ জন রাজা আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগণ অনেকেই হিন্দু ছিলেন, কামরূপ বা আসাম দেশের রাজা খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধ পূজায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না, কেন না, সেকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী অঙ্গমাত্র ছিল। এই পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী নাটক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন।

সম্রাটের নামে এ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, "ধাবক" নামক তাঁহার একজন সভাস্থ কবি নাটকখানি রচনা করিয়া দিয়াছিল। সে যাহা হউক নাটকখানি মধুর ও সুললিত তাহার সন্দেহ নাই। তবে কালিদাসের অতুলনীয় কবিত্বশক্তি এ নাটকে দৃষ্ট হয় না।

ভর্ত্তৃহরির শতকগ্রন্থগুলিও এই সময়ে রচিত হয়। এবং আমরা যাহাকে ভট্টিকাব্য বলিয়া জানি, সে কাব্যখানিও কবি ভর্ত্তৃহরির রচিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ভট্টি" শব্দটী "ভর্ত্তৃ" শব্দের রূপান্তর মাত্র। শিলাদিত্যের সময়ে পদ্যরচনারও অভাব ছিল না। প্রাচীন পঞ্চতন্ত্রের সরল ও সুললিত গদ্য ছাড়িয়া এ সময়ের লেখকগণ একটু জঁাকাল রকম গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "দশকুমার চরিত"-লেখক দণ্ডী বোধ হয় শিলাদিত্যের রাজ্যকালেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। "কাদম্বরী"-রচয়িতা বাণভট্ট শিলাদিত্যের একজন সভাসদ্ ছিলেন, এবং তিনি "হর্ষচরিত" নামক শিলাদিত্যের একটী জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছু পরে সুবন্ধু "বাসবদত্তা" রচনা করেন।

পাঠক একবার শিলাদিত্যের সময়ের গৌরব অনুভব করিয়া দেখুন। যে সময়ে ভারতক্ষেত্রের সমগ্র সম্রাট আহূত হইয়া কান্যকুব্জের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে সৌহৃদ্য ছিল, এবং নগরে নগরে হিন্দু দেবালয় ও বৌদ্ধ মঠ ও বিহার বিরাজ করিত, যে সময়ে উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং নালন্দা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা হইত, যে সময়ে সম্রাটের রচিত রত্নাবলী রাজসভায় অভিনীত হইত, ভট্টিকাব্য পাঠ করিয়া বালকগণ সুখে ব্যাকরণ শিক্ষা করিত, এবং দণ্ডী ও বাণভট্টের বিশাল ও সগর্ব্ব সংস্কৃত ভাষা সভাপণ্ডিত-দিগের মন পুলকিত করিত,—ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন স্মরণ করুন।

তাহার পর ৭০০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সভায় একজন মাত্র প্রসিদ্ধ কবি ছিল, কিন্তু সেই এক কবি জগদ্বিখ্যাত ভবভূতি! বিদর্ভদেশে ভবভূতির জন্ম, এবং বিদর্ভদেশের মন্ত্রীপুত্র মাধবই তাঁহার রচিত "মালতী মাধব" নামক গ্রন্থের নায়ক; কিন্তু কান্যকুব্জ তখন ভারতবর্ষের রাজধানীস্বরূপ, সুতরাং ভারতবর্ষের কবিশ্রেষ্ঠ কান্যকুব্জে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তথায়ও ভবভূতি চিরকাল থাকিতে

পারিলেন না। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, কান্যকুব্জরাজ পরাস্ত হইলেন এবং বিজেতা ললিতাদিত্য কান্যকুব্জের প্রধান রত্ন ভবভূতি-কবিকে কাশ্মীরদেশে লইয়া গিয়া মহাদরে তাঁহাকে রাজসভায় স্থানদান করিলেন। এইরূপে সরস্বতীর প্রভাবে কবি ভবভূতি বিদর্ভ হইতে কান্যকুব্জে, এবং কান্যকুব্জ হইতে কাশ্মীর দেশে নীত হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কতকটা জানিতে পারিলাম। ৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ এই দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান কবি ও পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা জানিলাম। বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন, শিলাদিত্য ও যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যের বিষয় জানিলাম। বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও শাস্ত্রালোচনার কথা জানিলাম। উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ, নালন্দা ও কাশ্মীরের গৌরবের কথা শুনিলাম। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত, কালিদাস, অমর সিংহ, বররুচি ও ভারবি, শ্রীহর্ষ, ভর্ত্তৃহরি, দণ্ডী ও বাণভট্ট এবং বিদর্ভদেশবাসী অতুল্য কবি ভবভূতির কথা জানিলাম।

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস যদি এইরূপে শিখিতে পারি তবে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। হিন্দুসাহিত্য ও সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস যদি এইরূপে পড়িতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা কেবল সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংস, বা পলাশীর যুদ্ধের কথাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না।

সাধনা :
মাঘ, ১২৯৯

উন্নতির যুগ

ইতিপূর্ব্বে আমরা কালিদাস ও ভবভূতির যুগ আলোচনা করিয়াছি। সেই যুগে ভারতবর্ষে যেরূপ খ্যাতনামা কবি, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লোকসকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেরূপ জগতে সচরাচর এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সেই যুগেই আরব দেশে মহম্মদ, পারস্য দেশে নওশেরবান এবং রোমরাজ্যে প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সে যুগটিকে মনুষ্য সমাজের একটী বিশেষ উন্নতির যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মনুষ্য জাতির ইতিহাস সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ কয়েকটী বিশেষ উন্নতির যুগ লক্ষিত হয়। মনুষ্য সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এই উন্নতির ফল যেন পাঁচ সাত শতাব্দীর পর এক একবার পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এবং যে যে কালে এই উন্নতির পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয় সেই কালকেই উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। সেই উন্নতির যুগগুলি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১। খৃষ্টের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগতের মধ্যে কেবল চারিটী দেশে প্রকৃত সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। নীল নদীকূলে প্রাচীন মিসরবাসিগণ মেম্ফিসনগর স্থাপন করিয়া এবং সুন্দর ও প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীকূলবাসী প্রাচীন কাল্ডীয়গণও সেই প্রাচীনকালে জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। হোয়াংহো কূলবাসী প্রাচীন চীনগণও সেইকালে যে প্রাচীন সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাতে পূর্ব্ব-আসিয়া আলোকময়। এবং সিন্ধুনদীকূলে প্রাচীন হিন্দুগণ সেইকালেই যে সুন্দর সংস্কৃত ভাষার সুন্দর ধর্ম্মগাথা রচনা করিয়াছিলেন, আর্য্যজগতে তাহা অদ্যাপি সমাদৃত, এবং হিন্দুজগতে তাহা অদ্যাপি সনাতন ধর্ম্মের মূল। জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আজিও যে সভ্যতার আলোক প্রভা পাইতেছে তাহার প্রথম জ্যোতি, প্রথম স্ফুলিঙ্গ, প্রথম প্রদীপ চতুষ্টয় এই চারি দেশে চারি জাতি দ্বারা প্রদীপ্ত

হইয়াছিল। একটী হেমেটিক্ জাতি, দ্বিতীয় সেমেটিক্ জাতি, তৃতীয় তুরাণীয় জাতি, চতুর্থ আর্য্য জাতি।

২। ইহার পর সাত কি আট শত বৎসরে কি ফললাভ হইল দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৩০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইয়াছিল সেই কালের জ্ঞানোন্নতি আলোচনা করা যাউক। এই যুগে সমস্ত সভ্যজগতে যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে কুরু ও পাঞ্চাল, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি অনেক সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে বাস করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণাদি সঙ্কলন করিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন। চীনদেশে এই সময়ে যে "চাউ" রাজবংশ দেশের অধীশ্বর হইলেন, সে বংশ অদ্যাবধি চীন ইতিহাসে বিখ্যাত ও সম্মানিত। মিসরদেশে এই যুগে প্রসিদ্ধনামা সিসষ্ট্রিস-বংশীয় রাজগণ দেশ শাসন করিতেন এবং কার্ণাক প্রভৃতি স্থানে যে বিস্ময়কর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ফার্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় হর্ম্ম্যবিদ্যাবিশারদ্ পণ্ডিতগণ তাহা জগতে অতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আসিরিয় রাজগণ এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিজয় বিস্তার করেন। হিটীয়গণ এই যুগে আসিয়া-মাইনর প্রদেশে যে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়।

গ্রীক এবং ট্রোজানগণ এই যুগে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন তাহারই কাল্পনিক বর্ণনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদিপুস্তক হোমরের ইলিয়দ। ফিনিসীয়গণও এই যুগে ভূমধ্য সাগর পার হইয়া আটলাণ্টিক সাগরে প্রথম বাণিজ্য বিস্তার করেন, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নগর স্থাপন করেন। এবং ইহুদীগণ এই যুগে প্রসিদ্ধনামা দায়ূদ রাজার অধীনে চারিদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সে দায়ুদের ধর্ম্মগাথাগুলি জগতে অদ্যাপি সমাদৃত।

৩। আর ছয় শত বৎসর অতিক্রম করিয়া দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬০০ হইতে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই তিন শত বৎসরের কথা আলোচনা করা যাউক। এই যুগের উন্নতি, ধর্ম্মশিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা অতি বিস্ময়কর। এই যুগে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়, এবং গৌতম বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস লইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম সংগঠিত করিলেন, তাহা হইতে অদ্য জগতের লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। চীন দেশে এই যুগে কনফিউশস্ যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচার করেন, তাহা অদ্যাপি জগতে সমাদৃত। গ্রীস

দেশে এই যুগে পিথাগোরস ও সক্রেটিস এবং প্লেটো ও আরিষ্টটল দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন। হিরডোটস, থিউসিডিডিস ও জেনফন এই যুগে ইতিহাস রচনা করেন। পিণ্ডার, সফোক্লিস, ইস্কিলস, ইউরিপিডিস এই যুগে কাব্য রচনা করেন। ফিডিয়াস এই যুগে হর্ম্ম্য ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণে জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করেন। পেরিক্লিস এই যুগে এথেন্‌স্ নগর শাসন করিয়া কীর্ত্তি লাভ করেন। এবং প্রসিদ্ধনামা আলেক্‌জাণ্ডর এই যুগে সভ্যজগৎ জয় করিয়া গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে অশোকরাজা জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই যুগের মধ্যে বাবিলনীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট নেবুকজ্‌নজার পশ্চিম-আসিয়াতে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং বাবিলনে যে হর্ম্ম্য ও উদ্যানাদি প্রস্তুত করেন তাহা প্রাচীনকালে অমানুষিক বলিয়া বোধ হইত। মিসরবাসিগণ এই কালে ফিনিসীয়দিগের সাহায্যে সমস্ত আফ্রিকা অর্ণবপোত দ্বারা পরিক্রমণ করিলেন, এবং আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির পুনঃসঙ্কলন করিলেন। পারসীক রাজা সাইরস এই যুগে পশ্চিম আসিয়াতে বহুবিস্তীর্ণ পারসিক রাজ্য স্থাপন করিলেন। সম্রাট দারায়স জেন্দাবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের পুনঃসঙ্কলন করিলেন, এবং ইহুদিগণ এই যুগে প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক (Old Testament) প্রথমে লিপিবদ্ধ করিলেন। আমরা আজকালের সভ্যতার বড় দর্প করি, আজকাল রেল হইয়াছে, জাহাজ হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষে বুদ্ধ, কনফিউশ্যস্ ও সক্রেটিসের যুগ অপেক্ষা মহত্তর যুগ কখন জগতে দৃষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

৪। তাহার চারি পাঁচ শত বৎসর পরের যুগ একবার আলোচনা করা যাউক। খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ও কিছু পরে সভ্যতার কি কি ফললাভ হইয়াছিল দেখা যাউক। এই সময়ে ভারতবর্ষে ও মিসরদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক আলোচনা হইয়াছিল, এবং যে অষ্টাদশ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত অদ্যাপি রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তাহার প্রারম্ভ এই যুগে। কাশ্মীরদেশে এই যুগে কণিষ্ক রাজা শকাব্দের আরম্ভ করেন, এবং মালবদেশে এই যুগে সম্বৎ আরম্ভ হয়। বীরপ্রসবিনী রোমনগরী এই কালে বহুবীর-সমাকীর্ণ ছিল। জুলিয়াস সিজার, পম্পী, এণ্টনী, অগষ্টস সিজার প্রভৃতি যোদ্ধাগণ ইতিহাসে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। সিসিরো বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয় এবং ভর্জ্জিল ও হোরেস কাব্যে অদ্বিতীয়। এবং এই যুগে যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ

করিয়া জগতে শান্তি প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অদ্য ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্ম।

৫। খৃষ্টের পর পাঁচ শত হইতে আট শত বৎসর পর্য্যন্ত যে যুগ তাহাকে আমরা উন্নতির পঞ্চম যুগ বলি। ভারতবর্ষে এটী কবি কালিদাস ও ভবভূতির যুগ। পারস্যদেশে মহাবলপরাক্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওশরবান্ এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজ্য বিস্তার ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন এই যুগে রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এবং তাঁহার সংকলিত রোমক রাজনীতি অদ্যাপি অধীত হইতেছে। আরবদেশে এই যুগে ধর্ম্মাত্মা মহম্মদ যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, অচিরে তাহা সিন্ধুনদীর তীর হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগের শেষভাগে বাগ্‌দাদে হারুণ অল রসীদ, স্পেনে আব্দুর রহমান ও ফ্রান্সে শার্লমান নামক পরাক্রান্ত সম্রাটগণ সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

৬। ইহার প্রায় সাত আট শত বৎসর পরে আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইল। ভারতবর্ষে তখন প্রসিদ্ধনামা আকবর শাসন করিতেন এবং চৈতন্য প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ইউরোপে লুথর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার করিলেন, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, কোপর্ণিকাস ও গালিলিও জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিলেন, বেকন ও ডেকার্ট্ বিজ্ঞানালোচনা করিলেন, ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ শেক্ষপীয়র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হেতু জনসমাজে জ্ঞানবিস্তারের অনেক সুবিধা ঘটিল।

৭। তাহার তিন চারি শত বৎসর পর আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। এই যুগে বল্টেয়র ও রুসোর পুস্তকাবলী পাঠে ইউরোপীয় সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইল, ও ফরাসী বিপ্লবে জগৎ বিপর্য্যস্ত হইল। ওয়াসিংটন আমেরিকা স্বাধীন করিলেন, নেপোলিয়ন যুদ্ধবিদ্যায় অমানুষিক শক্তি প্রদর্শনে ইউরোপকে স্তম্ভিত করিলেন। বিজ্ঞানালোচনায় নিউটন, লাপ্লাস, কিউবিয়ে ও ডারউইন; সাহিত্যে গেটে, শিলর, বাইরণ ও ভিক্টর হিউগো এবং দর্শনে হিউম, কাণ্ট ও হেগেল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন, গারিবল্ডী ইতালী স্বাধীন করিলেন, বিস্মার্ক জর্ম্মণিকে একীভূত করিলেন, সমস্ত জগতে মানব স্বাধীনতার মহামন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, যিনি এই যুগ কয়েকটীর বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন তিনি মনুষ্যের প্রকৃত ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাট্‌দিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে; এবং ক্রমশঃ যে উন্নতি লাভ করা যায় তাহা এক একটী বিশেষ যুগে যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে। পথভ্রমণের সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে মাইল-প্রস্তর দৃষ্টে কতদূর ভ্রমণ করা হইল তাহা জানা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক পাঁচ কি ছয় কি আট শতাব্দীর পর এক একটী বিশেষ উন্নতির যুগে মনুষ্য-সমাজের উন্নতি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এবং সেইগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে মনুষ্যসমাজের উন্নতির সমস্ত ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়।

যে সাতটী যুগের উল্লেখ করা গেল, হিন্দুগণ তাহার এক একটী হিন্দু নাম দিতে পারেন। প্রথম যুগটী বৈদিক যুগ; দ্বিতীয়টী মহাভারতীয় যুগ; তৃতীয়টী গৌতম বুদ্ধের যুগ; চতুর্থটী কণিষ্ক রাজার যুগ; পঞ্চমটী কবি কালিদাসের যুগ; ষষ্ঠ চৈতন্য ও নানকের যুগ; সপ্তম রাজা রামমোহন রায়ের যুগ।

প্রতি যুগে ভারতবর্ষে যে মহাত্মা ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষের সনাতন গৌরবের এবং ভবিষ্যৎ আশার হেতুস্থল।

সাধনা:
চৈত্র, ১২৯৯

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

অবিমিশ্র সন্তোষের সহিত না হউক, কিয়ৎপরিমাণ গর্ব্বের সহিত ইংরাজেরা ভারতবর্ষে তাঁহাদের শাসনফল পর্য্যালোচনা করিবার অধীকারী। লোকসমাজে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক,—শান্তি—তাহা তাঁহারা ভারতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এমন একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাতে সংস্কারের আবশ্যকতা থাকিলেও, তাহা দৃঢ় ও কার্য্যকর। তাঁহারা উত্তম আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। দেশময় বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন—যাহার দেশীয় ও বিদেশীয় বিচারকর্ত্তাগণ নিরপেক্ষতায় ও সাধুতায় কোন দেশের তুলনায় ন্যূন নহেন। এই ফলসমন্বয় প্রত্যেক সমালোচকেরই প্রশংসার যোগ।

অপর পক্ষে, কোনও নিরপেক্ষ ইংরাজই, ভারতবাসীর অর্থগত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, সে সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর আর কোনও দেশে নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে যে সকল দুর্ভিক্ষ ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে তাহার বিস্তার ও তীব্রতার তুলনাও ইতিহাসে নাই।

অর্থনীতিবিদ্ কোনও দেশের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইলে সচরাচর কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? জিজ্ঞাসা করেন,—কৃষিকার্য্য কি উন্নতি লাভ করিতেছে? শিল্পাদির অবস্থা কিরূপ? শাসনকর্ত্তাগণ দেশের ধনবৃদ্ধির পথ বিস্তৃত করিতেছেন ত? রাজকোষের আয়-ব্যয় প্রণালী কি প্রকার—প্রজাগণ যে পরিমাণ রাজকর দেয়, তাহার অনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হয় কি?—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুসন্ধান করিলে এই সকল প্রশ্নই জিজ্ঞাস্য। সর্ব্বদেশে যে অর্থনীতি বলবতী,—ভারতেও তাহাই। অন্যান্য দেশে যে সকল কারণে ধনবৃদ্ধি হয়, ভারতেও সেই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইবে, যে সকল কারণ অন্যদেশে দারিদ্র্য আনয়ন করে, সেই সকল কারণ ভারতবাসীকেও দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে যে ভারতবাসীর ধনাগমের পথ নানাপ্রকারে সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কোনও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় রাজ-কর্ম্মচারীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ

শুধু একটি সুবৃহৎ শস্যপ্রসূ ভূমি ছিল না,—ভারতীয় শিল্পজাত এসিয়া ও ইউরোপখণ্ডের নগরে নগরে বিক্রয় হইত। ইংরাজের স্বার্থান্ধতায় ক্রমে ক্রমে আমাদের সে শিল্প কেমন করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে* দেখাইয়াছি। তাহার পর, আমরা যখন ইউরোপের অনুকরণে বস্ত্রাদি বয়নের বাষ্পযন্ত্র সংস্থাপন করিলাম,—তখন ইংলণ্ডীয় তন্তুবায়গণ মহাভীত হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ সালে তাহাদের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট আমাদের স্বনির্ম্মিত তুলাজাতের উপর কর বসাইয়া দিলেন। জাপান ও চীনের সঙ্গে আর আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কৃষিই এখন ভারতবাসীর একমাত্র ধনাগমের পথ। শতকরা ৮৫ জন লোক এখন স্বতঃ বা পরতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের ভূমিকর শুধু যে অত্যধিক তাহা নহে, আবার অনিশ্চিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ভূমিকর এক পাউণ্ডে এক সিলিং হইতে চারি সিলিং পর্য্যন্ত ছিল,—অর্থাৎ জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা ৫৲ হইতে ২০৲ অবধি ছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কর স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হইয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা ৯০৲ পরিমাণ এবং উত্তর ভারতে ৮০৲ পরিমাণ রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল। কর ধার্য্য বিষয়ে ব্রিটিশরাজ যে মুসলমান বাদশাহগণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিভিন্নতা এই যে মুসলমান রাজ যাহা চাহিতেন তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতেন না, কিন্তু ব্রিটিশরাজ যাহা চাহিলেন তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ মুসলমান রাজা তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৬৪ খৃঃ) ভূমিকর স্বরূপ ৮১,৭৫,৫৩৩৲ টাকা আদায় করিয়াছিলেন,—সে সময় হইতে ত্রিশ বৎসরে ইংরাজরাজ বঙ্গের বার্ষিক ভূমিকর ২,৬৮,০০,০০০৲ টাকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও অন্য কতিপয় জেলা ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেন। এই সকল জেলার মুসলমান নবাব বার্ষিক ১,৩৫,২৩,৪৭০৲ টাকা দাবী করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সেই জেলাগুলি হইতে বার্ষিক ১,৬৮,২৩,০৬০৲ টাকা আদায় করিলেন। এই দাবী ও আদায়গত পার্থক্য ছাড়া আরও একটি বিশেষ পার্থক্য ইংরাজ ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে রহিয়াছে। মুসলমান যাহা আদায় করিতেন তাহা ভারতবর্ষেই ব্যয়

*'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৮'।—সম্পাদক।

করিতেন—দেশের লোকের হস্তে আবার ফিরিয়া যাইত ; ইংরাজ যাহা আদায় করেন, তাহার একটি বৃহৎ অংশ ইংলণ্ডে আসিয়া ব্যয়িত হয়। কালিদাস বলিয়াছেন—

প্রজানামেবভূত্যর্থং সত্যভ্যোবলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ॥

সকল জাতিই আশা করে যে দেশ হইতে সংগৃহীত কর দেশেই ব্যয়িত হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে সর্ব্বাপেক্ষা উৎপীড়নকারী রাজার সময়েও ভারতবাসী যাহা দিত তাহা ফিরিয়া পাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাঁহারা ভারতবর্ষকে ব্যবসায়ের জিনিষ স্বরূপ গণ্য করিতেন। বড় বড় রাজকার্য্যে নিজেদের লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায় বন্ধ হইল, এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত "পলিসি" অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মূলধন ফিরাইয়া দিলেন। সেই ভারতের জাতীয় ঋণের সূত্রপাত। ব্রিটিশরাজ বণিকগণের নিকট হইতে ভারতরাজ্য ক্রয় করিলেন,—কিন্তু মূল্য কে দিল? ভারতবাসী দিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইল। তাহার পর ৪০ বৎসর ধরিয়া অবিরাম শান্তি, অথচ ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে ৩০০ কোটি টাকা। হোম চার্জ্জ যাহা বৎসর বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, তাহার পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা। উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন—উচ্চ রাজকর্ম্ম বলিতে গেলে সবই ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত—তাহারও পরিমাণ দশ কিম্বা বার কোটি টাকা। ভারতের বার্ষিক রাজস্ব (Net Revenue) ৬৫ কোটি টাকা—তাহার অর্দ্ধাংশ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতের রাজসূর্য্য যে অর্থবাষ্প শোষণ করিতেছেন, তাহা ভারতে বৃষ্টি স্বরূপ না পড়িয়া অন্য দেশে পড়িতেছে —অন্য দেশকে ফলশালী ধনশালী করিয়া তুলিতেছে।

প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাঁহাদেরই সব দোষ যে তাহা নহে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হেষ্টিংস—উপর্য্যুপরি তিনজন গভর্ণর জেনারল ভারতবর্ষের ভূমিকর স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি উঠিয়া যাইবার পরও তিনজন গভর্ণর জেনারল—লর্ড ক্যানিং, লর্ড লরেন্স, লর্ড রিপণ এ প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু ভারতসচিব তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে তিনবার ভারতীয় "টেরিফ" ইংরাজ বণিক ও কারিগরগণের আজ্ঞানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শুধু যে ভারতবাসীর অমতে, তাহা নহে,—গভর্ণর জেনারলের সদস্যসভার অধিকাংশ সভ্যের অমতে। আসাম চা বাগানের কুলিগণের দুরবস্থার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহাতে তাহাদের কষ্টলাঘব হয়, তিনবার গভর্ণমেণ্ট সেরূপ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি আসামের চীফ্ কমিশনর অনরেবল্ মিষ্টার কটন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন—আইনও পাস হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ চা-করগণের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় লর্ড কর্জ্জন দুই বৎসর সে আইন বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গভর্ণর জেনারলগণ নাচার • তাঁহারা যাহা করিতে চান তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না।

ভারতীয় শাসনকর্ত্তাগণ ভারতবাসীদিগের নিকট হইতেও যথেষ্ট অবলম্বন ও সাহায্য প্রাপ্ত হন না। প্রজার সহিত গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক যোগ নাই। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অর্থে ভাইসরয় ও তাঁহার সদস্য সভার ছয় জন সভ্য। সকলেই গভর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী—গভর্ণমেণ্টের স্বার্থসাধনে যত্নবান, প্রজার স্বার্থের প্রতিনিধি কেহ নাই। সকল সভ্যই, কোন না কোনও ব্যয় বিভাগের শীর্ষস্থানীয়। এই সভ্যগণ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। প্রজার স্বার্থের প্রতি যে তাঁহাদের কতকটা দৃষ্টি আছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে যে বিভাগের অধিপতি, সেই সেই বিভাগের স্বার্থরক্ষা,—অস্বচ্ছলতা নিবারণ করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের স্বাভাবিক। শক্তিগুলি সমস্তই ব্যয়ের মুখে নিয়োজিত। ব্যয় সঙ্কোচের মুখে কোনও শক্তিই নিযুক্ত নাই। এই সভায় যাহা কিছু ধার্য্য হয়, তাহা আদালতে "একতর্ফা ডিক্রীর" মত। সভার সভ্যগণ পারদর্শী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কিন্তু বিজ্ঞতম বিচারকও, শুধু এক তরফের বক্তব্য শুনিয়া, সদ্বিচার করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং অনেক সময়ে যে প্রজার স্বার্থ পদদলিত হইয়া যায় ইহার আর বিচিত্র কি?

আমরা এক* প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন—

"The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as the government of one people by

* 'বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কাল'—সম্পাদক।

another does not and cannot exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle firm to be worked for the profit of its own inhabitants."

এই তীব্র উক্তির মধ্যে, প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকিতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ একটিও নাই। মনুষ্যজাতি এখনও পর্য্যন্ত এমন কোনও উপায়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই যাহাতে শাসিতের স্বার্থ বিপদশূন্য হয়।—সে স্বার্থকে বিপদশূন্য করিতে হইলে, বিজিত জাতিকে শাসনভারের কিয়দংশ বহন করিতে দিতেই হইবে—ইহাই একমাত্র প্রতিকার।—এই প্রকার জেতৃশাসন শুধু যে বিজিতের পক্ষে হানিজনক তাহা নহে,—জেতৃগণ নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষের সংস্রবে, বাণিজ্যই ইংলণ্ডের প্রধান স্বার্থ। গত দশ বৎসর ধরিয়া, এই বাণিজ্য প্রায় বৃদ্ধিহীন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যে পঞ্চবর্ষের শেষ হইয়াছে, সেই পঞ্চবর্ষে ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি (যদিও সমস্ত নহে—তথাপি অধিকাংশই ইংলণ্ড হইতে) চারি কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী পঞ্চবর্ষের বার্ষিক গড়পড়তা চারি কোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড মাত্র হইয়াছে। হিসাবে দাঁড়ায়, প্রত্যেক ভারতবাসী, ইংলণ্ডের নিকট, বৎসরে আন্দাজ তিন সিলিংয়ের মাল খরিদ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি এমন উপায় অবলম্বন করেন যে ভারতবাসী ধনশালী হয়, তবে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে পাঁচ ছয় সিলিংয়ের মাল ইংলণ্ডের নিকট নিশ্চয় ক্রয় করিতে পারে। দরিদ্রতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রবলতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্য যে ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিবে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের অনেকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ নিজস্ব করিয়াছেন। এখনি সহজে অনুমান করা যায়—সময়ক্রমে এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবে—কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও ইংরাজেরই থাকিবে। বিজ্ঞ জনেরা উপনিবেশকে বৃক্ষের ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—যথা সময়ে পাকিয়া পড়িয়া যাইবে।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলির ধনজনবল যেরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে—তাহাতে, যদি কোনও ভবিষ্যৎবক্তা বলেন যে অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা কানাডা বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের অধীনে থাকিবে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সাহসী। ভারতবর্ষ কিন্তু বাস্তবিকই এখন দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য সমুৎসুক। "আমাদের শাস্ত্রে আছে রাজভক্তি পরম ধর্ম্ম," ইত্যাদি ইত্যাদি, সেন্টিমেণ্টের জন্য নহে—স্পষ্ট বলিতে সঙ্কোচ নাই,—স্বার্থেরই জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাধুসঙ্গমে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ করিবার আছে। আমরা ইংলণ্ডের সহিত আমাদের অদৃষ্ট মিলাইয়াছি—আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি বৃটিশ শাসন ভারতে স্থায়ীত্বলাভ করুক। তবে আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। এ প্রণালী ৭০ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ৭০ বৎসরে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে; দেশের শিক্ষিত লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা তাহাদের স্বদেশের উচ্চ রাজকর্ম্মে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে চাহে। সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্ত্তৃসভায় তাহারা তাহাদের কণ্ঠ উত্থিত করিতে চাহে। তাহাদের এই দাবী অগ্রাহ্য করা সহজ। এইরূপে এই ক্ষমতাবান্ জনাংশের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখা সহজ। তাহাদের সাহায্য না লইয়া—সাম্রাজ্যের এই শক্তিকে অবহেলা করিয়া—ক্ষীণভাবে শাসন করা সহজ। কিন্তু এরূপ না করাই বিজ্ঞের কার্য্য হইবে। এতটা শক্তি অপচয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ভারতবাসীকে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের শিল্প, তাহাদের কৃষির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া উচিত। তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগকেই দায়ী করা উচিত, তখন যদি দুর্ভিক্ষ হয়, আর ভারতবাসী বলিতে পাইবে না 'রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ হইল।'

ভারতবাসীরা হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহে। একটা অসাধারণ কিছুর আবদার তাহাদের নাই। তাহারা বর্ত্তমান প্রথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার চাহে মাত্র। তাহারা চাহে যে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তি মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হউক; রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ স্থাপিত হউক। তাহারা গভর্ণর জেনারলের সদস্য সভায় কতিপয় ভারতবাসীকে সদস্যরূপে দেখিতে চাহে। তাহারা প্রত্যেক প্রদেশের সদস্য সভায় ভারতবর্ষীয় সদস্য দেখিতে চাহে। শাসন বিষয়ক সমস্ত বাদানুবাদে তাহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে চাহে।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে এই সভাগুলিতে কতিপয় নির্ব্বাচিত ভারতবাসী প্রবেশ লাভ করেন। এই প্রণালী সন্তোষজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি যদি আরও বিস্তৃতিলাভ করে, তবে রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হইবে এবং রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে কুড়ি হইতে চল্লিশটি করিয়া জেলা আছে। এক এক জেলায় দশ লক্ষ বা তাহারও অধিক জনসংখ্যা।—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য, সকল জেলা না হউক, বৃহৎ বৃহৎ জেলাগুলি একটি করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৺মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে, সমস্ত উচ্চ রাজকর্ম্মে ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নামতঃ প্রবেশাধিকার না দিয়া, কার্য্যতঃ দেওয়া উচিত। সিবিল সার্ব্বিস, শিক্ষা বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ, ডাক বিভাগ প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভারতবাসীর উন্নতি অব্যাহত হওয়া উচিত। এই সকল বিভাগে ইংরাজও যে প্রয়োজন তাহার কোনই সন্দেহ নাই। আমাদের সহায়স্বরূপ, নেতাস্বরূপ, আমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব। তবে তাঁহারা যে ঐ সকল পদগুলি একচেটিয়া করিয়া লইবেন, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। বাৎসরিক হাজার টাকা বা তাহার অধিক বেতনের যতগুলি রাজকর্ম্ম আছে তাহাতে বেতন ও পেন্সনে ইংরাজগণ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড পান, আমরা পাই ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি ইহা নিতান্ত অবিচার।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আছে, এবং অনেক গ্রামে গ্রামসমিতি গঠিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে এরূপ সমিতি বা মণ্ডলী (Village Community) ছিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যকালে দেশময় এইরূপ স্বায়ত্ত শাসনকারী মণ্ডলী বিস্তৃত ছিল। ইংরাজ শাসনে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। এই নূতন গ্রামসমিতিগুলি সেই পুরাতন মণ্ডলীরই অনুকরণ। গভর্ণমেণ্ট যদি যত্নের সহিত ও বিশ্বাস স্থাপনের সহিত সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন তবে দেশের অনেক মঙ্গল হয়। এই সমিতিগুলিকে কতকটা ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের হস্তে কোনও কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যভার দেওয়া যাইতে পারে। গ্রামে যে সমস্ত দেওয়ানি ও

ফৌজদারী বিবাদ উপস্থিত হয়, সে সকলের—বিচার ভার নহে—আপোসে মিটমাট করিয়া দিবার ভার এই গ্রাম-সমিতিগুলিকে দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা স্থানীয় অভিজ্ঞতা সহযোগে সহজে উচিত মীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম হইবে। সাক্ষিগণ দূর আদালতে যাওয়ার কষ্ট ও পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবে। সর্ব্বোপরি, এই গ্রাম-সমিতি, রাজা ও প্রজার আন্তরিক যোগের সেতু স্বরূপ হইবে।

ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রজার সহিত অধিকতর সংযোগে আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সমধিক লোকপ্রিয়, লোকহিতকর ও দৃঢ় করিবার জন্য, এই কতিপয় উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। ভূতকালে বিজ্ঞতম শাসনকর্ত্তাগণ,—যেমন মন্‌রো, এলফিন্‌ষ্টোন্, বেণ্টিঙ্ক,—ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া, দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান ছিলেন। মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেই পন্থার অনুসরণই এখন আবশ্যক। সমস্ত সভ্য দেশেই, সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিবার পক্ষে জনসাধারণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। অন্য দেশের পক্ষে যাহা প্রয়োজন—ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা আরও অধিক প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্যবিচারে যে পরিমাণ সাবধানতার আবশ্যক, রোগীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সাবধানতা অবলম্বনীয়। ভারতবর্ষ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ-পীড়ায় জর্জ্জরিত।

ভারতী :
ফাল্গুন, ১৩০৮

বৃটিশ-শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি

জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই প্রধানতঃ দুইটি উপায়ের উপর নির্ভর করে। একটি কৃষিকর্ম্ম,—অপরটি শিল্প। যদি কোনও জাতি এই দুইটি উপায়ের একটি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই জাতির অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। যে জাতির শিল্প নাই শুধু কৃষিকর্ম্মই অবলম্বন, তাহাদের উপার্জ্জনের অর্দ্ধপরিমিত উপায় ত বন্ধ। শস্যোৎপাদনই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হইলে, যে বৎসর ভাল শস্য হইল না সে বৎসর উপবাস ত ধরা কথা। আমাদের সেই অবস্থাই হইয়াছে, বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, এবং দেড় কোটি মনুষ্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ইংলণ্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের এই শিল্পহানির একটি কারণ। ইংরাজ শিল্পজীবী জাতি—আমাদের শিল্প যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,—ইংলণ্ডের শিল্পের পক্ষে ততই সুবিধা—ততই অধিক কাটতি। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ রেশম ও তূলার বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা ছাড়া আরও বহুপ্রকার শিল্পজাত, সমস্ত এশিয়াখণ্ডে এবং ইউরোপের তাবৎ প্রধান নগরে, বিক্রয়লাভ করিত। কিন্তু ভারতের শাসনভার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হইবামাত্র তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৭৬৫ সালে বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তগত হয়। চারি বৎসর পরেই—অর্থাৎ ১৭৬৯ সালে—কোম্পানির ডিরেক্টারগণ তাঁহাদের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের পত্রে কর্ম্মচারগিণকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—"বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসায়কে উৎসাহিত এবং রেশম বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করা হউক।"—আরও আদেশ হইল "যাহারা রেশম কাটে, তাহাদের সকলকে কোম্পানির কলকারখানায় কার্য্য করিতে বাধ্য করা হউক। যদি কেহ এ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র এ কার্য্য করে, তবে সে কঠিন দণ্ড পাইবে।"*

হাউস্ অব কমন্সের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মতে, এই আদেশের ফলে—শিল্পজীবী ভারতবর্ষের সমগ্র মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া, গ্রেট ব্রিটেনের কলের জন্য উপকরণ দ্রব্যের (সূতা ইত্যাদি) উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।†

---

* **Ninth Report** of the Select Committee of the House of Commons on Administration of Justice in India, 1783. **Appendix 37.**

† Ninth Report, Page 64.

ভারতের নূতন রাজা, স্বার্থলোভে ভারতের সম্বন্ধে যে অবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহা তাহাদের ঈপ্সিত ফলও প্রসব করিল। রেশম ও তুলার বস্ত্র বয়ন ভারতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। যে জাতি পূর্ব্বে অন্য জাতিকে বস্ত্র পরাইত, সে জাতিকে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইতে হইল। ১৭৯৪ হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ মূল্যের বস্ত্র ইংলণ্ড § হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অঙ্কপাত নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া গেল।

বষ শেষ ৫হ জানুয়ারা

১৭৯৪	...	১৫৬০ টাকা	১৮০৪	...	৫৯৩৬০ টাকা
১৭৯৫	...	৭১৭০ „	১৮০৫	...	৩১৯৪৩০ „
১৭৯৬	...	১১২০ „	১৮০৬	...	৪৮৫২৫০ „
১৭৯৭	...	২৫০১০ „	১৮০৭	...	৪৬৫৪৯০ „
১৭৯৮	...	৪৪৩৬০ „	১৮০৮	...	৬৯৮৪১০ „
১৭৯৯	...	৭৩১৭০ „	১৮০৯	...	১১৮৪০৮৭ „
১৮০০	...	১৯৫৭৫০ „	১৮১০	...	৭৪৬৯৫০ „
১৮০১	...	২১২০০০ „	১৮১১	...	১১৪৬৪৯০ „
১৮০২	....	১৬১৯১০ „	১৮১২	...	১০৭৩০৬০ „
১৮০৩	...	২৭৮৭৬০ „	১৮১৩	...	১০৮৮২৪০ „

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের "ইণ্ডিয়ান ব্লু বুক"গুলির পাতা উল্টাইলে, নববিজীত প্রজাগণের মধ্যে স্বীয় শিল্পবিস্তারকল্পে নূতন বণিকরাজের অসাধারণ আগ্রহ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই বইগুলির মধ্যে একখানি অতীব কৌতূহলপ্রদ। ১৮১৩ সালে হাউস অব্ কমন্সে এক বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভায় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, সার জন ম্যালকম, স্যার টমাস মনরো প্রভৃতির মত সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই বৎসরের পূর্ব্বে ৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতে বারম্বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সাক্ষ্যগ্রহণের বৎসরেও বম্বে প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। এই সভায় অনুসন্ধানের বিষয় কি ছিল? ভারতবাসীর কিসে উন্নতি হইবে, পুরাতন লুপ্তপ্রায় শিল্পাদি কিসে পুনরুজ্জীবিত হইবে, কি উপায়ে দুর্ভিক্ষ দমন ও প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষা হইবে, এই সকল কি?

§ Return to an order of the House of Commons dated, 4th May 1813.

না—ইহার কিছুই নয়। বরং ঠিক ইহার বিপরীত। প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কি হইলে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, ভারতবাসী স্বকৃত শিল্পের পরিবর্ত্তে বিলাতী শিল্পজাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। এ ব্যাপারটা যদি আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানির বিষয় না হইত,—তাহা হইলে এই সাক্ষ্যের অনেকগুলি প্রশ্নোত্তর পাঠ বিশেষ আমাদের কারণ হইতে পারিত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে প্রশ্ন করা হয় ;—

"তুমি ত ভারতবাসীর চরিত্র ও অভ্যাসের বিষয় ভালরূপ অবগত আছ, তোমার কি মনে হয় ভারতবাসী নিজের ব্যবহারের জন্য বিলাতী মাল খরিদ করিবে ?"

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস উত্তর করেন :—

"প্রয়োজন সাধন কিম্বা বিলাস চর্চ্চার জন্যই লোকে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার করে। ভারতের দরিদ্র লোকের বলিতে গেলে কোনই 'প্রয়োজন' নাই। প্রয়োজনের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান, খাদ্য আর যৎসামান্য বস্ত্র ; এই সমস্ত দ্রব্যই তাহাদের পদতলের মৃত্তিকা হইতেই প্রাপ্তব্য।"

সার জন ম্যালকম ভারতবাসীর সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি বোধ হয় অতি অল্প ইংরাজই সেরূপ অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি অতি সহৃদয়তার সহিত ভারতবাসীর নানা সদ্‌গুণের বিষয় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী মনুষ্যগণ শুধু যে শারীরিক দৈর্ঘ্য (ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা ইহারা বরং দীর্ঘতরই হইবে) এবং বলিষ্ঠ গঠনের জন্য বিখ্যাত তাহা নহে, তাহারা অনেক উচ্চশ্রেণীর মানসিক গুণেরও অধিকারী। তাহারা সাহসী ও সহৃদয়, তাহাদের সত্যপ্রিয়তা তাহাদের সাহসেরই মত বিশিষ্টরূপে উন্নত।"—ভারতবাসীর বিলাতী মালের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"বিলাতী দ্রব্যের ক্রেতা হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একে ত তাহাদের জীবন-প্রণালী অতি সাদাসিধা। যদি বা তাহাদের এসব দ্রব্য প্রয়োজনও হইত, তাহা হইলে তাহারা কিনিতে পারিত না, কারণ সে সামর্থ্য তাহাদের নাই।"

গ্রেম মার্সার নামক ব্যক্তি অনেক বৎসর ভারতবর্ষে ডাক্তারি করিয়াছিলেন। রাজস্ব ও শাসন বিভাগেও তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যে প্রকাশ, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্‌লী বিলাতী শিল্প বিস্তারকল্পে রোহিলখণ্ডে এক মেলা বসাইয়া ছিলেন,

সে মেলায় বিলাতী পশমী দ্রব্যের এক প্রদর্শনী ছিল। বলা বাহুল্য ভারতীয় শিল্পজাতের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েলেস্‌লী বা কোনও ইংরাজ শাসনকর্ত্তারই এতদনুরূপ উদ্যমশীলতা দেখা যায় নাই।

উল্লিখিত সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে কর্ণেল মন্‌রোর সাক্ষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য (কর্ণেল মন্‌রো কালক্রমে মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা হন এবং স্যর উপাধি প্রাপ্ত হন)। তৎসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও ইংরাজই বোধ হয় ভারতবাসী সম্বন্ধে মন্‌রোর মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার যেমন ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সহানুভূতি ছিল, এমন আর কাহার ছিল? ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে তাঁহার মত যত্নশীলতা আর কে দেখাইয়াছেন? ইংরাজ সাধারণের মনে ভারতবাসী সম্বন্ধে একটা চির কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে,—হাউস্ অব কমন্সের সভ্যগণও সে কুসংস্কার হইতে মুক্ত নহেন। এই সভ্যগণ মন্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভারতে রমণীরা স্বামীর ক্রীতদাসীবৎ নহে কি?" মন্‌রো ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিয়াছিলেন—"না, তাহাদের অবস্থা, তাহাদের স্বামীর ক্রীতদাসীবৎ নহে। পরিবারবর্গের মধ্যে তাহাদের ক্ষমতা, এ দেশীয় রমণীগণের অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।" ভারতবাসীকে সভ্য করা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন—"যদি নিপুণ কৃষিপ্রণালী, শিল্পকৌশল, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় উদ্ভাবন ক্ষমতা, লিখন পঠন ও অঙ্কশিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, অতিথি সৎকার, দয়াধর্ম্ম, সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি বিশ্বস্ত সম্মানপূর্ণ আচরণ এইগুলি সভ্যতার চিহ্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা ইউরোপীয় জাতিগণ অপেক্ষা হীন নহে। যদি দুই দেশের মধ্যে সভ্যতার আমদানি রপ্তানিরই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমার ধারণা আমদানিতেই আমাদের দেশ লাভবান হইবে।"

ভারত সাম্রাজ্যরূপ যে সুদৃঢ় অট্টালিকা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি—এই সকল ব্যক্তিগণই এ অট্টালিকার ভিত্তি খনন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উক্তি ও লেখা প্রভৃতি হইতে একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সে পুস্তক আজি কালিকার ইংরাজদের অনেক কাজে লাগিবে। পূর্ব্বে ইংরাজরা ভারতে যথার্থ বাস করিতেন—এখন তাঁহারা প্রবাস করেন মাত্র। এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতে পৌঁছান যায় এবং প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। দেশের লোককে তাঁহারা ভাল করিয়া জানেন না—জানিতে চাহেনও না।

একটা বাহিরের আফিসগত যোগ আছে মাত্র অন্তরের যোগ নাই ;—সুতরাং সহানুভূতিও নাই।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা পথান্তরে পর্য্যটন করিতেছি। বাণিজ্য প্রসার সম্বন্ধে মন্‌রো উত্তর দিয়াছিলেন :—

"আমার মনে হয়, ভারতে বিলাতী দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে, মূল্যাধিক্য ছাড়া আরও কতিপয় বিঘ্নজনক কারণ বর্ত্তমান আছে। এই কারণগুলির মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব ধর্ম্মগত ও জাতিগত অভ্যাস বিভিন্নতা এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের নিজ শিল্পের নৈপুণ্য প্রধান।"

কিন্তু বণিক-রাজ উৎসাহ হারাইলেন না। বিলাতী মাল ভারতে প্রচলিত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্যজাত ভারতে প্রেরিত হইবে, তাহাতে অতি যৎসামান্য শুল্ক বসান হইল। অপর পক্ষে, ভারতের রপ্তানির উপর বিলক্ষণ শুল্ক চাপান হইল। মারে রাজা রাখে কে,—রাজা যখন এই রকম করিয়া ভারতীয় শিল্পের গলা টিপিয়া ধরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষা করিবে? এই নীতি অবলম্বনের ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে, কোম্পানিরই একজন ডিরেক্টার, হেনরি সেণ্ট জর্জ্জ টাকার নিম্নপ্রকার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ভারতের সংস্রবে আমরা কি বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছি? ভারতের রেশমীবস্ত্র এবং রেশম ও তুলামিশ্রিত বস্ত্রাদি বহুদিন হইতে আমাদের বাজার হইতে নির্ব্বাসিত। তুলার বস্ত্র কতদিন ভারতের একটা প্রধান শিল্প বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাহার উপর আমরা শতকরা ৬৭ টাকার শুল্ক বসাইয়া, এদেশে যে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছি তাহা নহে,—উৎকৃষ্ট কলের সাহায্যে সুলভে মাল তৈয়ারি করিয়া ভারতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রকারে শিল্পজীবী ভারতবাসিগণ কৃষিজীবীতে অবনত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই কি আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি? ইহাদের ভূমিজাত শস্যের পরিবর্ত্তে, উহাদিগকে আমাদের শিল্প দিয়াই কি ক্ষান্ত হইতেছি? না। ভারতবর্ষে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রস্তুতের খরচার উপর শতকরা ২০০৲ টাকার শুল্ক চাপাইয়া দিয়াছি। চিনির ব্যবসায়কে দমন করিবার উপায় অবলম্বনে, আমরা তুলার উৎপত্তিরও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতেছি। আমরা যেন সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের এসিয়াবাসী প্রজাগণকে বলিতেছি, 'আমরা তোমাদিগকে যাহা পাঠাইব,

তাহা তোমরা ক্রয় করিতে ও ব্যবহার করিতে বাধ্য। আমরা কিন্তু কয়েকটা জিনিষ ছাড়া তোমাদের কোনও দ্রব্য ক্রয় করিব না।' আমরা যদি ভারতের রাজা না হইতাম, যদি ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক থাকিত তাহা হইলেও এ ব্যবহার অতি অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা হইয়া যখন এরূপ ব্যবহার করিতেছি তখন ইহা অদ্ভুতত্বের চরমসীমা।"*

ভারতের ঐতিহাসিকগণও এই অবিচার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। মিলের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে গিয়া, অধ্যাপক এইচ্. এইচ্. উইলসন লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষ যে দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশ কর্ত্তৃক তাহার অনিষ্টসাধনের ইহা একটা দুঃখজনক দৃষ্টান্ত। (১৮১৩ সালের) সাক্ষ্যে প্রকাশ, সে সময় পর্য্যন্ত, ভারতীয় রেশম ও তুলার বস্ত্র, লাভ রাখিয়াও, তৎশ্রেণীয় বিলাতী মালের অপেক্ষা শতকরা ৫০৲ হইতে ৬০৲ নিম্ন মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিত। সুতরাং বিলাতী মালকে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতীয় মালের উপর শতকরা ৭০।৮০৲ টাকা শুল্ক বসান প্রয়োজন হইল। তাহা যদি না হইত, এই নিষেধসূচক শুল্ক যদি না বসিত, তাহা হইলে পেস্‌লি ও ম্যানচেষ্টারের কলগুলি আরম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত, এবং সেগুলিকে ষ্টীমের বলেও, পুনরায় চালান কঠিন হইত। ভারতীয় শীল্পের বলিদানে এই কলগুলির জন্ম। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সে প্রতিশোধ লইত। সেও বিলাতী মালের উপর নিষেধসূচক শুল্ক চাপাইয়া দিত। এই উপায়ে সে নিজের শিল্পজাতকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিত। এই আত্মরক্ষার কার্য্যটুকু ভারতবর্ষ করিতে পাইল না,—বিদেশীর কৃপায় তাহার নির্ভর। শুল্কহীন বিলাতী মাল লইতে সে বাধ্য হইল। বিদেশীয় কারিগর, রাজনৈতিক অবিচারের হস্ত ব্যবহার করিয়া, প্রতিযোগীকে দমন করিয়া রাখিল এবং শেষে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিল। ন্যায় যুদ্ধ হইলে তাহার জয়লাভের কোনই আশা ছিল না।"†

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই অবনতি দেখা গেল। তাহার পর রেলওয়ে খুলিতে আরম্ভ হইল। যেমন

---

* Memorials of the Indian Government being a selection from the papers of Henry St. George Tucker, London, 1853 P. 494,, et seg.

† Mill and Wilson's History of British India (London 1858.) Vol. VII. P. 385.

পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সেইরূপ ভারতেও, রেলওয়ে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। দূরত্বকে হ্রাস করিয়াছে, ভ্রমণকে সহজ, সত্বর ও সুলভ করিয়াছে। তা হইলেও, এই রেলওয়ে দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্টও ঘটিয়াছে। অনেক সময় রাজকোষ হইতে নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে ; যৌথ কারবারের মহাজনেরা রেল খুলিলে, তাহাদের লাভের অল্পতা ঘটিলে রাজকোষ হইতে তাহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই কার্য্যপ্রণালী হইতে যে আর্থিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি চক্ষু বুজিয়া থাকায় কোনও ফল নাই। প্রথমতঃ,—রেলওয়ে রাজকোষে অর্থক্ষতি আনায়ন করিয়াছে। ৫০ কোটি টাকারও অধিক, এই লোকসান পূরণের জন্য রাজকোষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। বার্ষিক লোকসান এখনও চলিতেছে।* দ্বিতীয়তঃ মালবহনের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ গোরুর গাড়ীওয়ালা, মাঝি প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত,—তাহাদের অন্ন গিয়াছে। লভ্যাংশ ইংলণ্ডের অংশীদারগণের আয় বৃদ্ধি করিতেছে। তৃতীয়তঃ, এই রেলওয়ের সাহায্যে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতী পণ্যজাত গিয়া পৌঁছিতেছে,—সুতরাং দেশীয় শিল্পাদির অবনতির পথ খুব প্রশস্ত হইয়াছে। ১৮৯৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে পরিমাণ রেলওয়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে খোলা প্রয়োজন, তাহা খুলিয়াছে।† তথাপি ভারত গভর্ণমেণ্টের শ্রান্তি নাই,—লাভ-আশা-হীন নূতন নূতন রেল খুলিয়া চলিয়াছেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ইংলণ্ডের ধনী ও সওদাগরগণ পার্লামেণ্টে ভোট দিবার অধিকারী। ভারতবাসীর সে অধিকার নাই। এখন যদি গভর্ণমেণ্ট ধনীমহাজনের হস্তে রেল নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় ; কিন্তু ভোটের ক্ষমতার উপর ন্যায় কবে জয়লাভ করিয়াছে ?

পৃথিবীর যে দেশেই হউক, যাহাদের শিল্পজাত সম্যক্ উন্নতিলাভ করে নাই,—তাহারা উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের শিল্প যাহাতে রক্ষা পায়, সে জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে। অপর পক্ষে, ভারতের শিল্পকে কখনও উৎসাহিত করা হয় নাই বা তাহার রক্ষার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। বিলাতী মূলধনের লাভের দিকে অতি সাবধান মনোযোগ

---

* See the last Blue Book on Indian Railways.

† Their Report, P. 370.

সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে। অসংখ্য কমিশন বসিয়া তুলা, নীল, কাফি, চা, চিনি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছে,—কি উপায়ে বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। ভারতের শিল্পের উন্নতির কল্পে কখনও কমিশন আহূত হয় নাই।

ভারতবাসিগণ প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, ষ্টীম ও কলের সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্বীয় শিল্পের উন্নতি করিতে যত্ন করিয়াছে। বোম্বাই ও বঙ্গে তুলার কল খোলা হইয়াছে; এই কলের উৎপন্ন মাল ভারতে এবং বাহিরে কিছু কিছু বিক্রয়ও হয়। এই নূতন উদ্যমের মঙ্গলকল্পে পার্লামেণ্টে কোনও রাজকীয় সমিতি বা কমিশন আহূত হয় নাই, যদি কোনও মন্ত্রীসভার রাজত্বে এইরূপ কমিশন আহূত হইত, তাহা হইলে অচিরাৎ সে সভার মন্ত্রিগণ ভোটের বলে স্থানচ্যুত হইতেন। ফলতঃ লাঙ্কাশায়ারের ভোটদাতাগণ ভারত গবর্ণমেণ্টকে এরূপ শুল্ক আইন প্রচার করিতে বাধ্য করিয়াছে,—যেরূপ আইন প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষী কোনও গভর্ণমেণ্ট পাস করিতে পারিত না।

এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় ভারতীয় শিল্প বিপন্ন। লোকে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে।—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিসের খরচ যোগাইবার জন্য,—ভারত হইতে অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের পেন্সনের জন্য,—বিলাতী মহাজনের মূলধনের সুদ যোগাইবার জন্য—রাশি রাশি ভারতীয় দ্রব্যজাত ইংলণ্ডে পাঠাইবার প্রয়োজন হইতেছে। নিম্নে একটি তালিকায় পণ্যে ও নগদ টাকায় ভারত হইতে কি পরিমাণ অর্থ বিলাতে প্রতিবৎসর প্রেরিত হয়, এবং বিলাত হইতে ভারতেই বা কি পরিমাণ প্রেরিত হয়, তাহার অঙ্কপাত দেওয়া হইল।*

***See Mr. Tozer's paper on Indian Trade read before the Society of Arts, London, on the 14th March 1901.**

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি ও রপ্তানি

বার্ষিক গড়পড়তা		ভারতে আমদানি মাল ও সোণা-রূপা	ভারত হইতে রপ্তানি মাল ও সোণা-রূপা	রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির আধিক্য অথবা ভারতের বার্ষিক শোষণ
১৮৫৯—১৮৬৩	...	৪১ কোটি টাকা	৪৩ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা
১৮৬৪—১৮৬৮	...	৪৯ " "	৫৭ " "	৮ " "
১৮৬৯—১৮৭৩	...	৪১ " "	৫৭ " "	১৬ " "
১৮৭৪—১৮৭৮	...	৪৮ " "	৬৩ " "	১৫ " "
১৮৭৯—১৮৮৩	...	৬১ " "	৮০ " "	১৯ " "
১৮৮৪—১৮৮৮	...	৭৫ " "	৯০ " "	১৫ " "
১৮৮৯—১৮৯৩	...	৮৮ " "	১০৮ " "	২০ " "
১৮৯৪—১৮৯৮		৮৮ " "	১১৩ " "	২৫ " "

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভারত হইতে বার্ষিক অর্থশোষণ, বিগত ৪০ বৎসরে ২ কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর উপার্জ্জন,—এ টাকা কোনও আকারে আর তাহাদের ব্যবসায় বা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিতে ফিরিয়া যায় না। বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের আয় ও মূলধনের পরিমাণই বৃদ্ধি করিতেছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, দুইটি দেশ একই রাজার শাসনাধীন। এক দেশের প্রজা তাহাদের বিপুল ও বর্দ্ধনশীল মূলধন পৃথিবীর কোথায় কিসে খাটিবে সেই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত,—অন্য দেশের প্রজা নিরন্ন উপায়হীন ;—চারি বৎসর অন্তর একবার করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ছারখার হইতেছে। এই কি দৃশ্য !

ভারতের সমগ্র রাজস্বের সহিত তুলনা করিলে উপরোক্ত সংখ্যাপাতের অর্থ আরও ভাল বুঝা যাইবে। ভারতীয় ব্যয় সম্বন্ধে সংপ্রতি রাজকীয় কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ভারতের রাজস্ব বার্ষিক ৫৭ কোটি টাকা, সুতরাং ভারতীয় সমগ্র রাজস্বের প্রায় একার্দ্ধ ভাগ পরিমিত ধন, বৎসর বৎসর ভারত হইতে শোষিত হইতেছে—অথচ তাহার বিনিময়ে ভারত এক কপর্দ্দকও পাইতেছে না। ঐ টাকায় ২৫ কোটি

ভারতবাসীর সম্বৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারে। যে দেশ হইতে এই ভয়ঙ্কর শোষণ হইতে থাকিবে, সে দেশ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দরিদ্র হইবে না, দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে না, ইহা কি সম্ভব? ভারতবাসীকে ভোট হইতে বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের যে শাসন করা হইতেছে—ইহাতে ভারতের কি মঙ্গল হইতেছে, না তাহা কখনও হওয়া সম্ভব?

ভারতী:
শ্রাবণ, ১৩০৮

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ

তাহার কারণ ও প্রতিকার

বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে দশবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অন্নহীনকে কর্ম্ম দিয়াছেন, অন্ন দিয়াছেন,—তথাপি মৃত্যুসংখ্যা ভয়ঙ্কর। সেই দশটা দুর্ভিক্ষের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) ১৮৬০ সালে ভারতের দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যা দুই লক্ষ বলিয়া প্রকাশ,—কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক অধিক।

(২) ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে গভর্ণমেণ্ট পনেরো মাস ধরিয়া অন্নদান করিয়াছিলেন তথাপি উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা —দশ লক্ষ মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(৩) ১৮৬৯ সালে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ। অনুমিত মৃত্যুসংখ্যা দ্বাদশ লক্ষ।

(৪) ১৮৭৪ সালে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ। লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকাল; তাঁহার সুব্যবস্থাক্রমে, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু নিবারিত হইয়াছিল। বঙ্গে ভূমিকর অল্প, তাহাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। সুতরাং প্রজাগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল।

(৫) ১৮৭৮ সালে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ প্রজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে ভূমিকর অত্যন্ত অধিক,—তাহাও ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এ প্রদেশের প্রজাগণ নিরন্ন, উপায়হীন। গভর্ণমেণ্ট অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;—যাহারা খাটিবে, তাহাদের পারিশ্রমিক প্রথমে, দিনে দুই আনা করিয়া ধার্য্য হয়। দুই আনায় তখন তিন পোয়া চাউল প্রাপ্তব্য। সার রিচার্ড টেম্পল গিয়া ব্যবস্থা করেন, তিন পোয়া চাউলের কোনও আবশ্যক নাই, আধসের চাউলই যথেষ্ট। এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থাতে এবং প্রজাদিগের নিঃস্বতাহেতু, যেরূপ ভয়ঙ্কর জীবন নাশ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৬) ১৮৭৮ সালে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ।

(৭) ১৮৮৯ সালে উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যার কোনও সরকারি তালিকা নাই ; প্রজাক্ষয় যথেষ্টই হইয়াছিল।

(৮) ১৯৯২ সালে মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষ। বঙ্গে অনাহারে মৃত্যুর কথা শুনা যায় নাই ;—মান্দ্রাজে মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য বারের অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল।

(৯) ১৮৯৭ সালে মান্দ্রাজ, বম্বে, উত্তর ভারত, বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের যখন অত্যন্তই প্রকোপ, তখন সাহায্যপ্রাপ্তির সংখ্যা ত্রিশ লক্ষে উঠিয়াছিল। বঙ্গে এবং অন্যত্র মৃত্যু নিবারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু মধ্য-ভারতে বাৎসরিক মৃত্যুর হার প্রতি মাইল ৩৩ জন হইতে ৬৯ জন পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

(১০) ১৯০০ সালে পঞ্জাব, রাজপুতানা, বম্বে এবং মধ্য প্রদেশের দুর্ভিক্ষ। এরূপ সুদূরব্যাপী দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ষষ্টিলক্ষ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি সার এ. পি. ম্যাকডনেল এবার দুর্ভিক্ষে মৃত্যু বিষয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মাছির মত (ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ) মরিয়াছে !"

দশ বৎসরের পর এবার ভারতবর্ষের প্রজাগণনা হইল। ১৮৯১ সালের লোক গণনায় দেখা গিয়াছিল, যে দশ বৎসরের মধ্যে লোক সংখ্যা শতকরা ১১ জন করিয়া বাড়িয়াছে। এবার দেখা যাইতেছে, এ দশ বৎসরে শতকরা একজন মাত্র বাড়িয়াছে। সুতরাং গত পূর্ব্ব দশ বৎসরের হার অনুসারেও যাহা হওয়া উচিত, তাহার অপেক্ষা তিন কোটি মনুষ্য কম।

পূর্ব্বে কি ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় নাই ? পূর্ব্বেও হইয়াছে। তখন কারণ ছিল। যখন মোগল রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলায় দেশ লণ্ডভণ্ড, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। কিন্তু সে সব কারণ এখন ত অন্তর্হিত। এখন কতকাল ধরিয়া শান্তি বিরাজমান,—প্রজাগণ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান, মিতব্যয়ী—তথাপি দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইতেছে না। ইহার কারণ কি ?

কেহ কেহ বলেন—ভারতের লোক 'রাখিয়া খাইতে জানে না, উত্তমর্ণের বড় উপদ্রব, লোক সংখ্যা বড় দ্রুত বর্দ্ধমান।' ইহার একটাও কাজের কথা নহে। আমাদের দেশের মত মিতব্যয়ী, অল্পে তুষ্ট কৃষক কোন্ দেশে আছে ? ফলতঃ আমরা যতই মিতব্যয়ী হইতেছি, ততই গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের উপর করবৃদ্ধি করিবার সুবিধা পাইতেছেন। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা,—অধিকাংশ

দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোক সংখ্যা ধীরতর,—দ্রুততর নহে। আর উত্তমর্ণের উপদ্রব, সে ত দারিদ্র্যের ফল,—দারিদ্র্যের কারণ নহে। লোকে খাইতে পায় না বলিয়াই ঋণ করে, ঋণ করে বলিয়া খাইতে পায় না, শুনিতে বড়ই অদ্ভুত।

দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অবশ্য বৃষ্টির অভাব। শাসনকর্ত্তাগণ কেহ কেহ বলেন—"তোমাদের দেবতায় মারিয়াছেন—আমরা করিব কি?"—কিন্তু দেবতার আক্রমণ হইতে প্রজারক্ষা করিতে গভর্ণমেণ্ট কি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না?

বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

পততি কদাচিন্নভসঃ
খাতে পাতালতোঽপি জলমেতি।
দৈবমচিন্ত্য বলবদ্
বলবান্নতু পুরুষকারোঽপি।

দেবতা যদি অনাবৃষ্টির ব্যবস্থা করেন, পুরুষকার মাটি খুঁড়িয়া জল বাহির করিতে কেন পশ্চাৎপদ হইবে? যদি আমাদের দেশে—অন্ততঃ যে সকল অংশে অনাবৃষ্টির প্রকোপ অধিক—সর্ব্বত্র প্রচুর জলপ্রণালী ও কূপাদি খনন করা হয়,—তাহা হইলে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্দ্দৈব হইতে আমরা অনেকটা বাঁচিতে পারি না কি?

তাহা ছাড়া এ ঘোর লোকধ্বংসের কারণ অন্নকষ্ট তত নহে ত—অর্থকষ্টই বাস্তবিক কারণ। অন্নের ত অভাব হয় না, মূল্য বৃদ্ধি হয় বটে। আমাদের দেশের লোক এত দরিদ্র বলিয়াই ঝাঁকে ঝাঁকে মরিয়া গেল বৈ ত নয়। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, সে বৎসর কৃষক যদি খাইয়া পরিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলে ত দুর্ভিক্ষের বৎসর তাহাকে অনাহারে মরিতে হয় না। কিন্তু এ সঞ্চয় করিতে সে অক্ষম। আমাদের এ দারিদ্র্যের প্রতিবিধান করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রাণরক্ষা করিবেন না কি? এ দারিদ্র্যের প্রতিবিধান করিবার তিনটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) ভূমিকরের হ্রাস।

(২) জলপ্রণালী ও কূপাদি খনন।

(৩) বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার হ্রাস। আমরা যথাক্রমে এই তিনটি উপায় আলোচনা করিব।

প্রথম প্রতিকার

ভূমিকরের হ্রাস

উপরের তালিকায় দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়, বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের উপদ্রব হইয়াছে বটে—কিন্তু অনাহারে প্রাণহানি ঘটে নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে শতাধিক বৎসর কাল বঙ্গে ভূমিকর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। স্থতরাং কৃষি বিস্তার ও ভূমির উন্নতিকল্পে কৃষকেরা অধিক উৎসাহিত। যে বৎসর উত্তম শস্যোৎপত্তি হয়, সে বৎসর তাহারা সঞ্চয় করিতে পারে, দুর্ব্বৎসরে সেই সঞ্চয় দ্বারা প্রাণরক্ষা করে।

সমস্ত ভারতবর্ষে যদি বঙ্গের মত ভূমিকর চিরস্থায়ীরূপে ধার্য্য হয়, তবে দুর্ভিক্ষের বিপদ অনেক অংশে নিবারিত হয়। লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড লরেন্স নিজ নিজ শাসন কালে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সার চার্লস উড্ এবং সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট তখন ভারত মন্ত্রী। তাঁহার এই প্রস্তাবকে আগ্রহে সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহার পর মন্ত্রী সভায় পরিবর্ত্তন হইল। যাহারা ভারত মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতি ততটা আনুকূল্য করিলেন না; ১৮৮৩ সালে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

মহামতি লর্ড রিপন তখন ভারতের শাসনকর্ত্তা। তিনি ভূমিকর বৃদ্ধির সম্বন্ধে কতকগুলি সংযতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে শস্যের মূল্য বৃদ্ধিকারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে একবার ধার্য্যভূমিকর আর বর্দ্ধিত না হউক। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস ভারতবাসীকে এ কৃপাটুকুও করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাহার পর, ভূমিকর বাড়িয়াই চলিতেছে। এই দেয় দিতে লোকে যে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে শুধু তাহাই নয়। খাজনা কবে বাড়িবে কোনও স্থিরতা নাই। রাম ভাবিতেছে, এই জমিটার খাজনা ১০৲ আছে বাড়িয়া ১২৲ হইলে আমি আর রাখিতে পারিব না—শ্যাম লইবে। আমি কেন মিছামিছি মেহনৎ করিয়া এ জমির উন্নতি করিয়া মরি! ইহার অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে?

যে সকল অবসরপ্রাপ্ত রাজপুরুষ ভারতবর্ষে রাজকার্য্যে বহু বর্ষ অতিবাহিত করিয়া ভূয়োদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে এ বিষয়ে সচেতন। বিগত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ কয়েকজন সমবেত হইয়া ইংরাজ

গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের ভূমিকর হ্রাস বিষয়ে এক আবেদন করিয়াছেন।* সে আবেদন পত্রের সারমর্ম্ম এই—

(১) যে যে প্রদেশে জমিদারের মধ্যবর্ত্তিতায় ভূমিকর আদায় হয়, সেখানে সেখানে কৃষকগণ জমিদারকে যে খাজনা দেয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব তাহার অর্দ্ধেকের বেশী না হউক।

(২) যেখানে প্রজা সাক্ষাৎভাবে গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিয়া থাকে সেখানে রাজস্ব উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হউক;—এবং নির্দ্ধারিত রাজস্ব শস্যের মূল্য বৃদ্ধি কারণে বা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জলপ্রণালী প্রভৃতি খনন কারণে ভিন্ন, অন্য কোনও কারণে বর্দ্ধিত না হউক।

(৩) ভূমিকর একবার বৃদ্ধি করা হইলে, ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে আর না বৃদ্ধি করা হউক।

এই আবেদনের ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

দ্বিতীয় প্রতিকার

জলপ্রণালী খনন

১৮৭৭ সালের ভয়ঙ্কর মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবসানে, লর্ড লিটন দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানকল্পে, বৎসরে দেড় কোটি টাকার এক ফণ্ড খুলিয়াছিলেন। এই টাকা লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, সে সকল কথা এখন থাকুক। আপাততঃ স্থির আছে যে এই দেড় কোটি টাকা প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত কারণে ব্যয় হইবে :—

(১) দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান।

(২) দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে কার্য্যাদি।

---

* আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন :—

The Right, Hon. Sir Richard Garth K. C.
Mr. H. J. Renolds, C. S. I.
Mr. Romesh Chandra Dutta, C. I. E.
Mr. C. J. O'Donnel.
Sir John Jardine, K. C. I. E.
Sir William Wedderburn.
Mr. A. Rogers.
Mr. R. K. Pucple, C. S. I.
Mr. J. H. Garstin, C. S. I.
Mr. J. B. Pennington.
M. J. P. Goodridge.

(৩) গভর্ণমেণ্টের ঋণ হ্রাস অথবা নূতন ঋণ নিবারণ। দুই সংখ্যক কারণ—দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে রেলওয়ে বিস্তার এবং জলপ্রণালী খননে এই টাকা আংশিক ভাবে ব্যয় করা হইতেছে।

১৮৯৮ সালে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসিয়াছে, তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে, যে পরিমাণ রেলওয়ে বিস্তার দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে,* সুতরাং এখন এই সমগ্র দেড় কোটি টাকা প্রতি বৎসর (১) দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে সাহায্য দানে, (২) জল প্রণালী খননে এবং (৩) গভর্ণমেণ্টের ঋণ হ্রাসে ব্যয়িত হওয়া উচিত। যখন দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, তখন এক কোটি টাকা জলপ্রণালী খননে এবং বাকী অর্দ্ধ কোটি ঋণ হ্রাসে ব্যয় করিলে যুক্তি সঙ্গত হয়।

কিন্তু সর্ব্বত্র প্রণালী খনন সম্ভবপর নহে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বা যেখানে ভূখণ্ড স্বভাবতঃ উচ্চ, সেখানে প্রণালী খনন বহু ব্যয়সাধ্য হইতে পারে। সেখানে প্রণালী খনন না করিয়া বড় বড় জলাশয় এবং কূপাদি খনন করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যে প্রকার উৎসাহের সহিত বিগত ত্রিশ বৎসর রেলওয়ে বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জলাশয়াদি খনন সম্বন্ধেও যদি সেই প্রকার উৎসাহ দেখাইতেন, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ কি এ প্রকার বিস্তৃত হইতে পারিত, না মাছির মত এমন করিয়া মানুষ মরিত? ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত হিসাব করিলে গভর্ণমেণ্ট জল-প্রণালীতে কেবল ৩১ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু রেলওয়েতে ২৪৭ কোটি খরচ করিয়াছেন। তথাপি গভর্ণমেণ্ট এখনও আরও রেলওয়ে করিতে উদ্যত! আগামী বৎসর বোধ হয় দশ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন! ফলতঃ রেলওয়ে করিলে বিলাতী লোহার কারখানার বিস্তর লাভ আছে; জল প্রণালী করিলে কেবল ভারতবর্ষীয় মজুরদিগের লাভ।

* "It appears to us that most of the necessary protective railways have now been constructed, and that there is a possibility of others being constructed on their merits as productive works or as feeders to the trunk lines of Railway without assistance from the famine grant, and that under existing circumstances, greater protection will be afforded by the extension of irrigation works."

Report of the Famine Commission of 1898, P. 230.

জলপ্রণালী খনন সংশ্রবে একটা সমস্যা আছে—জলকর আদায়। গত বর্ষে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আইন পাস করিয়াছেন, যাহাদের ক্ষেত্রের নিকট দিয়া জলপ্রণালী গিয়াছে, সকলকেই কর দিতে হইবে, জল ব্যবহার কর আর নাই কর। এপ্রকার আইন প্রজার পক্ষে অতীব কষ্টকর।

এই আইন পাস হইবার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ প্রদেশে জল গ্রহণ প্রজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা সে মূল্য দিয়া জল লউক, যাহার না লইবার ইচ্ছা তাহার নিকট জলকর আদায় করা হইত না। এই নিয়ম এত বৎসর অবধি বেশ চলিয়া আসিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের কোন লোকসানের কারণ ঘটে নাই;—খননাদিতে যে আসল টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার উপর শতকরা ৭৲ টাকারও উপর লাভ হইতেছিল,* হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত কেন?

যাহার জমির কাছ দিয়া জল যাইবে, প্রয়োজন হইলে সে স্বেচ্ছাক্রমেই জল লইবে এবং খাজনা দিবে। জোর জবরদস্তির ত কোন আবশ্যকতা নাই। ১৮৬৯ সালে একবার ভারত গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ডিউক্ অব্ আর্গাইল তখন ভারত সচিব। তিনি এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন না।† ১৮৭৯ সালে বম্বে প্রদেশ হইতে আবার এই প্রকার এক প্রস্তাব গিয়াছিল, তাহাও ভারত সচিব অগ্রাহ্য করিলেন। আর এখন এই ভয়ানক অন্নকষ্টের সময়, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কি বলিয়া এই পীড়াজনক আইন পাস করিয়া বসিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এখন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের এই সদৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রদেশে অনুসৃত হইলেই চূড়ান্ত হয়।

* সমস্ত ভারতবর্ষে জলপ্রণালী বাবদ সুদ শতকরা ৬।/০ হিসাবে পোষাইয়াছে।

† "To force irrigation on the people would be not unlikely to make that unpopular which could otherwise scarcely fail to be regarded as a blessing and which, as all experience shows, Indian agriculturists, if left to themselves are sure duly to appreciate, sooner or later, and seldom later than the first session of drought that occurs after irrigation has been placed within their reach."

Extract from the Duke of Argyle's Despatch, dated 11th January 1870, addressed to the Government of India.

তৃতীয় প্রতিকার

ভারতবর্ষ হইতে টাকা রপ্তানির হ্রাস

মিষ্টার এ, জে, উইলসন্ লিখিয়াছেন :—

"যে দেশে একজন লোকের বাৎসরিক পারিশ্রমিক গড়ে পঞ্চাশ টাকা মাত্র, কোথাও কোথাও বরং কম, বেশী নহে, সেই ভারতবর্ষের নিকট হইতে আমরা বর্ষে বর্ষে ত্রিশ কোটী টাকা আদায় করিয়া লইতেছি। সুতরাং বর্ষে বর্ষে আমরা ষাট লক্ষ গৃহস্থের সম্বৎসরের উপার্জ্জন হরণ করিতেছি। এই ষাট লক্ষ গৃহস্থ অর্থে অন্ততঃ তিন কোটি মানুষ।"*

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি ভারতের লোককে দুর্ভিক্ষ হইতে, মৃত্যু হইতে গভর্ণমেণ্ট রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিন কোটি মনুষ্যের খাদ্য দ্রব্য হরণ, এই বাৎসরিক শোষণ, কিছু সংযত না করিলে হইবে না।

ব্যয়ের এই গুরুভার, নিম্নলিখিত প্রকারে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা যাইতে পারে :—

(১) জাতীয় ঋণ এবং "হোম চার্জ্জ" কমাইয়া, (২) ভারতেব অনাবশ্যক বিপুল সৈনিক ব্যয়ের অংশ কতক পরিমাণে ইংলণ্ডকে বহন করিতে দিয়া, এবং (৩) পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের অনুসারে ভারতবাসীকে অধিক পরিমাণে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া। এই তিনটি বিষয় আমরা একে একে পর্য্যালোচনা করিব।

(১) জাতীয় ঋণ এবং হোম চার্জ্জের হ্রাস। ১৮৭৫ সালের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৮ কোটি টাকা। বিশ বৎসরে, ১৮৯৫ সালে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ২২০ কোটি টাকা। এই বিশ বৎসরে, মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের চেষ্টায় ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, আমাদের দেশে বাড়িয়া দ্বিগুণ হইল।

হোম চার্জ্জ এই বিশ বৎসরে প্রায় বত্রিশ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

(২) সৈনিক ব্যয়ের হ্রাস। এই যে সুবিপুল সেনা সংখ্যার ব্যয় আমরা বহন করিতেছি ইহাতে আমাদের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। আমাদের দেশরক্ষার জন্য ইহার অপেক্ষা অনেক অল্পে যথেষ্ট হয়। ইহাতে বাস্তবিক ইংলণ্ডের স্বার্থই অধিক সিদ্ধ হইতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্য বিস্তার,

* Fortnightly Review, March, 1884.

বাণিজ্য বিস্তার, চীনে, আফ্রিকায় সর্ব্বত্র। ভারতের ব্যয়বিষয়ে যে রাজকীয় কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে লর্ড নর্থ ব্রুক, লর্ড রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন, সার হেনরি ব্রাকেনবারি এবং সার এডবিন কলেন সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে ভারতের বাহিরে যে সকল যুদ্ধ হইবে, তাহার ব্যয় ভারতকে দিয়া বহন করান অতীব অন্যায়। কতদিনে ইংলণ্ড আমাদের প্রতি এ বিষয়ে ন্যায় বিচার করিবেন ?

(৩) মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি পালন। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি প্রচারিত হইল যে তাঁহার প্রজাগণ জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে, পারদর্শিতা অনুসারে, তাবৎ রাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রতিশ্রুতির বিশেষ সার্থকতা এখনও কিছুই দেখা যাইতেছে না। কাগজে কলমেই বদ্ধ রহিয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া ভারতবাসীরা ইংরাজি স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিল; তাহারা যে কার্য্যে প্রবেশ পাইয়াছে, সেই কার্যেই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারিয়াছে; কিন্তু তথাপি দেশের বড় বড় রাজকর্ম্ম হইতে তাহারা বঞ্চিত!

১৮৯২ সালে পার্লামেণ্টের-এক তালিকা উপস্থিত করা হয়, তাহা হইতে প্রকাশ পায় যে, যে সকল কর্ম্মে বার্ষিক আয় হাজার টাকার উপর, এমন সকল কর্ম্মে গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করেন, ইহার মধ্যে ইংরাজগণ পায় ১৪ কোটি আর ভারতবর্ষীয়েরা পায় ৩ কোটি টাকা মাত্র! পৃথিবীতে সভ্য দেশে কুত্রাপি বোধ হয় কোনও জাতি স্বদেশের রাজকর্ম্ম হইতে এরূপ ভাবে বঞ্চিত হয় নাই।

উপসংহার

আর দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ১৮৫৮ সালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হইয়া, দার্শনিকপ্রবর জন ষ্টুয়ার্ট মিল, পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্যে এক আবেদন মুসাবিদা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন:—

"জাতিবিশেষ যে স্বজাতির উপর রাজশাসন করে, তাহার একটা স্বার্থকতা ও যাথার্থ্য আছে। কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির উপর রাজশাসন করিবার কোন অর্থ নাই, এক জাতি অপর জাতিকে নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাখিতে পারে, মানুষের গোশালা করিয়া, প্রয়োজন মত ঘানি টানাইয়া, লাঙল বহাইয়া উপার্জ্জনের জন্য রাখিতে পারে মাত্র।"—

কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা গোরু যে মরিয়া যায়, ঘানি টানিবে কে ?

"মনুষ্যের গোশালা" স্থাপনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবাসীকে গভর্ণমেণ্ট মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুন। প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, রক্ষার জন্য উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হউন। নূতন কোনও শাসনপ্রণালীর আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহা প্রস্তাবও করিতেছি না। যে প্রণালী গঠিত হইয়াছে, কার্য্য করিতেছে, সেই প্রণালীরই উন্নতি ও সুসংস্কার আমরা প্রার্থনা করি।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) আছে। এই সভায় কতিপয় সভ্য দেশবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আমাদের প্রার্থনা, এই নির্ব্বাচন প্রণালী বিস্তৃত হউক, প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হউক। মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে একটি করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা (Executive Council) আছে ; সকল প্রদেশেই এইরূপ একটি করিয়া সভা স্থাপিত হউক। এই সভার অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্য দেশীয় হউক। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর জেনারেলের এবং ভারত সচিবের এক একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা (Executive Council) আছে। এই সভায় অর্দ্ধভাগ সভ্য দেশীয় হউক এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হউক।

বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতি থাকিবে বলিয়া, আমরা এই সংস্কারেরই প্রস্তাব করিতেছি। ইহাতে শাসন কার্য্যে শাসন কর্ত্তাগণ প্রভূত সাহায্যলাভ করিবেন ; ভারতীয় লোকের ভূয়োদর্শন এবং স্থানীয় অবস্থাজ্ঞান বিশেষ কার্য্যকর হইবে। ভারতীয় লোকের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে ; বর্ত্তমান প্রণালীর স্বেচ্ছানুবর্ত্তী শাসনে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ে যাহা কিছু গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, দেশীয়গণ তাহার আলোচনায় অংশ লাভ করিলে, সে সকল প্রশ্ন সুচারুতররূপে মীমাংসা হইবে। দুর্ভিক্ষ বা বিঘ্ন বা বিপ্লব ঘটিলে শাসনকর্ত্তাগণ দেশীয় লোকের সহিত সমবেতভাবে তাহার প্রতিকার করিতে যত্নবান্ হইবেন। গভর্ণমেণ্ট প্রজাগণের যথার্থ মনোগত জানিতে পারিবেন। এবং রাজশক্তি প্রজাবলে পরিপুষ্ট হইয়া অটলভাবে বিরাজ করিবে।

ভারতী :
আষাঢ়, ১৩০৮

বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণ শুধু ইংলণ্ডের ভূম্যধিকার প্রণালীর বিষয়ই অবগত ছিলেন। সেই প্রণালী অনুসারে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারী ভূমির মালিক, তিনি ইজারাদারকে (Farmer) ভূমি বিলি করেন, ইজারাদার "জন" খাটাইয়া তাহা কর্ষণ করাইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গীয় ভূম্যধিকার প্রণালীর সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য ছিল না। বঙ্গে ভূমির মালিক যে কে, তাহা সে সময় স্থিরই ছিল না। কখনও রাজা বলিতেন—'আমি মালিক, যাহাকে ইচ্ছা জমি দিয়া কর লইব', কখনও জমিদার বলিতেন—'আমি মালিক—রাজাকে কর দিব যতদিন, ততদিন আমার দখল বজায় থাকিবে',—কখনও বা কৃষক বলিত—'জমি আমার,—জমিদারের সঙ্গে খাজনার সম্পর্ক মাত্র।' এই প্রকার গোলযোগের মধ্যে ভূ-সত্বে প্রকৃত অবস্থা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, তবে ইহা স্থির ছিল যে জমিদার পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করিতেন, রাজাকে নিয়মিত রাজস্ব পৌঁছাইয়া দিয়া খালাস। তাঁহাদের জমিদারী একপ্রকার রাজত্বেরই মত ছিল। কৃষ্ণকান্তের মত তাঁহারা সকলেই বলিতেন—"আমিই জজ, আমিই ম্যাজিষ্টর।" আবার কৃষকও শুধু কৃষক মাত্র ছিল না। সে জমিদারকে খাজনা দিত, কিন্তু জমিতে তাহার যে স্বত্ব, তাহা সেও পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিত। বঙ্গের নবাবগণ মাঝে মাঝে জমির পরিমাপ করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া লইতেন, জমিদারও মাঝে মাঝে স্বীয় প্রাপ্য খাজনা বাড়াইয়া লইতেন, কিন্তু প্রণালীটা আসলে অপরিবর্ত্তিতই থাকিত। জমিদারের নিকট রাজস্ব রাজার প্রাপ্য, প্রজার নিকট খাজনা জমিদারের প্রাপ্য, বংশাবলীক্রমে দখলী স্বত্ব প্রজার।

এইরূপ অবস্থায় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তখনি তাঁহারা ভূমিকর সংগ্রহ বা বিচারভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন না। মুর্শিদাবাদে নবাবের গদীতে যে ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিলেন তাঁহার তত্ত্বাবধানে তত্রস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী পূর্ব্বমতই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত রহিলেন। পাটনা নগরে কোম্পানির এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে, সিতাব

রায় বিহারের রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।* শুধু চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই চারিটি জিলার রাজস্ব কোম্পানি স্বয়ং সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই কার্য্যপ্রণালী সন্তোষজনক হইল না। যাঁহারা যথার্থ শাসন-কর্ত্তা, তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান রাজস্ব সংগ্রহকারীর আড়ালে থাকিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু শাসনকর্ত্তার দায়িত্বটুকু গ্রহণ করিতেন না। সংগ্রহকারীগণ, নিজেদের কোম্পানির এজেন্ট মাত্র বিবেচনা করিত, সুতরাং শাসনকারির দায়িত্ববোধ তাহাদেরও ছিল না। প্রজা, দুই পক্ষেরই দ্বারা উৎপীড়িত হইত, কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইত না। ১৭৬৯ সালে প্রজার অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক তত্ত্বাবধায়ক সভা গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ, দেশের শাসন প্রণালীর অবস্থা তখন অতীব বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ। এই সভার সভাপতির ভাষায়,—রাজস্ব সংগ্রহকারিগণ "জমিদারের নিকট যত পারিত আদায় করিত, জমিদারকে স্বাধীনতা দিত যে জমিদারও প্রজার নিকট যথাসাধ্য লুণ্ঠন করুক।"†

১৭৭২ সালে স্থির হইল, দেশের শাসনভার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হউক। গভর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তাঁহার সভার চারিজন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া, রাজস্ব সংগ্রহ ও বিচার বিধানের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ধনাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। গভর্ণর ও সভার সভ্যগণে মিলিয়া বোর্ড-অব্-রেভিনিউ গঠিত হইল। জেলায় জেলায় কালেক্টর পাঠান হইল। ন্যায় বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। ভূমিকর পাঁচ বৎসরের জন্য ধার্য্য করা হউক, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

কিন্তু এই রাজস্ব ধার্য্যের ব্যাপার লইয়া অবিচারের অন্ত রহিল না। বংশানুক্রমিক জমিদারগণের অধিকারের প্রতি গভর্ণমেণ্ট ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, নীলামের মুখে জমিদারীর বন্দোবস্ত হইল। পুরাতন জমিদারগণ অধিকাংশই স্থানচ্যুত হইলেন। প্রতিযোগীতায় মত্ত হইয়া, লোকে অসম্ভব রাজস্ব স্বীকার করিয়া ভূসম্পত্তি লইল; কিন্তু যথাসাধ্য প্রজাপীড়ন করিয়াও নিয়মিত রাজস্ব

* Select Committee's *Fifth Report*, 1812, P. 5.

† Letters from the President and Council, dated 3rd. November 1772.

যোগাইতে সক্ষম হইল না। নিরীহ কৃষক শ্রেণীর উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলিতে লাগিল। দেশ ছারখার হইবার উপক্রম হইল।

রেগুলেটিং এক্টের অনুসারে ১৭৭৪ সালে হেষ্টিংস্ ভারতের গভর্ণর জেনেরাল হইলেন।—দেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি ইংরাজ কালেক্টরগণকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনায় প্রাদেশিক সভার তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দেশীয় আমিন নিযুক্ত করিলেন।

তাহার পর কলিকাতায় সভা বসিয়া ন্যায়সঙ্গত ভূমিকর ধার্য্যের বিষয় বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। হেষ্টিংস্ ও বার্ওয়েল প্রস্তাব করিলেন যে ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হউক এবং ক্রেতার জীবনাবধি ভূমিকর ধার্য্য করা হউক। ইঁহাদের অপেক্ষা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, ইংরাজি সাহিত্যে "জুলিয়াসের পত্রপ্রণেতা" বলিয়া পরিচিত, ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এ বিষয়ে সমধিক বিবেচনাপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, ভূমিকর চিরস্থায়ীভাবে ধার্য্য করা হউক। পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর ভূরি ভূরি দোষ দেখাইয়া বলিলেন—

"একবার ধার্য্য জমা, সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ হউক। ইহা চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় হউক ;—এবং যদি সম্ভব হয়, তবে সাধারণকে সম্যক্‌ভাবে ইহা জ্ঞাত করা হউক। এই বন্দোবস্ত ভূমিরই প্রতি নির্দ্ধারিত হউক—সে ভূমি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যাহারই সম্পত্তি হোক না কেন। যদি সে ভূমিতে আপাততঃ গুপ্ত কোনও ধন বিদ্যমান থাকে, ইহা বাহির করিয়া জমিরই উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইবে, কারণ তাহা হইলে অধিকারী জানিবে সে নিজেরই জন্য পরিশ্রম করিতেছে।"*

এই প্রস্তাব লণ্ডনের ডিরেক্টরগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ইহা অনুমোদন করিলেন না। ফ্রান্সিসের প্রস্তাব ত নয়ই, হেষ্টিংসের প্রস্তাবও নয়।—"অনেক গুরুতর কারণবশতঃ এই দুই প্রস্তাবের কোনটাই ধার্য্য করা আমরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।"—সুতরাং প্রজার দুর্দ্দশার কোনও প্রতীকারই হইল না।

১৭৭৭ সালে, পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত শেষ হইল। অতঃপর নীলামের বিধি একটু পরিবর্ত্তিত হইল। বংশানুক্রমিক জমিদার উচিত মূল্য দিতে চাহিলে আর অন্যকে দেওয়া হইত না। হইলে কি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্থির

---

* **Philip Francis' *Minute*, published in London, 1782.**

হইল, জমি বৎসর বৎসর বিলি হইবে! ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮০ তিন বৎসরে তিনবার জমি বিলি হইল। এই অর্থনৈতিক নির্য্যাতনে সমস্ত দেশ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল,—রাজস্ব আবার বাকী পড়িয়া গেল।

তথাপি বঙ্গের বণিকরাজ ক্ষান্ত হইলেন না। ১৭৮১ সালে সভা বসিয়া, ভূমিকর ধার্য্যের নূতন নিয়ম প্রণীত হইল। বঙ্গের ভূমিকর ২৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

বৎসর বৎসর এই নূতন বন্দোবস্তের জ্বালায়, নিয়ত কর বৃদ্ধি ও তাহা আদায়ের কড়া নিয়মের উৎপীড়নে, সমস্ত বনিয়াদি জমিদারগণ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদারগণের চক্ষের উপর তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি কলিকাতার তেজারৎগণের হস্তগত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ উৎপীড়নে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। বঙ্গের তিনটি প্রধান জমিদারীর তৎকালীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই সময় বঙ্গের তিনটি প্রধান জমিদারীই স্ত্রীলোকের হস্তে ছিল। এই এই মহিলাগণ নিজ নিজ নাম বঙ্গের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকারও উপর রাজস্ব দিত। বর্দ্ধমান তখন খ্যাতনামা তিলকচাঁদের বিধবা রাণীর হস্তে। রাজসাহীর বার্ষিক রাজস্ব ২৬ লক্ষ টাকার উপর,—রাজসাহী তখন রাণী ভবানীর হস্তে। রাণী ভবানীর নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন। আজিও বালিকারা ভারতবর্ষীয় "নব-নারী"র মধ্যে রাণী ভবানীর জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকে। দিনাজপুরের বার্ষিক রাজকর ১৪ লক্ষ টাকার উপর। ১৭৮০ সালে দিনাজপুরের রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র তখন ৫ বৎসরের শিশু। সুতরাং বিধবা রাণী সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

ভূমিকর প্রণালীর এই নির্য্যাতন দিনাজপুরকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানি দেখিলেন, রাজস্ব বাড়াইয়া লইবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। দেবীসিংহ নামক এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি প্রজা নির্য্যাতনের অপরাধে রঙ্গপুর ও পূর্ণিয়া হইতে কোম্পানি কর্ত্তৃকই পদচ্যুত হইয়াছিল। স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই দেবীসিংহকে কোম্পানি কলিকাতা হইতে দিনাজপুরের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। দেবী সিংহ উপযুক্ত প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্যরূপে দিনাজপুরে আবির্ভূত হইল। খাজনা

বাড়াইবার জন্য এমন সকল বর্ব্বর নিষ্ঠুরতার উদ্যোগ করিল, বঙ্গের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। জমিদারগণকে কারাবদ্ধ করিতে লাগিল, প্রজাগণকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকের প্রতি পর্য্যন্ত পাশব অত্যাচার ও অকথ্য অপমান করিতে লাগিল।

তাহার অত্যাচারের চোটে দুঃখী কৃষকেরা গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিতে সংকল্প করিল। তাহারা জেলা ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু দলে দলে সিপাহী বন্দুকের মুখে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল। অনেকে পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইল। শেষে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে জাতির কৃষকগণের অপেক্ষা নিরীহ প্রাণী আর পৃথিবীতে নাই,—অত্যাচারের তাড়নায় তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিদ্রোহ ক্রমে দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর জেলায় পরিব্যাপ্ত হইল। অবশেষে কেল্লা হইতে সৈন্য আসিয়া ভয়ঙ্কর বর্ব্বরতার সহিত বিদ্রোহ দমন আরম্ভ করিল। দিনাজপুর জেলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মিঃ গুড্‌ল্যাড্‌ লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে এ প্রকার অশান্তি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আর সেরূপ বর্ব্বরতার ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তও বঙ্গে অভূতপূর্ব্ব।

বর্দ্ধমানের ঘটনা এতদূর শোকাবহ নহে। অত্যাচারের অধিকাংশ জমিদারের উপরই পড়িয়াছিল, প্রজার উপর ততটা পৌঁছে নাই। ১৭৬৭ সালে মহারাজা তিলকচাঁদের মৃত্যু হয়। নাবালক পুত্র তেজচাঁদের উত্তরাধিকারীত্ব কোম্পানি অনুমোদন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিলকচাঁদ লালা উমিচাঁদকে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। কিন্তু এই জেলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা জন গ্রেহাম তাহা রদ করিয়া, ব্রজকিশোর নামক এক ব্যক্তিকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন। * * * রাণী তাহার লুণ্ঠনবৃত্তিকে বাধা দিতে সচেষ্ট রহিলেন। দপ্তরখানার শীল তাহার হস্তগত হইতে দিলেন না।

পরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি আবেদনে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমার পুত্রের শীল আমার নিকট ছিল। প্রথমে না পড়িয়া কোনও কাগজে আমি ইহা অঙ্কিত করিতাম না। ব্রজকিশোর ইহা হস্তগত করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিল, আমি কোন মতে দিই নাই। বঙ্গাব্দ ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃঃ) ব্রজকিশোর চেষ্টা করিয়া গ্রেহাম সাহেবকে বর্দ্ধমানে

আনাইল। আমার নিকট হইতে আমার নবম বর্ষীয় পুত্র তেজচাঁদকে হরণ করিল। তাহাকে স্থানান্তরে প্রহরীর জিম্মায় আবদ্ধ রাখিল। এই অবস্থায়, ভয়ে ও দুঃখে, সপ্তাহেরও অধিক অনশনের পর, আর কোনও উপায় না দেখিয়া আমি শীল দিলাম।"*

এই পত্রে কথিত হইয়াছে, এই উপায়ে শীল লইয়া ব্রজকিশোর সম্পত্তি উড়াইয়া দিতে লাগিল। বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিল। কোনও প্রকার হিসাব দিতে চাহিত না। রাণী নিজের ও পুত্রের প্রাণসংশয় আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসকে প্রার্থনা করিলেন তিনি যেন পুত্রসহ কলিকাতায় গিয়া নিরাপদে বাস করিতে অনুমতি পান।

ক্লাভারিং, মনসন এবং ফ্রান্সিস্ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই তিনজন সদস্য, এই অর্থাপহরণ অপবাদের রীতিমত অনুসন্ধান প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য তাহাতে মত দিলেন না। অবশেষে সভা স্থির করিলেন,—

"মিঃ গ্রেহাম ও বর্দ্ধমানের দেওয়ানের বিরুদ্ধে ১১ লক্ষ টাকা নাবালক সম্পত্তি অপহরণের যে অভিযোগ রাণী আনিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা বিবেচনা করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করা রাণীরই কার্য্য। প্রমাণ পাইবার পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তির সম্মান বা নির্দোষীতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাস করিয়া আমরা অন্যায় করিব না। রাণী আবেদনে তাহা প্রার্থনাও করিতেছেন না। তিনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন তাহা মঞ্জুর করা যাউক।"†

সদস্যসভার বিবাদে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতে পাইল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ও গ্রেহামের পক্ষাবলম্বন করিলেন।

বর্দ্ধমান জমিদারীর উপর রাজস্ব ভার ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বর্দ্ধমান পরিবারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সকল পুরাতন জমিদারীর অপেক্ষা বর্দ্ধমানের রাজকর বেশী করিয়া ধার্য্য করিলেন। বহু বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধমান ইহা সহ্য করিল। বর্দ্ধমানের রাজ্যের অধিনায়কগণ,—যাঁহারা পূর্ব্বে কার্য্যতঃ

* Select Committee's *Eleventh Report*, 1783. Appendix O.

† *Ibid.*

বৰ্দ্ধমানের রাজাই ছিলেন, মহারাষ্ট্র আক্রমণের সময় বঙ্গের নবাবগণকে সহায়তা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বঙ্গের নূতন প্রভুগণের আর্থিক দেয় দিতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইলেন। প্রজাগণের সহিত পত্তনী বিলির ব্যবহার, জমিদারের সঙ্গে প্রজাকে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে দিয়া এই প্রাচীন বংশ সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

কিন্তু যে মাননীয় মহিলার বিপন্নতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তপ্ত হইয়াছিল তাঁহার নাম রাণী ভবানী। আজও তাঁহাকে বঙ্গের কোটি কোটি লোক ধর্ম্মভাবপূর্ণ সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। ক্লাইব পলাশী যুদ্ধ জয় করিবার পূর্ব্বে হইতে তাঁহার অগাধ সম্পত্তি প্রায় সমস্ত উত্তরবঙ্গ ব্যাপিয়া ছিল। তিনি মুসলমান ক্ষমতার বিপুলতা ও অবসান দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলার বুদ্ধি ও ক্ষমতা যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি উদাহরণস্থল হইয়াছিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রবর্ত্তিত নূতন ভূমিকর প্রণালী অন্যান্য জমিদারীর ন্যায় রাজসাহীকেও স্পর্শ করিয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল ১৭৭৩ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"রাজসাহীর জমিদার রাণী ভবানী তাঁহার রাজস্বদানে অত্যন্ত বাকী ফেলিতেছেন।" ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চের পত্রে স্থির করিয়াছিলেন যে রাণী ভবানী যদি মাঘ মাসের পর্য্যন্ত রাজস্ব ২০শে ফাল্গুনের মধ্যে দাখিল করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা রাণীকে জমিদারী হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হইবেন এবং জমিদারী এমন লোকের হস্তে দিবেন যাহারা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব যথাসময়ে উপস্থিত করিতে পারে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"স্থির হইয়াছে রাণীকে জমিদারীচ্যুত করা হইবে এবং সম্পত্তিতে তাঁহার সকল স্বত্ব লোপ করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন মাসিক ৪ হাজার টাকার পেন্সন দেওয়া হইবে।

এই অমর্য্যাদা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধা রাণী যে সকল আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকখানি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। একখানিতে তিনি তাহার সম্পত্তির ইতিহাস, ১৭৭২ সালের পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্তের পর হইতে গোমস্তা দুলাল রায়ের অত্যাচার এবং তজ্জনিত প্রজা হ্রাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন :—

"১১৭৯ সালে (খৃঃ ১৭৭২) সরকারী সাহেবগণ আমরা ভূসম্পত্তির সমস্ত পুরাতন খাজনা একত্রীভূত করিয়াছিলেন এবং শিলাদারী মাথট ও অন্যান্য সাময়িক খাজনাকে চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন। আমি পুরাতন জমিদার, প্রজার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া সম্পত্তি বিলিতে লইতে সম্মত হইয়াছিলাম। আমি শীঘ্র সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রাজস্ব দিবার মত যথেষ্ট আয় নাই।

ভাদ্র মাসে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিল, প্রজার জমি ভাসিয়া গেল, শস্য হইল না। আমি জমিদার সুতরাং প্রজাকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম। খাজনা দাখিল সম্বন্ধে তাহাদিগকে সময় দিয়া যথাসাধ্য দুঃখ লাঘব করিলাম। সাহেবগণকে অনুরোধ করিলাম আমাকেও ঐরূপ সময় দেওয়া হউক, ক্রমে রাজস্ব পরিশোধ করিব। কিন্তু আমার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তাঁহারা আমার কাছারি আমার গৃহ হইতে মোতিঝিলে স্থানান্তরিত করিলেন। এবং আমার ও দেশের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য দুলাল রায়কে ভৃত্য ও সাজাওল নিযুক্ত করিলেন।

* * * *

তাহার পর আমার বাড়ী ঘেরাও হইল। আমার টাকাকড়ির অনুসন্ধান হইল। আমি জমিদার স্বরূপ যাহা খাজনা আদায় করিয়াছিলাম, যাহা কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছিলাম, আমার মাসিক বিত্ত যাহা ছিল, সব লইয়া গেল। সর্ব্বসুদ্ধ ২২৫৮৬৭৪৲ টাকা হইয়াছিল।

নূতন বৎসর ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ) আমাকে সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত করিয়া ২২২৭৮১৪৲ টাকায় দুলাল রায়কে আমার জমিদারী বিলি করিয়াছিল। তখন দুলাল রায় ও পরাণ বোস দেশে নূতন মাথট এবং আসি জাফর বসাইয়া দিল। যাহারা পূর্ব্বে জমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকট যে খাজনা প্রাপ্য ছিল, সেই খাজনা বর্ত্তমান রায়তের নিকট আদায় করিতে লাগিল। এই দুই জন হুকুম জারি করিতে লাগিল, রায়তের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি শস্যবীজ ও বলদ পর্য্যন্ত হরণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাহ্রাস ও জমিদারী নষ্ট করিল। আমি পুরাতন জমিদার। আমি কোনও দোষ করি নাই।" দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে।

এই কারণে এক্ষণে আমি আবেদন করিতেছি, দুলাল রায় এ বৎসর ২২২৭৮১৭৲ টাকায় জমিদারী লইতেছে,—আমি উহা দিতে প্রস্তুত হইতেছি সরকারের যাহাতে লোকসান না হয় এবং কর যাহাতে যথাসময়ে দাখিল হয় সে বিষয়ে যত্ন করিব।"*

এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, সে সময়ে বঙ্গে সর্ব্বত্র কি ব্যাপার চলিতেছিল। পুরাতন জমিদার যদি নীলাম ক্রেতার সঙ্গে পারিয়া না উঠিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৈতৃক জমিদারী হারাইত। কিন্তু এত কাণ্ড এত আঁটাআঁটিতেও যথাসময়ে রাজস্ব আদায় হইত না। বঙ্গের কর্ষিত ভূমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হইল। রাণী ভবানীর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পরে অন্যান্য আবেদন দাখিল করিয়াছিলেন। রেভিনিউ বোর্ডে অনেক বাদানুবাদ, অনেক পরামর্শ চলিল। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যে তাহাদের এজেণ্ট বা বেনিয়ানের বেনামীতে জমি রাখে, ফিলিপ ফ্রান্সিস এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন—

"দেশ, দেশবাসীর। পূর্ব্বে জেতাগণ ভূমির কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত।……এই পুরাতন প্রথার যতবারই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ততবারই ফল অনিষ্টজনক হইয়াছে;—এতদূর যে সকলের বিশ্বাস অন্ততঃ বঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ জনহীন হইয়া রহিয়াছে। প্রতিবিধানে অসমর্থ হিন্দুগণ অত্যাচারের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া মুক্তিলাভ করে।"†

অবশেষে ১৭৭৫ সালে সভার অধিকাংশ সভ্যগণ স্থির করিলেন, রাজা দুলাল রায়ের পরিবর্ত্তে রাণী ভবানীকে তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তির খাজনা আদায় কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। হেষ্টিংস সম্যক্‌রূপে এ মতের কখনও পোষকতা করেন নাই। ইঁহার উত্তরাধিকারী কর্ণওয়ালিস বঙ্গের জমিদারগণের বংশমর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন—কিন্তু হেষ্টিংস বরাবরই নীলাম বিক্রয়ের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আমরা কেবল দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতিই মনোযোগ বদ্ধ রাখিয়াছি এবং সকল অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের সহিত আমাদেরও দুঃখ যে তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসীর উন্নতি হয় নাই। হেষ্টিংসের পক্ষে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী অপরিচিত ছিল

* *Ibid.*

† *Ibid.*

না। তিনি বলিতে গেলে বাল্যকালে ভারতে আসেন। জীবনের প্রথমাংশ সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন,—দেশীয় লোকের সঙ্গে মেলালেশা করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রকৃতি অনুধাবন করিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এরূপ কার্য্যদক্ষ এবং দেশজ্ঞানীর নিকট হইতে অতি সুশাসন আশা করিবারই কথা। তথাপি, যদি শাসনের দোষ গুণ প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের পরিমাপে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে তাহার শাসন অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল।

এখন এই এক শতাব্দীর পর, বিনা পক্ষপাতে এই অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান সম্ভব। অন্যান্য ইংরাজের মতই হেষ্টিংসেরও ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাহাদের ভৃত্যদের জন্য অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। ন্যায়বুদ্ধি ও সহানুভূতিকে মন হইতে বিসর্জ্জন করিয়া, তিনি তাহার সবল ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে অর্থাহরণ করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রজার মঙ্গলের প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য ছিল না তাহা নহে; —তবে এ মঙ্গল গৌণ উদ্দেশ মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য ধনোপার্জ্জন।

রাজা ও প্রজার সম্পর্ক জমিদার ও রায়তের অধিকার সমস্তই এই মুখ্য উদ্দেশ্যের নিকট অবনত করিয়াছিলেন। বারাণসী ও অযোধ্যাকে ভয়ানক করভারে পীড়িত করিয়া, বঙ্গে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরও যে দুর্ভিক্ষে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—ভূমিকর বৃদ্ধি করিয়া, পুরুষানুক্রমিক জমিদারগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তিনি এই উদ্দেশ্য পালন করিয়াছিলেন। এইরূপে উত্থিত ধনের অধিকাংশই ইংলণ্ডের অংশীদারগণের করতলগত হইল,—সে ধন কোনও আকারে আর দেশে ফিরিতে পাইল না। শাসনকর্ত্তা যত বিজ্ঞ হউন, শাসনপ্রণালী যতই উচ্চদরের হউক, এরূপ অবস্থায় জাতীয় দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ অসম্ভব।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের অকৃতকার্য্যতার ইহাই মূল কারণ। সকল ঐতিহাসিকগণই এই অকৃতকার্য্যতা দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শাসনকর্ত্তার কার্য্যের উপর, ঐতিহাসিকের অভিমতের অপেক্ষা আরও একটা বৃহত্তর অভিমত আছে—তাহা প্রজাপুঞ্জের অভিমত। ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জ বড়ই বেদনার সহিত হেষ্টিংসের শাসন সময়ের কথা স্মরণ করে। সে শাসনকাল অনিয়ম, অত্যাচার ও দারিদ্র্যের বিভীষিকাপূর্ণ। তাহার পর কর্ণওয়ালিস্ আসিলেন। তাহার শাসনকালের কথা ভারতীয় প্রজা গভীর

কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। দেশের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবার তাহার হৃদয় ছিল,—তাহাদের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিবার সাহস ছিল,—তিনি ভারতের সুবিপুল মূকবৎ প্রজাপুঞ্জের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বঙ্গদেশে আসিয়া জমিদারদিগের সহিত কিরূপ চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, দেশের কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ইংরাজ শাসনকে পূর্ব্বের অপযশ হইতে কিরূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশে জমিদার প্রজা সকলেই অবগত আছেন।

ভারতী :
পৌষ, ১৩০৮

ঋগ্বেদের দেবগণ

প্রথম প্রস্তাব: ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋগ্বেদের দেবগণ সম্বন্ধে এবং সেই প্রাচীন কালের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি, সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি সরল বিবরণ লেখা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে ঋগ্বেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের এত আদরণীয় কেন, সে কথা হিন্দু লেখক হিন্দু পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু ঋগ্বেদ আজি জগতের সকল জাতির এরূপ আদরের ধন কেন? খৃষ্টীয় ইউরোপবাসীগণ আজি এই পুরাতন গ্রন্থ লইয়া এত আলোচনা করিতেছেন কেন? ইউরোপের প্রধান প্রধান ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই পুস্তকের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন কেন? জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, আমেরিকাবাসী, সভ্যজাতি মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন কি জন্য? যে দেশে হোমর বা দান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের লোকেও অদ্য ঋগ্বেদের সরল কবিত্বে কি অপূর্ব্ব মধুরতা পাইয়াছেন? এরূপ প্রশ্ন একটু আলোচনা করা আবশ্যক?

কোন ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত যদি বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায়ই হউক বা নীলনদীর তীরেই হউক বা বেলজিয়াম দেশের পর্ব্বত গর্ভেই হউক একটি আট সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত কুড়ালী পান, এবং সভ্য জগতের সম্মুখে সেটি আনয়ন করেন, সভ্য জগৎ সেটিকে বড় সমাদর করেন। মনুষ্য যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা পাঠ করে নাই, যখন পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিত, নর-নারী যখন গাত্রের লোম ভিন্ন অন্য বসন পরিধান করিত না, ভল্লুক বা হরিণের রক্তাপ্লুত মাংস ভিন্ন অন্য আহার জানিত না, তখন যুদ্ধার্থ বা পশু হননার্থ এইরূপ প্রস্তরের কুড়ালী নির্ম্মাণ করিত। লৌহের ব্যবহার তখন জানা ছিল না, প্রস্তরে প্রস্তর ঠুকিয়া ঠুকিয়া যুদ্ধের অস্ত্র নির্ম্মিত হইত। জগতে কোন্ সভ্য জাতি আছে, যাঁহারা মনুষ্যের প্রাচীন অবস্থা আলোচনা করিতে ব্যগ্র নহেন, যাঁহারা সেই প্রাচীন অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ একটি প্রস্তর কুড়ালী পাইলে আদরের সহিত না—ধারণ করেন; সে নিদর্শন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, এটি কোন্ জাতির নিদর্শন?

এটি কি জার্ম্মানদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের, না ফরাসীদিগের? এটি কি হিন্দুদিগের না চীনদিগের? এ প্রস্তরটি মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন, মনুষ্য মাত্রেই ইহা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন।

মনে কর, মনুষ্য সেই প্রাচীন বর্ব্বরতা ত্যাগ করিয়া একটু সভ্যতা শিখিয়াছে, লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু হৃদয়ের উল্লাসে বা ভয়ে বা আশায় গীত গাইতে জানে। ঈশ্বরকে তখনও চেনে না কিন্তু সূর্য্যের জ্বলন্ত প্রভা, উষার রক্তিমচ্ছটা, ঝড়ের প্রবল বেগ বা বৃষ্টির হিতকর জল দেখিয়া বারবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে, সে আকাশের কল্পিত দেবগণকে আরাধনা করে। বিশেষ সভ্যতা শিখে নাই, তথাপি চাষ করিতে, কাপড় বুনিতে, নৌকা বাহিতে শিখিয়াছে। এরূপ প্রাচীন জাতি মনের আনন্দে কি গান গাইত, কি চিন্তা করিত, কি বিশ্বাস করিত,—তাহা আমরা আজি কিরূপে জানিব? তখনকার লোকে লিখিতে জানিত না, কিছু লিখিয়া যায় নাই, তাহাদিগের চিন্তা ধর্ম্ম ও উপাসনা, তাহাদিগের আশা ভরসা ও হৃদয়ের ভাব কালের অনন্ত স্রোতের গর্ভে লীন হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের আর সম্ভাবনা নাই। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতা দেখিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার জন্য প্রথম পদবিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের জানিতে মনুষ্য মাত্রেরই মনে ইচ্ছা হয়।

মনে কর, কেহ সহসা কোন পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে সেই প্রাচীন কালের সেই মনুষ্য সভ্যতার প্রারম্ভের চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন একটি নিদর্শন বাহির করিলেন; তখনকার মনুষ্যের আশা ভরসা চিন্তা বিশ্বাস ও কল্পনার একটি নিদর্শন সহসা বাহির করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, স্থাপন করিয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন, "মনুষ্যগণ! অবলোকন কর, আমি মনুষ্যজাতির প্রথম গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছি, মনুষ্যজাতির প্রথম সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন হস্তে ধারণ করিয়াছি, মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রারম্ভের একটি নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইতে আনিয়াছি!" এ কথা শুনিলে সভ্য মনুষ্য মাত্রে ইকিরূপ ব্যগ্র হইয়া সেই প্রাচীন নিদর্শনটি দেখিতে আইসে, সকল পুস্তক ভুলিয়া গিয়া সেই জগতের প্রথম গ্রন্থটি পাঠ করিতে আইসে। তখন কি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ গ্রন্থটি এ নিদর্শনটি ফরাসীদিগের, না জার্ম্মানদিগের? হিন্দুদিগের, না চীনদিগের? মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ মনুষ্য সভ্যতার প্রথম নিদর্শন মনুষ্য মাত্রেরই আদরণীয়!

এইরূপ নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে,—সেটি ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদ সংহিতা মনুষ্য জাতির সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ; * মনুষ্য জাতি যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিতেছিল, যখন তাহারা প্রকৃতির অনন্ত গৌরব দেখিয়া তাহাই উপাসনা করিত, যখন চাষাদি অল্প অল্প সভ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াও চারিদিকে বর্ব্বরদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অনন্ত যুদ্ধ করিত, তখন তাহারা কিরূপ চিন্তা করিত, কিরূপ আশাভরসা করিত, কিরূপ বিশ্বাস ও উপাসনা করিত, তাহাই আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। মন্ত্রবলে যেন চারি সহস্র বৎসরের সভ্যতা বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় সরিয়া যায়, সেই মেঘের পশ্চাতে আমরা এই বিস্তীর্ণ সভ্যতা স্রোতের শান্ত নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র উৎপত্তিস্থল একবার অবলোকন করিতে পারি। অদ্যকার রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, অর্ণবযান, ব্যোমযান, আত্মশাসন, পার্লিয়ামেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি ভুলিয়া যাই, মুহূর্ত্তের জন্য সেই সিন্ধু নদীতীরের বর্ব্বর বেষ্টিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্য গ্রাম, জঙ্গল বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণভূমি ও যজ্ঞস্থান দেখিতে পাই, এবং সেই গ্রামের সরল হৃদয় সবল বাহু আকাশের দেবগণের অর্চ্চনা পরায়ণ প্রথম আর্য্যদিগের গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে পারি। এ দৃশ্য দেখিয়া কেননা ইউরোপীয়গণ বিমোহিত হইবেন, কেননা মনুষ্য জাতির আদি গ্রন্থকে মনুষ্য মাত্রেই সমাদর করিবেন ?

কিন্তু মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ প্রশ্ন বলিয়াই কেবল ঋগ্বেদের ইউরোপে সমাদর তাহা নহে ; আর একটি বিশেষ কারণ আছে সেটিও সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন। সংস্কৃত ভাষা সকল আর্য্য ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সংস্কৃত না জানিলে কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি লাটিন বা গ্রীক, কি জর্ম্মন বা ইতালীয়—কোন ভাষার উৎপত্তি বুঝা যায় না। এ বিষয়টি সকলেই জানেন, বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই, একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

ইংরাজীতে রাজাকে King বলে, ফরাসিরা Roi বলে কিন্তু King বা Roi শব্দের আদিম মৌলিক অর্থ কি ? ইংরাজীবিদ্ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না, ফরাসীবিদ্ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না। ইউরোপের সমস্ত ভাষা

---

* "The most ancient of books in the library of mankind," Preface to MaxMuller's translation of the Rigveda, Vol. I.

অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ আলোচনা করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। King শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ "জনক," Roi শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ "রাজন্", জনক অর্থ জন্মদাতা, রাজন অর্থ যিনি বিরাজ করেন বা প্রকৃতি রঞ্জন করেন, সমাজ সুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আর্য্যগণ যে এক একজন প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাহাদের এই দুইটি গুণ দেখিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধাগণ জন্মদাতার ন্যায় প্রজাকে পালন ও রঞ্জন করেন এবং সমাজের মধ্যে শিরোরত্নরূপে বিরাজ করেন—সেইজন্য আমরা তাহাদিগকে অদ্যাবধি জনক বা রাজা, King বা Roi বলিয়া সম্বোধন করি। এ শিক্ষা আমরা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে পাই, আর্য্য জগতের প্রাচীন বা আধুনিক অন্য সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিলেও এ শিক্ষা পাই না।

এই একটি শব্দ যেরূপ, আধুনিক আর্য্যভাষার অনেক শব্দই সেইরূপ; আদিম মৌলিক অর্থ যদি গ্রহণ করিতে চাহ, তবে ইংলণ্ড হইতে—জর্ম্মানি হইতে—সকল সভ্য আর্য্যদেশ—হইতে শিষ্যের ন্যায় বিনীতভাবে আসিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা কর, সংস্কৃত ভাষা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ, কেননা তিনি আর্য্যভাষাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ছেলেবেলায় অনেক কথা যাহা কনিষ্ঠাদিগের মনে নাই, জ্যেষ্ঠার তাহা মনে আছে, ছেলেবেলার গল্পগুলি যদি জানিতে চাহ, শব্দোৎপত্তির উপাখ্যানগুলি শিখিতে চাহ, প্রাচীনা দিদির কাছে আইস তিনি বলিয়া দিবেন।

আর উদাহরণ দিবার কি আবশ্যক আছে? Father, Mother, Daughter প্রভৃতি শব্দের মৌলিক অর্থ কেবল সংস্কৃততেই পাওয়া যায়, তাহা স্কুলের ছাত্রেরাও জানেন। Star শব্দের মৌলিক অর্থ কি? সংস্কৃত স্তৃ অর্থ ছড়ান—আকাশে যাহা ছড়াইয়া আছে। Friend শব্দের মৌলিক অর্থ কি? প্রীণাতি অর্থ প্রীত করা। Father শব্দের মৌলিক অর্থ কি? পৎ অর্থ পতন বা উড্ডীয়মান হওয়া; পত্র অর্থ যাহার দ্বারা উড্ডীয়মান হওয়া যায়। Fume শব্দের মৌলিক অর্থ কি? সংস্কৃত ধূ ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া, ধূম অর্থ যাহা কম্পিত হইয়া উঠে। Deity শব্দের অর্থ কি? দিব্ ধাতু অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা আলোক দান করা; যিনি আলোক স্বরূপ তিনিই ঈশ্বর।

এরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু আবশ্যক নাই। আর্য্য ভাষা সমূহের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক, এটি

অন্য ইউরোপে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য, এই জন্যই সংস্কৃত ভাষার অন্য ইউরোপে এরূপ সমাদর।

সংস্কৃত ভাষা যেরূপ আর্য্য ভাষাসমূহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এবং সকল ভাষার মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ঋগ্বেদ সেইরূপ সকল আর্য্য ধর্ম্ম প্রণালীগুলির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সকল প্রকার আর্য্য বিশ্বাসের ও দেবদেবীর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

যিনি ঋগ্বেদের আকাশে দেব "দ্যু" তিনিই গ্রীকদিগের Zeus, ল্যাটিন-দিগের Jupiter ; আংগ্লোসাক্‌সনদিগের Tiw এবং জর্ম্মানদিগের Zio ; ইহা সকলেই অবগত আছেন যিনি ঋগ্বেদের বরুণ (আবরণকারী আকাশ) তিনিই গ্রীকদিগের Uranos ; ঋগ্বেদের অগ্নি ল্যাটিনদিগের Ignis এবং স্লাবদিগের Ogni ; ঋগ্বেদের মিত্র ইরাণীয়দিগের মিথ্‌ ; ঋগ্বেদের বায়ু ইরাণীয়দিগের বায়ু ; ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য (বৃষ্টিদাতা) লিথুনীয়দিগের Parjanya ; ঋগ্বেদের উষা গ্রীকদিগের Eos ও ল্যাটিনদিগের Aurora ; ঋগ্বেদের অহনা (উষা) গ্রীক-দিগের Athena (Minarva) ; ঋগ্বেদের সূর্য্য ইরাণীয়দিগের খোরসেদ্‌, গ্রীকদিগের Helios এবং ল্যাটিনদিগের Sol ; গ্রীকগণ আপনাদিগকে Hellenes কহিত অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয়। একথাগুলি সকলেই জানেন, এতএব এ বিষয় আর কিছু না লিখিয়া আমরা দুই একটি ধর্ম্মোপাখ্যানের কথা বলিব।

হেমবাবুর রসময়ী লেখনী হইতে যে বৃত্রসংহার কাব্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রসংহারের গল্পটি আজকার নহে। অনেক দিনের। এটি আমাদের পুরাণের গল্প সুতরাং হিন্দু মাত্রেই এ গল্প জানেন, কিন্তু পুরাণে এ গল্পের মৌলিক অর্থ পাওয়া যায় না। বৃত্র স্বর্গ অধিকার করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে হত করিয়া পুনরায় স্বর্গ উদ্ধার করিলেন ; এটি ত উপন্যাস, ইহার অর্থ কি ? ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য কি ? পুরাণে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাই না।

হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্য জাতির মধ্যেও আমরা এই বৃত্র সংহারের গল্প পাই, ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তক "অবস্তায়" আমরা সর্ব্বদাই বৃত্রহন্তার প্রশংসা পাই, এবং অহি বা বৃত্রের হননের কথা পাই। সে সমস্ত স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার কোন আবশ্যক নাই, কেবল দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"জারাথস্ত্র অহুরো মজ্‌দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সদয় চিত্ত অহুরো

মজ্‌দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী?'

"অহুরো মজ্‌দ উত্তর করিলেন, 'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথঘ্ন (সংস্কৃতে বৃত্রঘ্ন) সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।" জেন্দ অবস্তা বহুরাম যাস্ত।

"তিনি (থ্রৈতেয়ন) তাঁহার নিকট (বায়ুর নিকট) একটি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, 'হে উর্দ্ধবিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিনমুখ ও তিনমস্তকযুক্ত অজি দহককে (সংস্কৃতে অহি দহক) পরাস্ত করিতে পারি।'...

"উর্দ্ধবিচারী বায়ু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজদের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।" —জেন্দ অবস্তা। রামযাস্ত।

এই ইরাণীয় শাস্ত্রের বেরেথ্রঘ্ন, এই অজি-দহক কে? ইহাদের উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? ইরাণীয় শাস্ত্র জেন্দ অবস্তা তাহার উত্তর প্রদান করেন না।

আবার এই গল্প আমরা গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই Echidna নাম্নী সর্প বা দেবীর উর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এবং নীচের অঙ্গ সর্পের ন্যায়। এই ভীষণ জীবের Orthos প্রভৃতি সন্তান হয়, সে Orthos দ্বিমস্তক বিশিষ্ট যমালয়ের একটি কুক্কুর। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে এই Echidna বা Echis ঋগ্বেদের অহি, এবং এই Orthos ঋগ্বেদের বৃত্র। Hercules নামক দেব যোদ্ধা Orthos-কে হনন করিয়াছিলেন সুতরাং Hercules গ্রীকদিগের বৃত্র হন্তা।

কিন্তু তথাপি আমরা উপাখ্যানের মর্ম্ম বুঝিলাম না। হিন্দু পুরাণে, ইরাণীয় শাস্ত্রে, গ্রীক শাস্ত্রে আমরা একই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতেছি, কিন্তু পুরাণ বা জেন্দ অবস্তা বা হিসিয়ড্‌ আমাদিগকে এ উপাখ্যানের অর্থ বলে না।

আর্য্যদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে ঐ উপাখ্যানের অর্থ পাই না; কেবলমাত্র ঋগ্বেদে পাই।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের ৩২ সূক্তে সেই উপাখ্যানের অর্থ জলের ন্যায় পরিষ্কার। বৃত্র বা অহি আকাশের মেঘ বই আর কিছু নহে, আকাশ সেই মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেন, তাহাতে মেঘ মানবজাতির উপকারার্থ জল বর্ষণ করে। এই বৃত্র সংহার! প্রকৃতির একটি অপূর্ব্ব আনন্দকর দৃশ্য লইয়া

প্রথম আর্য্যগণ একটি উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন ; হিন্দু, ইরাণীয় ও গ্রীকগণ সেই উপাখ্যানটি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অথচ ঋগ্বেদ না জানিলে এই সুন্দর উপাখ্যানটির অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অহি ও বৃত্রহন্তার গল্প ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে! আধুনিক পারস্যদিগের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ ফেদুর্সীর 'শাহনামা' ; তাহাতে আমরা দেখিতে পাই টাইগ্রীস নদীর তীরে ফেরুদীন পারস্যরাজ জোহক্‌কে হনন করিয়াছিলেন। ফেরুদীন ঋগ্বেদের বৃত্রঘ্ন, জোহক ঋগ্বেদের অহি-দহক! ঋগ্বেদের অহির তিন মস্তক সেইজন্য ফেদুর্সীর জোহকেরও তিন মস্তক, কেবল সেগুলি সর্পের মস্তক নহে, ইতিহাসে মনুষ্যের মস্তক হইয়া গিয়াছে।

এরূপ অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদিগের স্থান বড় অল্প, অতি সংক্ষেপে আর দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিব।

গ্রীকদের Prometheus আকাশ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি চুরি করিয়া আনেন, সে উপাখ্যান সকলেই জানেন। এই উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? গ্রীক শাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না, ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা "প্রমন্থন" দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য অগ্নির নাম "প্রমন্থ" তাহারই রূপান্তর Prometheus এখন আমরা বুঝিলাম কেন Prometheus অগ্নি আনিয়াছিলেন।

হিন্দু পুরাণে বিষ্ণু অবতার হইয়া তিনটি পদ-বিক্ষেপ-দ্বারা বলি রাজাকে দমন করিয়াছিলেন। সে সুন্দর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? পুরাণে তাহা বলে না, ঋগ্বেদে সে অর্থ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সূর্য্যরূপ, সূর্য্য উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত এই তিনস্থানে পদ-বিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন।*

প্রাচীন জার্ম্মানদিগের Tyr দেবের একটি হাত ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিয়াছিল। এ উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? Tyr সূর্য্য শব্দের প্রতিরূপ, একটি যজ্ঞে সূর্য্যের একটি হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়ে ও পূজকগণ তাঁহার একটি সুবর্ণের হস্ত গড়াইয়া দেন এইরূপ পৌরাণিক গল্পও আছে। এ গল্পেরই বা অর্থ কি?

ঋগ্বেদে ইহার অর্থ উপলব্ধি হয়। ঋগ্বেদের কবিগণ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ দেখিয়া কল্পনাচ্ছলে অনেক স্থানে সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি "হিরণ্যবাহু" বলিয়া

* যাস্ক ও ঔর্ণবাভের ব্যাখ্যা দেখুন।

বর্ণনা করিয়াছেন ;—তাহা হইতে সূর্য্যের বাহুনাশের ও স্বুবর্ণ বাহু নির্ম্মাণের উপাখ্যান হইল !

গ্রীকদিগের সূর্য্যদেব Apollo, Daphne নাম্নী দেবীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন! পলায়মানা Daphne অবশেষে পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিয়া একটি লরেল বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলেন। এ উপন্যাসের অর্থ কি? ঋগ্বেদ পাঠ ভিন্ন এ উপন্যাসের অর্থ গ্রহণের উপায় নাই। Daphne ঋগ্বেদের "দহনা" শব্দের প্রতিরূপ ; দহনা উষার নাম। সূর্য্য উষার পশ্চাতে ধাবমান হয়েন, সূর্য্য উদয় হইলেই উষা আর থাকে না, শরীর ত্যাগ করে। পুরাণে যে উর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান আছে, যাহা কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাহারও এই অর্থ ; পুরুরবা (সূর্য্যের) উলঙ্গ অঙ্গ দেখিলেই (উষা) অন্তর্হিতা হয়েন।

গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (Latin Vulcan) কে ? তাঁহার নামের অর্থ কি? তিনি সর্ব্বদা অগ্নি লইয়া কার্য্য করেন কেন? অগ্নি কখনও বৃদ্ধ হয়েন না ; কেননা তাহাকে প্রত্যহ জ্বালা যায়, অতএব তিনি সর্ব্বদাই যুবা। এইজন্য ঋগ্বেদে তাঁহাকে যুবাতম বা "যবিষ্ঠ" বলে, এটি অগ্নির একরূপ নাম হইয়া গিয়াছে। গ্রীক "Hephaistos" "যবিষ্ঠ" শব্দের প্রতিরূপ।

গ্রীকদিগের কামদেব Eros (Latin Cupid) কে? সূর্য্যের প্রথম অরুণ বর্ণ রশ্মিকে ঋগ্বেদে অশ্বের সহিত তুলনা দিয়া "অরুষ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Eros" শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

গ্রীকদিগের সুন্দরী Charites (Graces) দেবীগুলি কে? তাঁহারাও লোহিত সূর্য্যকিরণ। ঋগ্বেদে তাঁহাদিগকে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়া "হরিৎ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Charites" শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

এরূপ শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রবন্ধে আর আমাদিগের স্থান নাই, যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবদিগের কথা কহিব, তখন তাহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। তবে এখানে আর একটি উপাখ্যানের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র আকাশ-দেবতা। উষার রক্তিমচ্ছটা বা রক্তবর্ণ মেঘখণ্ডগুলি দিবা প্রকাশ হইলে থাকে না। ঋগ্বেদের কবিগণ উপমা স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে পণিস্ নামক এক অসুর দেবদিগের গাভী (রক্তবর্ণ আলোক বা মেঘখণ্ড)

হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং একটি দুর্গম স্থানে ("বিলু" অর্থ দুর্গম স্থান) লুকাইয়া রাখে। ইন্দ্র তাঁহার দেবকুক্কুরী সরমাকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দেন, এবং সরমার সন্ধান হইলে পণিস্ তাহাকে আপন পক্ষে লওয়াইয়া আনিতে চেষ্টা করে। সরমা ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে গাভীগণের সন্ধান দিলে, ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া সেই বিলু হইতে সেই গাভী উদ্ধার করেন। এটি প্রাতঃকালের সম্বন্ধে একটি উপমাগর্ভ উপাখ্যান মাত্র। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীকের অদ্বিতীয় কবি হোমর যে Iliad নামক সুন্দর মহাকাব্য লিখিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাও মূলে এই উপাখ্যানটি অবলম্বন করিয়া লিখিত; ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে Helena সরমা শব্দের রূপান্তর; Ilium বিলু শব্দের রূপান্তর, Paris পণিস্ শব্দের রূপান্তর, ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে; অনেক পণ্ডিত উপরিউক্ত মত গ্রহণ করেন না, এবং গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পারিস ও হেলিনাকেও ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইউরোপে কেন ঋগ্বেদের এরূপ আদর। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম প্রণালী সকল আর্য্যধর্ম্ম প্রণালীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ঋগ্বেদ আলোচনা না করিলে সে ধর্ম্ম প্রণালীগুলি বুঝা যায় না, নানা দেশের ধর্ম্ম উপাখ্যানগুলি বুঝা যায় না। সকল আর্য্যধর্ম্ম ও বিশ্বাসগুলি আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। সম্মুখে যেন একটি নিবিড় কুহায় সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, অতএব যাহা দেখিতেছি তাহা স্পষ্ট দেখি না, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝি না, তাহাদিগের অর্থ গ্রহণ করি না। ঋগ্বেদের আলোক তাহাদের উপর পতিত হইলে যেন সহসা সে কুহা সরিয়া যায়, যেন সহসা সে দেবদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেন তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতির উপাসনাতেই আর্য্য ধর্ম্মের উৎপত্তি; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মপ্রণালীতে প্রকৃতির দৃশ্যগুলি বা কার্য্যগুলি একেবারে দেব-দেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে।

ঋগ্বেদে তাহারা এখনও প্রকৃতির কার্য্যই রহিয়াছে; অথচ বিস্ময়কর, হিতকর, ভক্তিপদ, ভয়পদ এইজন্য উপাস্য।* মানব জাতির প্রকৃত ইতিহাস

---

*"The mythology of the *Veda* is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar......Nowhere is the wide distance which separate the ancient poems of India from the most ancient literature

যাঁহারা পাঠ করিতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উপায়। আর্য্যধর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, আর্য্য-চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন, আর্য্যইতিহাসের মূল, উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যাঁহারা অবগত হইতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের একমাত্র উপায়।

এক্ষণে ঋগ্বেদ গ্রন্থের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দেব-দেবীদিগের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, কেননা পরের প্রবন্ধগুলিতে তাহাদিগের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাইবে। এখানে দেবগুলির নাম দিলেই যথেষ্ট হইবে।

দ্যু (অর্থাৎ আকাশ) এবং পৃথিবীকে সকল দেবগণের পিতামাতা বলিয়া অর্চ্চনা করা হইয়াছে, অদিতিও (অর্থাৎ অনন্ত আকাশ বা বিশ্বজগৎ) সকল দেবের মাতা স্বরূপা। তাঁহারই সন্তান সূর্য্যাদি আদিত্যগণ। ইন্দ্র আকাশ দেব, মেঘকে হনন করিয়া বৃষ্টি দিয়া মনুষ্যের হিত করেন, এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত (অর্থাৎ স্তুতি) আছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই। বরুণও আবরণকারী আকাশ বা নৈশ আকাশ; মিত্র আলোক বা দিবা; সুতরাং মিত্র ও বরুণের প্রায়ই একত্র স্তুতি করা হইয়াছে। এবং তাহাদিগের সঙ্গে অর্য্যমারও স্তুতি আছে, কেন না তিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থ প্রাতঃকাল, অথবা প্রাতঃকালের সূর্য্য। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই সকল যজ্ঞের পুরোহিত, এবং তাহাকে যে হব্য অর্পণ করা যায় তিনি তাহা দেবগণের নিকট লইয়া যান। বায়ু বাতাস, মরুৎগণ ঝড়ের বাতাস, মহা পরাক্রান্ত, এবং ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। সূর্য্য বা সবিতা আলোক বর্ষণ করেন। উষা প্রাচীন ঋষিদের বড় আদরের দেবী; তাহার সম্বন্ধে সূক্তগুলি যেরূপ কবিত্বপূর্ণ; সেরূপ আর কোন দেব সম্বন্ধে দেখা যায় না। তিনি সংসারের গৃহিণীর ন্যায় প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া স্নেহের সহিত সকলকে জাগরিত করেন, সকলকে আপন আপন কার্য্যে প্রেরণ করেন। উষার পূর্ব্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়, পুরাণে তাঁহাদিগকে অশ্বিনীকুমার বলে।

---

of Greece more clearly felt than when we compare the growing myths of the Veda with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The Veda is the real Theogony of the Aryan races." *Max-Muller's Chips from a German work-shop. Article, Comparative Mythology.*

তাঁহারা দেব চিকিৎসক, রোগ বিনাশ করেন এবং বিপদে মনুষ্যগণকে সহায়তা করেন। সোমরস না হইলে যজ্ঞ হইত না, এইজন্য সোমও উপাস্য দেব। পর্জ্জন্য মেঘ অথবা বৃষ্টি দেব, পূষা সূর্য্যের একটি রূপ এবং প্রাণী জগতের পুষ্টিকর দেব ও মনুষ্যদিগের দেশ ভ্রমণের পথ প্রদর্শক, এবং ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাতা। বিশ্বদেবগণ ও ঋভুগণেরও অর্চ্চনা আছে ; ঋভুগণ প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবদিগের জন্য একখানি যজ্ঞ পাত্রকে চারিখানি করিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্য তাহাদিগকে দেবত্ব দান করেন। যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর আদিম অর্থ বোধ হয় দিবা ও রাত্রি ; দিবা বা সূর্য্যরূপ যম অস্তযান, অর্থাৎ পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রথমে পরলোকে গিয়াছেন। বিষ্ণু সূর্য্যের রূপ মাত্র, রুদ্র অগ্নির রূপ অথবা ঝড়ের রূপ এবং মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, তাহা হইতে ব্রহ্মণস্পতি নামে একজন দেব আছেন, অর্থ প্রার্থনার দেব। সরস্বতী নদী দেবীরূপে উপাসিত হইতেন, বোধ হয় সেই নদীতীরে যজ্ঞাদি সম্পাদিত করা হইত ও মন্ত্র উচ্চারিত হইত, সেই কারণেই হউক বা অন্য কোনও কারণে হউক তিনি ক্রমে মন্ত্রদেবী বা বাগ্দেবী হইয়া উঠিলেন। ইলা ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের প্রথা বা অংশ সকলও দেবীরূপে উপসিতা হইতেন। তাহা ভিন্ন অগ্নির স্ত্রী আগ্নায়ী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র আছে ইঁহাদিগের স্তুতি বা উপাসনা নাই।

ইহারাই ঋগ্বেদের দেবতা। ঋগ্বেদের যতগুলি ব্যাখ্যা এক্ষণে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে যাস্কের নিরুক্ত সর্ব্ব প্রাচীন। তিনি, খৃষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময় জীবিত ছিলেন, সুতরাং যখন বৈদিক হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই এবং পুরাণ সমস্ত রচিত হয় নাই, যাস্ক তখনকার লোক। এইজন্য তাহার ব্যাখ্যা অতিশয় আদরণীয় ; বৈদিক সময়ে বাস করিয়া তিনি যতদূর বেদের অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, পরের ব্যাখ্যাকারগণ ততদূর হইয়াছেন এরূপ সম্ভব নহে। তাহা ভিন্ন যাস্ক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নিরুক্ত দেখিয়া বোধ হয় তিনি বেদের আলোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যাস্ক সমস্ত বৈদিক দেবদিগের সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে প্রকৃত পক্ষে বেদের তিনজন মাত্র দেব ; অর্থাৎ পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, এবং আকাশে সূর্য্য ইঁহাদিগের এক এক জনের

অনেকগুলি কার্য্য, এইজন্য অনেকগুলি করিয়া নাম। অথবা যাহাদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে তাহারা পৃথক পৃথক দেবই হইবেন।* অতএব বৈদিক দেবদিগের মধ্যে অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্য্য যে প্রধান দেব ছিলেন তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্বন্ধে সকল দেব অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সূক্ত আছে, তাহার পরে অগ্নির। আর ব্রাহ্মণেরা যে প্রসিদ্ধ ও পবিত্র গায়ত্রী উচ্চারণ করেন সেটি সবিতার সম্বন্ধে। যজ্ঞ ও উপসনার পদ্ধতিও ইহার পর বর্ণিত হইবে, এক্ষণে কেবল দুই চারিটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অগ্নি না জ্বালিয়া যজ্ঞ হইত না, অগ্নিতে হব্য ঘৃত অর্পিত হইত, এবং নিকটে পাত্র করিয়া সোমরস সজ্জিত থাকিত, এবং ভূমিতে বিস্তৃত কুশের উপর সেই রস সেচন করা হইত। যজমান নিজেই যজ্ঞ সাধন করিতে পারিতেন, অথবা মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক অর্থাৎ পূজকদিগকে ডাকাইয়া যজ্ঞ সমাধা করিতেন, সেই ঋত্বিকগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবের স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া হব্য প্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতেন। দেব মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই ; ঋগ্বেদের সময়ে যজমানদিগের গৃহেই যজ্ঞ হইত, এবং সেই যজ্ঞগৃহে কুশ বিস্তৃত করিবার প্রথা হইত, অনুমান করা যায় যে তাহার পূর্ব্বকালে দূর্ব্বা ক্ষেত্রেই যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। পশুবলি কখন কখন দেওয়া যাইত, কখনই বা নরবলি হইত ; তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ কিন্তু ঋগ্বেদে নাই।

ঋগ্বেদে ১০১৭টি সূক্ত অর্থাৎ প্রার্থনা—বা স্তুতি আছে এবং দেড় লক্ষের অধিক শব্দ আছে।† সুবিধার জন্য এই সূক্তগুলিকে ১০ মণ্ডলে বা ৮ অষ্টকে বিভক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক মণ্ডলে গড়ে ১০০ সূক্ত আছে, এবং প্রত্যেক অষ্টকে গড়ে প্রায় ১৩০টি সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে রচয়িতা ঋষির নাম আছে, সে ঋষিদিগের নাম কতক কতক আমরা পুরাণে অবগত আছি, যথা,—কণ্ব, গৌতম, কক্ষীবান্ অঙ্গিরার পুত্র নোধা, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। যে ঋষিদিগের নাম দেওয়া আছে, সেই ঋষিগণ স্বয়ংই যে সূক্ত রচনা

*তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রোঽন্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপিবহূনি নাম ধেয়ানি ভবন্ত্যাপি বা কর্ম্ম পৃথকত্বাৎ যথা হোতাধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্যসতঃ। অপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্ হি স্তুত্যো ভবন্তি তথাভিধানানি।"—নিরুক্ত। ৭।৫

† ১, ৫৩, ৮২৬ শব্দ।

করিয়াছিলেন, তাহা নাও হইতে পারে, তাঁহাদিগের বংশে যে সূক্তগুলি প্রচলিত ছিল, সেইগুলি বংশের আদি পুরুষের নামে বোধ হয় আরোপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণ আসিবার পর যে ক্ষুদ্র আর্য্যসমাজ ও আর্য্যপল্লী সকল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটি ঋষিবংশ যাগ যজ্ঞাদির জন্য এবং মন্ত্ররচনা ও অগ্নির অর্চ্চনার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন, যথা মনু, অঙ্গিরা ভৃগু, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, দধীচির পিতা অথর্ব্বা গৌতম, কণ্ব ইত্যাদি। তৎকালের ঋষি অর্থে বনবাসী ফল মূলাহারী ঋষি নহে, ঋষিগণ যাগযজ্ঞরত শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকলত্র বেষ্টিত সংসারী, তাহাদিগের রচিত মন্ত্র ও অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞাদি পুরুষ ক্রমে সেই সেই বংশে প্রচলিত থাকিত। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ঋষিবংশ, অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, এমনকি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বিবেচনা করেন, তাহারাই ভারতবর্ষে অগ্নিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। এটি ভ্রম, কেন না আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই অগ্নিপূজা জানিতেন। কিন্তু এই কয়েকটি ঋষিবংশ যে ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্য উপনিবেশে যাগ যজ্ঞ ও অগ্নিহোমাদি অনেক বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।*

কালক্রমে যজ্ঞের ঘটা ও অনুষ্ঠান কার্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকদিগের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে অবশেষে সেই ঋত্বিক বা পূজক সম্প্রদায় একটি শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইলেন। রাজপুরুষগণ ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন, সাধারণ শ্রমজীবিগণ বৈশ্য হইলেন, বিজিত বর্ব্বর জাতিগণ শূদ্র হইলেন। এগুলি ঐতিহাসিক কথা, এখানে বলিবার এই আবশ্যক যে ঋগ্বেদ সংহিতায় এ চারি জাতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, এ জাতি বিভাগটি ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার পর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

ক্রমে যজ্ঞের আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান বাড়িতে লাগিল, এবং ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি লইয়া অনুরূপ মন্ত্র রচিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রগুলি একত্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদ সংকলিত হইল। হোতা ঋত্বিকদিগের জন্য

*৬০ সূক্তের প্রথম ঋকে আছে যে মতিরিশ্বা আকাশ হইতে ভৃগুকে অগ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন, ৭১ সূক্তের ৩ ঋকে আছে যে, অঙ্গিরা অগ্নিকে ধারণ করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন, পরে অন্যান্য লোকে সেইরূপ করিল ইত্যাদি।

ঋগ্বেদ, উদ্গাতা অর্থাৎ গায়ক ঋত্বিকদিগের জন্য সামবেদ, অধ্বর্য্যুদিগের জন্য যজুর্ব্বেদ। এ তিনটি বেদেরও অনেক পরে অথর্ববেদ সংকলিত হইল। যখন এই নতুন তিনখানি বেদ রচিত হইল ও চারিটি বেদ সংকলিত হইল তখন জাতি বিভাগরূপ ভিত্তির উপর নতুন হিন্দু সমাজ গঠিত হইয়াছে।

এই সঙ্কলন কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর চারি বেদের "ব্রাহ্মণ" ও "উপনিষদ্" রচিত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণে কেবল যজ্ঞক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ পাওয়া যায় উপনিষদ্ প্রথম বিজ্ঞান আলোচনা জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে ঋগ্বেদের বহু দেবে বিশ্বাস স্খলিত হইতে লাগিল; বেদের "ব্রাহ্মণ" গুলিতে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে—তাহাতে শ্রদ্ধালোপ হইতে লাগিল, প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হইল, জগতের আদি ও অন্ত কার্য্য ও কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হিন্দুগণ এক আত্মা ও ব্রাহ্মণকে জানিলেন। সেই উন্নত বিশ্বাস, সেই ক্ষমতাপূর্ণ অনুসন্ধানই উপনিষদ্, আমরা এখন ইহাকে বেদান্ত কহি।

যে শাস্ত্রকে আমরা শ্রুতি কহি, তাহা এইস্থানে শেষ হইল, এক্ষণে স্মৃতি আরম্ভ হইল।

স্মৃতি শাস্ত্রের প্রারম্ভেই সূত্র। সেই সময় যাহা কিছু রচনা হইত, তাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে রচিত হইত। তখনও লেখা বড় প্রচলিত হয় নাই, সমস্ত বেদ এতদিন মুখে মুখে অভ্যাস হইত, মুখে মুখে উচ্চারিত হইত, পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে আচার্য্যের নিকট শিষ্য শিখিত। এক্ষণেও যাহা রচিত হইতে লাগিল, তাহাও মুখে মুখে অভ্যাসের জন্য; সূত্রগুলি এইজন্য এরূপ সংক্ষেপে রচিত।

সূত্রসমূহের মধ্যে পাণিনির জগৎ বিখ্যাত ব্যাকরণ সূত্র এবং তাৎকালীক গুহ্য ও ধর্ম্মসূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই গুহ্যসূত্রে তৎকালের হিন্দুগৃহস্থের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়;—এই গুহ্যসূত্রের অনুকরণে তাহার অনেক পরে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতাগুলি রচিত হয়। আর এই সূত্ররচনার সময়ে যে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহা হইতেই পরে প্রসিদ্ধ ষড় দর্শন উৎপন্ন হইল।

এই সূত্র সাহিত্যের কাল না শেষ হইতে হইতেই বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন, বৌদ্ধ বিপ্লব আরম্ভ হইল। প্রায় সহস্র বৎসর বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের পার্শ্বে ভারতবর্ষে স্থান পাইয়া বিলুপ্ত হইল, তাহার পর হিন্দুধর্ম্ম

কঠোরতরভাবে পৌরাণিক ধর্ম্মেররূপে ভারতবর্ষে একাধিপত্য পাইল। হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনে যে অসাধারণ পণ্ডিতগণ যত্নশীল হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; কালিদাসও ভবভূতির গ্রন্থাদির যে সংস্কৃত সাহিত্য আমাদিগের বিশেষ পরিচিত, তাহাও এই পৌরাণিক কালের। কিরূপে মুসলমান শাসনাধীনে জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কঠোর অস্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি ও পুরোহিত প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা ইতিহাসে আখ্যাত আছে।

আমাদিগের সাহিত্যের এই অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা ঋগ্বেদের সময় কতক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারিব। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত সর উইলিয়ম জোন্‌স্ বিবেচনা করেন খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে চারিবেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল, বেদে যে জ্যোতিষ গণনা আছে তাহা হইতে গণনা করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য কোলব্রুক স্থির করেন যে খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। গণনা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর্চডিকন প্রাট্ সেই গণনা হইতে বেদ সঙ্কলনের সময় খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই মতগুলি অমূলক বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু এই পর্য্যালোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতসমূহ সচরাচর যে ভুল করেন, আমরা সেই ভুলটি না করিতে চেষ্টা করিব। ইংলণ্ডের আধুনিক সমস্ত কবিতা মিল্টনের কাব্য হইতে টেনিসনের কাব্য পর্য্যন্ত দুই কি আড়াই শত বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সেইরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক অধিক স্থিতিপ্রিয়, তাঁহাদিগের মধ্যে একটি ধর্ম্ম বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় পরিবর্তন অধিক দিনে সংঘটিত হয়। আমাদিগের পৌরাণিক সাহিত্যের সারাংশ অন্যূন পাঁচশত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যের সারাংসও চারি পাঁচ শত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল; এই সকল উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা এ বিচারে লিপ্ত হইব।

বুদ্ধদেব খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। তখন সূত্র সাহিত্যে অনেক অংশ রচিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। অতএব সূত্র সাহিত্য রচনা খৃষ্টের পূর্ব্বে নবম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

সূত্র সাহিত্য রচনার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ও ঔপনিষদ্ সমুদয় রচিত হইয়াছিল। আধুনিক উপনিষদ্‌গুলি ত্যাগ করিলে ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌গুলি বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহা যে চারি পাঁচ শত বৎসরের অল্প সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ রচনা খৃষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হইতে পারে।

তাহার পূর্ব্বে বেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতএব খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে, যে বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এই বেদ সঙ্কলন কার্য্য করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা, বেদব্যাস ঐতিহাসিক মনুষ্য কিনা সে বিচারে অদ্য আমরা প্রবেশ করিব না।

যদি খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ সঙ্কলন কার্য্য হইয়া থাকে * তবে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল কোন্ কালে? আমরা স্মরণ রাখিব যে ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার পর সেই মন্ত্র রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের মন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। আমরা স্মরণ রাখিব যে ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহও একদিনে রচিত হয় নাই, উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভাষায় অনেক বৈষম্য দেখা যায়, উহার মত ও বিশ্বাসগুলিতেও কতক কতক বৈষম্য দেখা যায়। ঋষি কোথাও বা জ্বলন্ত সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিয়া বালকের ন্যায় বিস্মিত হইতেছেন, কোথাও বা সেই দৃশ্যটি দেখিয়া এক ঈশ্বরের বিশ্বাস প্রায় অনুভব করিতে পারিয়াছেন। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে ঋগ্বেদের মন্ত্র যে খৃষ্টের ২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ঋগ্বেদের ঋকগুলি আজ চারি সহস্র বৎসর হইল রচিত হইয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। †

এই চারি সহস্র বৎসরের পুস্তক, এই জগতের প্রথম গ্রন্থ, এই হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র ও আদিম সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন,—অনুশীলন করিয়া

* "The Vedic hymns were collected about 1000 B. C." 'MaxMulier's Origin and Growth of Religion. 1882. এ মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

† Four thousand years ago, or it may be earlier the Aryans who had travelled southwards to the rivers of the Punjab called him (God) Dyu Pitar, Heaven Father.' MaxMuller's Origin aad Growth of Religion, 1882. এ মত আমরা সমর্থন করিতে পারি।

দেখা উচিৎ কিনা, তাহা শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই বিবেচনা করুন। এ বিষয়ে যে সকলে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তবে দুইটি কথা আমরা শুনিয়াছি যে, সেজন্য কেহ কেহ ঋগ্বেদ অনুশীলনের আবশ্যকতায় সন্দেহ করিয়া থাকেন।

প্রথম কথাটি যে অদ্য চারি সহস্র বৎসর পর আমরা ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অক্ষম অতএব অনুশীলন করিয়া কেবল আমাদিগের মূর্খতা প্রকাশ করিবার এবং ঋগ্বেদের অপ্রকৃত অর্থ পাঠকদিগকে দিবার কোনও আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে ঋগ্বেদের ধর্ম্মপ্রণালী পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রণালী হইতে কোন কোন অংশে বিভিন্ন, ভারতবর্ষে এক্ষণে পৌরাণিক ধর্ম্মই প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।

প্রথম কথার আমরা এই উত্তর করিব যে, আমরা ঋগ্বেদের অর্থ গ্রহণ করিতেছি না। যাস্ক সায়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই আমরা পাঠকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিব। যাস্ক ও সায়ন ঋগ্বেদের অর্থগ্রহণে অসমর্থ এরূপ তর্ক আমরা শুনি নাই, বোধ হয় কেহ করিবেনও না। সায়নের ন্যায় গভীর বুৎপত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন টীকাকার বোধ হয় জগতে কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি তিনি একালের লোক, তিনি খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, একথা বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিবেন। কিন্তু যাস্ক একালের লোকও নহেন, তিনি খৃষ্টের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক বিশ্বাস, বৈদিক অনুষ্ঠান, বৈদিক আচার-ব্যবহারের কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও কি বৈদিক অর্থ গ্রহণে অসমর্থ ?

দ্বিতীয় কথাটির আমাদের এই উত্তর যে যদি বৃক্ষের বীজ হইতে বৃক্ষটি বিভিন্ন না হয়, তবে ঋগ্বেদের বিশ্বাস হইতে বেদান্তের বিশ্বাস বা পৌরাণিক বিশ্বাসটি বিভিন্ন নহে। উভয়ই হিন্দু ধর্ম্ম, উভয়ই হিন্দু গৌরবের হেতু, তবে একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক, একটি হইতে অন্যটি উৎপন্ন হইয়াছে। বীজটি অনুশীলন না করিলে বৃক্ষটি বুঝিতে পারিব না, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা মূল হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঋগ্বেদের সময়ের বিশ্বাস ও আচার পৌরাণিক সময়ের বিশ্বাসও আচার হইতে কতক বিভিন্ন তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে কি আশঙ্কার কোন ও কারণ

আছে? ধর্ম্ম—জাতির জীবন ; জাতীয় জীবনের সহিত ধর্ম্ম উন্নতি ও অবনতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় ; এটি কি নূতন কথা? ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর খৃষ্ট ধর্ম্ম যে অষ্টকার খৃষ্ট ধর্ম্ম নহে তাহা কোন্ ইতিহাসজ্ঞ না জানেন? ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ আনন্দের সহিত জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত ধর্ম্মের উন্নতি লক্ষ্য করেন, আমরাও আনন্দের সহিত ঋগ্বেদ স্বরূপ অঙ্কুর হইতে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিব। আমাদের যেরূপ সুবিধা আছে সেরূপ আর কোন জাতির নাই, জগতের মধ্যে কোনও জাতি চারি সহস্র বৎসরের মানসিক বিকাশ ও ধর্ম্মের বিকাশ নিজ জাতীয় ইতিহাসে দেখাইতে পারে না। এই ক্রমশ ধর্ম্ম বিকাশ ভারতবর্ষের গৌরবের কথা, আশঙ্কার কথা নহে।

ফলত ধর্ম্ম যদি জাতির জীবন হয় তবে সেই বহমান জীবনের সহিত ধর্ম্মও বহিতে থাকে, একস্থানে একরূপে দাঁড়াইয়া থাকে না। যদি ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের সহিত পরিবর্ত্তনশীল না হইত তবে জগৎ হইতে এতদিন লোপ পাইয়া যাইত। মৃত, জীবন রহিত, গতি রহিত, ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্যের কাজ চলে না, তাহাদিগের হৃদয়ের আশাগুলি পূর্ণ হয় না। হিন্দু ধর্ম্ম যে চারি সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছে, সে কেবল হিন্দু ধর্ম্ম সজীব ধর্ম্ম এইজন্য। হিন্দু ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় উন্নতির সহিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, নূতন নূতন রূপে আমাদিগের নূতন নূতন সামাজিক অভাব পূরণ করিয়াছে, আমাদিগের সুখে দুঃখে, অধীনতায় স্বাধীনতায়, শিক্ষায় ও মূর্খতায়, আমাদিগের সহচর ও সহায় হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম্ম তাহা চিন্তাশীল পণ্ডিতমাত্রেই জানেন ; তাহার কারণ এই যে হিন্দু ধর্ম্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল, মৃত জড় পদার্থ নহে।

ফলত ঋগ্বেদের হিন্দুধর্ম্মই রূপান্তরিত হইয়া পর সময়ের হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া হিন্দুজাতির হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। অনেকে বলেন, আমরাও কতক বিশ্বাস করি যে, এখন আমাদিগের একটি নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে, সে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই হউক, শিক্ষা বিস্তারের গুণেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, আমরা এক্ষণে দিন দিন উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতেছি। হিন্দুধর্ম্ম যদি গতি রহিত উন্নতি রহিত হইত, তাহা হইলে অন্য হয় হিন্দু ধর্ম্মের সহিত আমাদের স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, না হয়, সেই পুরাতন চারি সহস্র বৎসরের বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর

হইতে হইত। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের পুরাতন ইতিহাস দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুধর্ম্ম গতি রহিত বা উন্নতি রহিত নহে, আমাদিগের উন্নতির সহিত উন্নতি লাভ করিবে, জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইবে, উৎকর্ষের সহিত উৎকৃষ্ট হইবে, অথচ আমাদের পুরাতন সহচর চিরকাল সঙ্গে থাকিবে।

জগতের সৃষ্টি হইতে হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আকার আছে, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, ও যাঁহারা জগতের অন্তপর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ আকার রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাঁহারা যে প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিবেন, আমরা তাহাতে ক্ষুন্ন হইব না। যাহারা কেবল সত্য উপলব্ধির জন্য ধর্ম্মের বিশ্বাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন প্রাচীন ঋষিগণও একদিনে সত্য লাভ করেন নাই। তাঁহারা দেখিবেন ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূর্য্য ও অনন্ত আকাশকে স্তুতি করিতে করিতে কখন কখন সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন, কখনও বৈদিক দেবদিগের উপরে আর একজন দেব আছেন, এরূপ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন।* তাঁহারা সত্যলাভের কঠোর পথ একদিনে অতিবাহিত করেন নাই, জগতে অতুল্য চিন্তারত্নগুলি একদিনে আহরণ করেন নাই ; সে কঠোর পথে তাঁহারা কিরূপে গিয়াছিলেন, ভ্রান্ত মনুষ্য কত ভ্রম করিয়া সত্য পাইয়াছিলেন, জ্ঞানের আলোকের সহিত ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ ক্রমশ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইটি বুঝিব আমাদের এই উদ্দেশ্য।

* "যখন কিছুই ছিল না, যখন মৃত্যু বা অমরত্ব ছিল না, যখন দিবা ও রাত্রির প্রভেদ ছিল না তখন **তিনি** ছিলেন।—১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত।

"আমি কিছু জানি না, যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি অজ্ঞ, শিখিতে ইচ্ছা করি। যিনি এই ছয় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি কি সেই **অজ্ঞাত** পুরুষ?" প্রথম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত।

ইহা ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতি প্রভৃতির স্তুতি দেখ। এরূপ চিন্তা প্রায় ঋগ্বেদের শেষ দিকের মণ্ডলগুলিতে পাওয়া যায়, গোড়ার দিকের মণ্ডলগুলিতে বিরল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আকাশ দেবগণ

প্রাচীন আর্য্যগণ কি উপায়ে প্রথমে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগকে কে উপাসনা শিখাইল? তাঁহাদিগের সরল হৃদয় প্রথমে কিসের দ্বারা ধর্ম্মভাবে আলোড়িত হইল?

অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় আকাশের আলোকই প্রথমে আর্য্য হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করে, আলোকপূর্ণ আকাশই আর্য্যদিগের প্রথম উপাস্য।

প্রাচীন "দ্যু" বা "দিব্" ধাতু অর্থে আলোক দান করা, আলোক প্রদাতা আকাশকে "দ্যু" নামে প্রথম আর্য্যগণ উপাসনা করিতেন। সেই আর্য্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা যেখানে গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্র নাম বহন করিয়াছেন, সেই উপাস্য দেবকে উপাসনা করিয়াছেন। আর্য্য হিন্দুগণ ঋগ্বেদে "দ্যু"-কে সকল দেবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; আর্য্য গ্রীকগণ Zeus-কে সকলে দেবের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়াছেন; আর্য্য রোমকগণ Jove নামে সেই দেবের উপাসনা করিতেন। আর্য্য জর্ম্মাণগণ প্রাচীন জর্ম্মাণির বিস্তীর্ণ অরণ্যে মৃগয়া ও যুদ্ধে জীবনধারণ করিয়াও সেই দেবকে ভুলেন নাই, Tiu বা Zio বা অন্যান্য নামে সেই প্রথম আর্য্যদেবের উপাসনা করিতেন। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে জগতে জ্ঞানের আলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে; সভ্য আর্য্যগণ আকাশের উপাসনা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আকাশের দেব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তাকে কতক অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু সেই এক ঈশ্বরকে আর্য্যগণ অদ্যাপি সেই পুরাতন আর্য্যনাম দ্বারাই সম্বোধন করেন, আর্য্য হিন্দুগণ তাঁহাকে পরম "দেব" পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, আর্য্য ইংরাজ ও ফরাসিগণ তাঁহাকে "Deity" বা "Dieu" নামে পূজা করেন।

ঋগ্বেদে "দ্যু" অর্থাৎ আকাশকে সকল দেবের পিতা ও পৃথিবীকে সকল দেবের মাতা বলিয়া অনেক স্থানে স্তুতি করা হইয়াছে; দুই একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব,—

"যজ্ঞপরায়ণ মনুষ্যের জন্য বায়ু মধু ক্ষরণ করে, বহমান নদীগণ মধু রক্ষণ করে; শস্যফলাদিও যেন আমাদিগের জন্য মাধুর্য্য বিশিষ্ট হয়।

"রাত্রি মধুর হউক, ঊষা মধুর হউক; এই পৃথিবী মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক, আমাদিগের পিতা দ্যু মধুর হউন।

"বনস্পতি মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউন, সূর্য্য মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউন, আমাদিগের গাভী সমূহ যেন মধুর দুগ্ধ বিশিষ্ট হয়।"

(১ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৬, ৭, ৮ ঋক্)

"দ্যু ও পৃথিবী যজ্ঞ বর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মহৎ, তাঁহারা যাগকর্ম্মে আমাদিগকে প্রজ্ঞা সম্পন্ন করেন; আমি যজ্ঞে তাঁহাদিগের স্তুতি করি। দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র, তাঁহারা দেব সমন্বিত ও শোভনকর্ম্মা; তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বরণীয় ধন দান করুন।

"আমি আহ্বান মন্ত্র দ্বারা পিতার সদয় প্রকৃতি, মাতার মহৎ ক্ষমতা চিন্তা করি। উৎপাদনক্ষম সেই পিতা মাতা সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বীয় বদান্যতায় সন্তানদিগকে অমৃত দান করিয়াছেন।"

(১ মণ্ডল, ১৫৯ সূক্ত, ১, ২ ঋক্)

"বিস্তীর্ণ ও মহৎ পিতা মাতা পরস্পর বিযুক্ত হইয়াও ভুবন সমুদয় রক্ষা করিতেছেন। বিক্রমশালী দ্যু ও পৃথিবী আমাদিগের শরীর রক্ষা করেন, পিতা নানা রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

(১ মণ্ডল, ১৬০ সূক্ত ২ ঋক্)

৬ মণ্ডলের ৫১ সূক্তের ৫ ঋকে এইরূপ আছে,—"দৌঃ পিতঃ পৃথিবী মাতার দ্রুগ্ অগ্নে ভ্রাতঃ বসবো মূলতা নঃ।" অর্থাৎ হে পিতঃ দ্যু, হে সদয় মাতঃ পৃথিবী, হে ভ্রাতঃ অগ্নি, হে বসুগণ, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। এই "দৌষ্পিতর" ইউরোপের প্রসিদ্ধ দেব Jupiter * তিনি এই নামের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে দেশ বিদেশে সমস্ত আর্য্য জগতে পূজিত হইয়াছেন।

এ চিন্তাটি কি মহৎ কি পবিত্র কি বিস্ময়কর! আর্য্য আর্য্যের ভ্রাতা; সিন্ধুর উপকূলবাসী আর্য্য টাইবর নদীর তীরবাসী আর্য্যের ভ্রাতা;

---

*পণ্ডিতবর মক্ষমূলর Westminister Abbey নামক খৃষ্টীয় মন্দিরে যে এই বিষয়ে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী পবিত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ আমরা এস্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Five thousand years ago, or it may be earlier, the Aryans speaking as yet neither Sanscrit, Greek, nor Latin, called him Dyu Patar, Heaven Father.

"Four thousand years ago, or it may be earlier the Aryans who had travelled south-words to the rivers of the Punjab called him Dyush Pita, Heaven Father.

"Three thousand years ago, or it may be earlier the Aryans on the shores of the Hellespont called him Zeus, Heaven Father.

"Two thousand years ago the Aryans of Italy looked up to that bright heaven above noc sublime candens, and called it Ju-Piter, Heaven-father.

এই ভ্রাতৃগণ আলোকপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া সভ্যতার প্রারম্ভ-কালে একটি পবিত্র নাম জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন, সেই পবিত্র নাম প্রাচীন হিন্দুদিগের যজ্ঞস্থলে, গ্রীকদিগের ওলিম্পীয় মহোৎসবে, রোমকদিগের জগদ্বিজয়ী যুদ্ধ পতাকার সঙ্গে সঙ্গে, অসভ্য প্রাচীন জর্ম্মাণ-দিগের অনন্ত অরণ্য প্রদেশে—চারি-সহস্র বৎসর অবধি শব্দিত হইয়াছে! জগতের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর নাই; শিক্ষিত জগতের শিক্ষাগুরু হিন্দুদিগের ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা আর নাই।

দ্যু যেরূপ আর্য্যদিগের একজন প্রাচীন দেব ছিলেন, বরুণও সেইরূপ। তিনিও আকাশদেব; তবে দ্যু আলোকপূর্ণ (দিব অর্থে আলোক) আকাশ; বরুণ আবরণকারী (বৃ ধাতু আবরণে) আকাশ। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে বরুণের সহিত মিত্রের একত্র স্তুতি দেখা যায় এবং সায়ন বরুণ অর্থে নিশা (বা নৈশ আকাশ) এবং মিত্র অর্থে দিবা করিয়াছেন। গ্রীকদিগের Uranos সংস্কৃত বরুণের প্রতিরূপ, এবং গ্রীক কবি হিসীয়ডও Uranos-কে আবরণকারী দেব বলিয়া এবং নিশার প্রণেতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (হিসীয়ড ৫।১২৭)। ইরাণীয়দিগের মধ্যে বরুণ প্রথমে আকাশের নাম ছিল, পরে একটি কাল্পনিক দেশের নাম হইয়া গিয়াছে; ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ অবস্তা হইতে আমরা এই বিষয়ে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"আমি অহুর মজদ্ যে সকল উৎকৃষ্ট প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছি, তন্মধ্যে চতুষ্কোণ বরণ প্রদেশে চতুর্দ্দশ সংখ্যক; অজিদহকের সংহারকারী থে্তেয়ন (ঋগ্বেদের অহিহন্তা ত্রৈতন) সেই দেশের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

(জেন্দ অবস্তা, প্রথম ফর্গাদ)

আমরা পরে দেখাইব থে্তেয়ন একজন আকাশদেব, অতএব তাঁহার দেশ চতুষ্কোণ বরণ চারিদিক-সম্পন্ন আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

*And a thousand years ago, the same Heaven-father and All-father was invoked in the dark forests of Germany by our own peculiar ancestors the Teutonic Aryans, and his old name Tiu or Zio was then heard perhaps for the last time.

"But no thought, no name is entirely lost. And when we here, in this ancient Abbey, which was built on the ruins of a still more ancient Roman temple, if we seek for a name for the invisible, the infinite that surrounds as on every side, the unknown, the true Self of the world, and the true Self of ourselves, we too, feeling once more like children kneeling in a small dark room can hardly find a better name than,' 'Our Father which art in Heaven." *Origin and Growth of Religion* (*1682*), *P. 223.*

ঋগ্বেদে বরুণ সম্বন্ধে যে স্তুতিগুলি আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় সুন্দর, অতিশয় পবিত্র ও ভক্তি-ব্যঞ্জক। আমরা দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতে পারিব।

"হে বরুণ? এই উড্ডীয়মান পক্ষীসকলও তোমার বল ধারণ করে না, তোমার পরাক্রম ধারণ করে না, তোমার কোপ সহনে অসমর্থ! অনিমিষ বিচারী এই নদীসমূহ অথবা বায়ুর (অনন্ত) গতি, তোমার বেগ অতিক্রম করিতে পারে না।

"পবিত্রবল বরুণ রাজ মূল রহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া উর্দ্ধে তেজরাশি ধারণ করিয়া আছেন। সেই নিম্নাভিমুখ রশ্মি সমূহের মূল উর্দ্ধে; যেন তদ্দ্বারা আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি।

"বরুণ রাজা সূর্য্যের জন্য ক্রমান্বয়ে উদয় ও অস্তগমনার্থ বিস্তীর্ণ পথ করিয়াছেন; পাদবিক্ষেপের স্থান রহিত অন্তরীক্ষে তিনি পাদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমাদিগের হৃদয় বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

"হে রাজন্! তোমার শত সহস্র ওষধি আছে, আমাদিগের প্রতি তোমার বিস্তীর্ণ ও গভীর অনুগ্রহ হউক। পাপ দেবতাকে পরাঙ্মুখ ও দূরে স্থাপিত করিয়া প্রতিরোধ কর, আমাদিগের কৃত পাপ মোচন কর।

ঐ যে সপ্ত নক্ষত্র * উর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে, নিশাকালে দেখা যায়, দিবসে তাহারা কোথায় যায়; বরুণের কার্য্যসমূহ বাধাশূন্য ও ভিন্ন, তাঁহারই আজ্ঞায় নিশাকালে চন্দ্র দীপ্তিমান হইয়া আগমন করেন।"

(১ মণ্ডল, ২৪ সূক্ত, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ঋক্)

---

* এই সপ্ত নক্ষত্র সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে। ইউরোপে ঐ সপ্ত নক্ষত্রকে বৃহৎ ভল্লুক (Great Bear) বলে। তাহার কারণ কি? নক্ষত্রগুলি একটি লাঙ্গলের ন্যায় দেখিতে, ভল্লুকের ন্যায় নহে, তবে উহাদিগকে ভল্লুক বলে কেন? সংস্কৃত না শিখিলে ইউরোপীয়গণ সে কারণটি কখনও বুঝিতে পারিতেন না। সংস্কৃতে ঋচ্ ধাতু অর্থে উজ্জ্বল হওয়া, এবং সেইজন্য জ্বলন্ত স্তুতিকে "ঋক্" (ঋকবেদ) বলে, নক্ষত্রগুলিকে 'ঋক্ষ' বলিত, এবং উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট ভল্লুককেও 'ঋক্ষ' বলিত। কালক্রমে লোকে 'ঋক্ষের' নক্ষত্র অর্থটি ভুলিয়া গেল, কিন্তু ঐ শব্দের ভল্লুক অর্থটি রহিল; তখন সপ্ত নক্ষত্রকে প্রাচীন নাম "ঋক্ষ" বলিয়া ডাকিত কিন্তু কেন উহাকে ঋক্ষ (ভল্লুক) বলে, তাহার কারণটি ভুলিয়া গেল। একদল আর্য্য যখন মধ্য আসিয়া হইতে গ্রীসে গেলেন, তখন এই ঋক্ষ শব্দটি (Arktos) তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইউরোপবাসীগণ সেই সপ্ত নক্ষত্রকে অদ্যাবধি Great Bear অর্থাৎ ভল্লুক কহে।

এই চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের কবিতা পাঠক একবার আলোচনা করুন, ইহার সৌন্দর্য্য, উদারতা ইহার ভক্তি ও পবিত্রতা একবার অনুভব করিয়া দেখুন। মনুষ্য হৃদয়স্বরূপ আকর হইতে ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ পবিত্র রত্ন কি কখন উৎপন্ন হইয়াছে? এই রত্ন আমাদিগের জাতীয় ধন, কিন্তু এতদিন আমরা এই ধন চিনিতাম না। আধুনিক শিক্ষাবলে সমস্ত ভারতবাসী এই ধন ভোগ করিতে উৎসুক হইয়াছেন যাঁহারা এখনও এই রত্ন জনসাধারণের নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিতে চাহেন তাঁহারা প্রবাহিতা নদীর বেগ বালকের ন্যায় হস্ত দ্বারা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বরুণ সম্বন্ধে আর একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিব। পবিত্র-মতি বশিষ্ঠ ঋষি পাপ খণ্ডনের জন্য সেই পবিত্র দেবের আরাধনা করিতেছেন,—

"হে বরুণ! সেই পাপ জানিবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, জ্ঞানীর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। জ্ঞানীগণ এক বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন, বরুণ তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।"

"হে বরুণ! সেটি কোন মহৎ পাপ, সেজন্য তোমার স্তোতা, তোমার সখাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ স্বধাব দেব! সেটি আমাকে বল, আমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অর্চ্চনার সহিত তোমার নিকট উপনীত হই।"

"আমাদিগকে পৈতৃক পাপ হইতে মুক্ত কর, আমরা নিজ শরীরে যে পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত কর। হে রাজন্! পশুভক্ষক চৌরের ন্যায় বশিষ্ঠকে মুক্ত কর, গো বৎসকে যেরূপ বন্ধনরজ্জু হইতে মুক্ত করে বশিষ্ঠকে সেইরূপ মুক্ত কর।"

"হে বরুণ! আমাদিগের নিজের ইচ্ছায় নহে, সুরা বা ক্রোধ, দ্যূতক্রীড়া বা অজ্ঞানতায় আমাদিগকে কুপথে লইয়া গিয়াছে। বলবান দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব লাভ করে, নিদ্রা হইতেও পাপের উৎপত্তি হয়।"

(৭ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত ৩, ৪, ৬ ঋক্)

উপরের লিখিত স্তুতিগুলি হইতে প্রকাশ হইবে যে, ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে বরুণ সম্বন্ধে অতিশয় পবিত্র স্তোত্র আছে, সেরূপ পবিত্র স্তোত্র প্রায় অন্য কোন দেব সম্বন্ধে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে বরুণ ও মিত্রের একত্র উপাসনা আছে। ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তায় ইরাণীয় ঈশ্বর অহুর-মজ্‌দ ও মিথ্‌্রের সেইরূপ একত্র স্তুতি আছে। এই সকল কারণ হইতে

কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, বরুণই এক সময়ে আর্য্যদিগের শ্রেষ্ঠ আকাশ-দেব ছিলেন, আলোকপূর্ণ আকাশকে "মিত্র ও বরুণ" বলিয়া উপাসনা করা হইত। কালক্রমে ইরাণীয়গণ সেই শ্রেষ্ঠ দেবকে অহুর মজ্‌দ্‌ নাম দিলেন সুতরাং বরুণ একটি কাল্পনিক প্রদেশের নাম হইয়া গেল; এবং হিন্দুগণও বৃষ্টিদাতা আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া একটি নূতন নাম দিলেন, সুতরাং আবরণকারী আকাশদেব বরুণের উপাসনা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি কেবল জলের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন। পৌরাণিক বরুণ আকাশও নহেন, নৈশ আকাশ বা নিশাও নহেন, তিনি জলের দেব মাত্র।

আকাশদেব ক্রমে জলের দেব হইলেন কিরূপে? এ বিষয়েও পণ্ডিতদিগের অনেক আলোচনা আছে। আকাশের বায়বীয় পদার্থের সহিত জলের অনেক সাদৃশ্য আছে, ঋগ্বেদে অন্তরীক্ষকে অনেক স্থলে জল বা সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতুই বোধ হয় বেদের আকাশদেব ক্রমে পৌরাণিক জলদেব হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদেও স্থানে স্থানে তাঁহাকে জলের দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আর একজন প্রাচীন আকাশদেব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপাসনা ঋগ্বেদে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। ত্রৈতন বা ত্রিত আপ্ত্যের উল্লেখ ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, এবং তিনি ইন্দ্র বা বায়ু বা মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রাদি দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ত্রিত আপ্ত্য পৈতৃক অস্ত্রের ব্যবহার জানিয়া এবং ইন্দ্র দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া ত্রিমস্তকযুক্ত সপ্তরশ্মি বিশিষ্ট দানবের সহিত যুদ্ধ করিলেন; এবং তাহাকে হনন করিয়া ত্বষ্টার পুত্রেরও গাভী সকল লইয়া গেলেন।"

(১০ মণ্ডল, ৮ সূক্ত, ৮ ঋক্‌)

অতএব দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে ত্রিমস্তকযুক্ত অহিকে হনন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে, ত্রিতও সেই কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানে স্থানে বর্ণনা আছে। অতএব ইন্দ্রই ত্রিত এরূপ বিবেচনা করিবার কতক কতক কারণ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তার উপাস্যদিগের মধ্যে ইন্দ্রের নাম নাই; ত্রিত বা ত্রৈতন (থ্রেতেয়ন) তথায় অহিহন্তা। সে বিষয়ে আমরা প্রথম প্রস্তাবে জেন্দ অবস্তা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, এই প্রস্তাবেও একটি

অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। আবার এই জেন্দ অবস্তার থে্তেয়ন ফের্দুসীর শাহনামা নামক কাব্যে কেরুদীন নামক ঐতিহাসিক রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাও আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রকাশ করিয়াছি।

গ্রীকদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও এই ত্রৈতনের নাম পাওয়া যায়। Triton সমুদ্রের দেব, এবং স্বর্গদুহিতা Minerva-কেও Tritogenia অর্থাৎ ত্রিত কন্যা বলা যায়। অতএব বুঝা যায়, যে আকাশের পুরাতন ত্রিত নামটি গ্রীকদিগেরও স্মরণ ছিল। কিন্তু আকাশদেব Zeus-এর প্রাধান্য বশত গ্রীসে Triton দেবের মহিমার হ্রাস হইল, এবং ভারতবর্ষে আকাশদেব ইন্দ্রের প্রাধান্য বশত পুরাতন ত্রিতদেবের মহিমা হ্রাস হইল, এমন কি তিনি কাহারও মতে একজন ঋষি মাত্র! কেবল ইরাণে ত্রিতের মাহাত্ম্য রহিল, তথায় অহিহন্তার নাম ইন্দ্র নহে, থে্তেয়নই অহিহন্তা।

আমরা পূর্ব্বে যে আকাশ-দেবদিগের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের সাধারণ দেব ছিলেন ; বরুণ, দ্যু ও ত্রিতকে প্রাচীন আর্য্যগণ মধ্য আসিয়াতে আরাধনা করিতেন, সুতরাং সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা, হিন্দু ইরাণীয় ও গ্রীকদিগের মধ্যে উক্ত দেবদিগের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদে প্রধান দেব ইন্দ্রের কথা বলিব ; তিনিও আকাশদেব, কিন্তু তিনি আদিম আর্য্যদিগের প্রাচীন দেব ছিলেন না, তিনি কেবল হিন্দুদিগের নব্য দেবতা। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন আর্য্যজাতির উপাস্য দেবদিগের মধ্যে ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দু আর্য্যগণ যখন মধ্য আসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখনই আকাশকে এই নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অচিরে এই নূতন আকাশদেবের এরূপ প্রাধান্য হইল যে, ভারতবর্ষে অন্যান্য আকাশদেবের মহিমা হ্রাস হইয়া গেল, ইন্দ্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি স্তুতি আছে অন্য কোন দেব সমন্ধে ততগুলি নাই।

এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ কি? আকাশের দ্যু ও বরুণ এই প্রাচীন আর্য্য নাম থাকিতেও হিন্দুগণ ভারতবর্ষে আসিয়া একটি নূতন নাম আবিষ্কার করিলেন কি জন্য? পুরাতন দেবদিগের অপেক্ষাও এই নূতন দেব অধিক আদরের ও উপাসনার ভাজন হইলেন কি জন্য?

একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ঘটনার কারণ অনায়াসে উপলব্ধি

হয়। সরল-হৃদয় প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতির এক একটি বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্য্য দেখিয়া উপাসনা তৎপর হইতেন, এবং সেই দৃশ্য বা কার্য্যকে এক একটি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। যে আকাশ চিরকাল আমাদিগকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, নিশাকালে নক্ষত্র ও চন্দ্র বিভূষিত হইয়া আমাদিগের ভক্তি উত্তেজিত করেন, তাঁহাকে প্রাচীন আর্য্যগণ বরুণ নাম দিলেন। যে আকাশ প্রাতঃকালে ও দিবাযোগে আলোক বিতরণ করিয়া মনুষ্যের হিতসাধন করেন, প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাকে দ্যু নাম দিলেন। পরে আর্য্যগণের যে শাখা ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারা আকাশের একটি নূতন ক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

ভারতবর্ষে বর্ষাকালে বৃষ্টিই জীবনধারণের প্রধান উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বৃষ্টি দ্বারা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ডতা শমিত হয়, রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস পায়, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শুষ্ক নদীগুলি জলে পূর্ণ হয়; এবং ধান্য যবাদি শস্য পাইয়া মনুষ্যগণ জীবনধারণ করে। এরূপ হিতকরী বৃষ্টি দেখিয়া কেননা প্রথম হিন্দুগণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইবেন, ভারতবর্ষের বর্ষাকালের ঘন ঘটা ও বিদ্যুতের জ্যোতি দেখিয়া কেননা তাঁহারা বিস্মিত হইবেন? আকাশের এই নূতন হিতকর, বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া প্রথম হিন্দুগণ বর্ষণকারী আকাশের একটি নূতন নাম দিলেন; ইন্দ্ ধাতু অর্থ বর্ষণ, ইন্দ্র অর্থে বর্ষণকারী আকাশ। আকাশের বর্ষণ ক্রিয়া অন্য ক্রিয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক বিস্ময়করী ও হিতকরী, এইজন্য বর্ষণকারী ইন্দ্র অচিরে দ্যু ও বরুণ অপেক্ষা স্তোতাদিগের অধিক প্রিয়পাত্র হইলেন। প্রথম হিন্দুগণ সেই বর্ষণ কার্য্যে কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং কিরূপ তাহা উপমাস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নের স্তুতি হইতে প্রকাশ হইবে।

"বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কর্ম্মসমূহ বর্ণনা করিব। তিনি অহিকে* হনন করিয়াছিলেন, পরে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, পার্ব্বতীও বহন-শীল নদীসমূহের পথ ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন।

"ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গাভী যেরূপ সবেগে বৎসের নিকট যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিল।

*অর্থাৎ মেঘকে। সায়ণ।

"ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সহিত সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন্ প্রকার যজ্ঞে অভিষুক্ত সোমপান করিয়াছিলেন। মঘবান সাজক বজ্র গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলেন।

"হে ইন্দ্র! যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে তখন মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে, পরে সূর্য্য ও উষা ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।

"জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহৎ হননশীল বজ্রদ্বারা ছিন্ন বাহু করিয়া বিনাশ করিলেন; কুঠার ছিন্ন বৃক্ষ স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

"দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহুবিনাশী শত্রু বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের হত্যা কার্য্য হইতে উদ্ধার পাইল না। ইন্দ্র শত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমূহ পিষিয়া ফেলিল।"

(১ মণ্ডল, ৩২ সূক্ত, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ঋক্)

ভারতবর্ষের বর্ষাকালের অতুল শোভা দেখিয়া, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতে ভীত হইয়া হিতকারী বর্ষার জলে তৃপ্ত হইয়া আমাদিগের সরলহৃদয়—পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্রের অর্থাৎ মেঘের হননের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন;—সেই কল্পনা হইতে পৌরাণিক কত গল্পই সৃষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রের বৃষ্টিদান সম্বন্ধে যেরূপ এই একটি উপমা আছে, সেইরূপ ইন্দ্রের আলোক দান সম্বন্ধে আর একটি উপমা আছে। রাত্রিকালে দিবার আলোক থাকে না, কবিগণ উপমাস্থলে বলিতেন যে পণিঃ নামক অসুর দেবদিগের গাভী (আলোক) অপহরণ করিত। প্রাতঃকালে প্রথমে উষার আলোক দৃষ্ট হয়, কবিগণ কল্পনা করিতেন যে, ইন্দ্র সরমাকে (উষাকে) সেই গাভী অন্বেষণে পাঠাইতেন। এবং ক্ষণেক পর প্রাতঃকালের আলোকে আকাশ পূর্ণ হয়, ইন্দ্র অপহৃত গাভী উদ্ধার করিলেন।

"হে ইন্দ্র! দুর্গম স্থল ভেদকারী, বাহক মরুৎগণের সহিত তুমি সেই দুর্গম গুহায় লুক্কায়িত গাভীগণ অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।"

(১ মণ্ডল, ৬ সূক্ত, ৫ ঋক্)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এই বৈদিক উপমা হইতে গ্রীকদিগের ইলিয়ড নামক মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনেক পণ্ডিতে অনুমান করেন।

ইন্দ্রের পিতা মাতা ও স্ত্রী সম্বন্ধে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে।

"তোমার পিতা দ্যুকে লোকে সুবীর মনে করিত, তিনি ইন্দ্রের কর্ত্তা এবং বলবান্; তিনি কার্য্যকুশল, এবং পৃথিবীর ন্যায় অবিচলিত স্বর্গীয় বজ্রধারীকে জন্ম দিয়াছেন।"

(৪ মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ৪ ঋক্)

"বলবান পিতা বলবান পুত্রকে যুদ্ধের জন্য জন্ম দিয়াছিলেন, বলবতী নারী বলবান পুত্র প্রসব করিলেন।" (৭ মণ্ডল, ২০ সূক্ত, ৫ ঋক্)

"হে ইন্দ্র! যখন তুমি উষার ন্যায় উভয় পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছিলে, তোমার সুশীলা মাতৃদেবী তোমাকে মহৎ প্রজাসমূহের মহান্ সম্রাটরূপে জন্ম দিয়াছিলেন।" (১০ মণ্ডল, ১৩৪ সূক্ত, ১ ঋক্)

"হে ইন্দ্র! তুমি সোমপান করিয়াছ, তোমার গৃহে যাও, তোমার গৃহে তোমার কল্যাণী জায়া আছেন।"

(৩ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৬ ঋক্)

"আমি শুনিয়াছি ইন্দ্রাণী নারীদিগের মধ্যে, সৌভাগ্যবতী। কেননা তাঁহার পতি কখনই বার্দ্ধক্য বশত মরিবেন না।"

(১০ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত, ১১ ঋক্)

এইরূপে স্থানে স্থানে ইন্দ্রের স্ত্রীর ইন্দ্রাণী নামে উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার অন্য কোনও নাম বা বিশেষ বর্ণনা নাই। ঋগ্বেদের ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী নহে, ঋগ্বেদে শচীপতি অর্থে যজ্ঞপালক, তাহা হইতেই ইন্দ্রের স্ত্রী শচী সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা সৃষ্ট হইয়াছে।

ফলত বৈদিক ইন্দ্র পৌরাণিক ইন্দ্র হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। বৈদিক ইন্দ্র বিক্রমশালী যুদ্ধপ্রিয় আকাশদেব, তিনি মনুষ্যের জন্য বৃত্রকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, দেবদিগের জন্য পণিসের গুহা হইতে দেবদিগের গাভী উদ্ধার করেন, তিনি অতিশয় সোমপ্রিয়, রথে হরি নামক অশ্বদ্বয় সংযোজন করিয়া সর্ব্বদা সোম পানার্থ যজ্ঞে আইসেন, এবং অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের সহিত যুদ্ধে আর্য্য হিন্দুদিগকে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসপটু, সমৃদ্ধিশালী স্বর্গের রাজা, কখনও কখনও পৃথিবীর রাজাদিগের নিকট রথে অবতীর্ণ হয়েন, অথবা তাঁহাদিগকে নিজধামে লইয়া যান, এবং অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করেন। কখন কখন অসুরদিগের দ্বারা স্বর্গচ্যুত হইলে, তাঁহার উদ্ধারার্থ ব্রহ্মাদি প্রধান দেবদিগের নিকট গমন

করেন, এবং পুণ্যবলে স্বর্গের রাজ্য কেহ না প্রাপ্ত হয়েন, সেইজন্য কঠোর তাপসদিগের তপ ভঙ্গের নিমিত্ত মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণকে পাঠাইয়া দেন। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিশ্বাসগুলি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয় এবং যখন যুদ্ধপ্রিয় সবল বাহু প্রথম আর্য্যগণ ক্রমে ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া অধিকতর সভ্যতালাভ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু দুর্ব্বল, কিছু সুখপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, তখন বেদের যুদ্ধপ্রিয় বিক্রমশালী ইন্দ্রও ক্রমে পুরাণের সুসভ্য সুখপ্রিয় ইন্দ্রে পরিণত হইলেন। কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর দেব নাই ; পুরাণে ইন্দ্র একজন নিম্ন শ্রেণীর দেব মাত্র, সুসভ্য হিন্দুগণ ইন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর দেবকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যত্রয় দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম দিয়াছিলেন। এইটি কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা পরে দেখাইব।

পৌরাণিক ইন্দ্র সর্ব্বদাই অসুরদিগকে আশঙ্কা করেন, এবং কখন কখন অসুরদিগের দ্বারা স্বর্গচ্যুত হইয়া ব্রহ্মাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। এ উপখ্যানের প্রকৃত অর্থ কি ? অসুরগণ কে ? ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্বারা আর্য্যগণের প্রাচীন অজ্ঞাত ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইয়াছে, এবং প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম প্রণালীসমূহের প্রকৃত অর্থ অনেক পরিমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আদিম আর্য্যগণ মধ্য আসিয়ায় বাসকালে উপাস্যদিগকে "দেব" বা "অসুর" বলিতেন। পরে সেই আর্য্যদিগের মধ্যে কোন কারণে একটি বিবাদ বা বিচ্ছেদ হইয়া দুইটি দল হইল। একদলের লোক অন্য দলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। যে দল ভারতবর্ষে আসিলেন তাঁহারাই প্রাচীন হিন্দুগণ, অন্যদল প্রাচীন ইরাণীয়গণ। ইরাণীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম "অহুর" দিয়া হিন্দুদিগের উপাস্য "দেব" দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগকে "দেব" নাম দিয়া ইরাণীয়দিগের উপাস্য "অসুর" দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম লইয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল। বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্য্যমা, সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য ছিলেন তাঁহাদিগকে উভয় দলেই উপাসনা করিতে

লাগিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "দেব" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরাণীয়গণ তাঁহাদিগকে "অহুর" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। বিবাদের পর হিন্দুগণ যে সকল নূতন দেব কল্পনা করিলেন, ইরাণীয়গণ তাঁহাদিগকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না ; বরং পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দ্র হিন্দুদিগের নূতন কল্পিত দেব, সুতরাং ইন্দ্রকে ইরাণীয়গণ পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে অসুর নিন্দা আছে ; তাহা পাঠকদিগকে বালবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইরাণীয়দিগের শাস্ত্রে যে দেব নিন্দা আছে, এবং হিন্দু-দিগের নব্যদেব ইন্দ্রের নিন্দা আছে সে বিষয়ে দুই একটি অংশ ইরাণীয় শাস্ত্র "অবস্তা" হইতে উদ্ধৃত করিব।

"যখন শস্য ভাল হয়, তখন দেবগণ যাতনায় চীৎকার করে ; যখন যব উৎপন্ন হয়, তখন দেবগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। .... যখন প্রচুর শস্য হয়, তখন দেবদিগের গলার ভিতর যেন উত্তপ্ত লৌহ ঘুরানো হয়।"

(জেন্দ অবস্তা, তৃতীয় ফর্গার্দ)

"বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রপতি মিত্রের রথের পার্শ্বে সহস্র তীক্ষ্ণ ও সুনির্ম্মিত বর্ষা আছে। সে বর্ষা সকল আকাশ দিয়া দেবদিগের কঙ্কালের উপর দিয়া যায়।"

(জেন্দ অবস্তা, মিহির যাস্তা)

"হে জারা অস্ত্র! যখন তুমি একত্র পলায়মান পৌত্তলিক, তস্কর ও দেবদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন সেই উচ্চার্য্য শব্দ উচ্চারণ করিও।... দেবগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, দেব উপাসকগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর দংশন করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইতেছে।"

(জেন্দ অবস্তা, স্রোশ যাস্ত)

'আমি ইন্দ্রকে, সৌরুকে ও দেব নজ্যত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে,.. এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।"

(জেন্দ অবস্তা, দশম ফর্গার্দ)

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ হওয়ায় একদল অন্যদলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। উভয় দলই প্রাচীন মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি উপাস্যদিগকে উপাসনা করিতেন, কিন্তু একদল তাঁহাদিগকে "দেব" বলিয়া উপাসনা করিতেন, ও দেব শত্রুদিগকে

অসুর বলিয়া নিন্দা করিতেন, অন্যদল তাঁহাদিগকে "অহুর" বলিয়া উপাসনা করিতেন ও অহুর শত্রুদিগকে "দেব" বলিয়া নিন্দা করিতেন। এইটিও যে একদিনে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা নহে, ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্র বরুণাদিকেই পুরাতন নাম 'অসুর' বলিয়াই উপাসনা করা হইয়াছে। কিন্তু দুইদলে বিবাদ যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনই হিন্দুগণ ঘৃণিত পাপমতি দেব শত্রুদিগকেই অসুর বলিয়া অভিহিত করিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এবং পুরাণ ও ইতিহাসে আমরা এই অর্থেই অসুর শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাই।

এখন আমরা পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে যুদ্ধ কথা কাল্পনিক নহে; আর্য্য ইতিহাস যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহার পূর্ব্বের সময়ের ঘটনাবলী সেই পৌরাণিক কথায় সম্বলিত রহিয়াছে। চারি-পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মধ্য আসিয়াতে ইরাণীয় আর্য্য ও হিন্দু-আর্য্যদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের যে বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহাই দেবাসুরের যুদ্ধ। আমরা পুরাণে দেখি যে, সে যুদ্ধে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় দেব-উপাসক আর্য্যগণই সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মধ্য আসিয়া ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। সে পরাজয়ই আমাদিগের বিজয়ের দিন, আমাদিগের গৌরবের হেতু। সেই দিন হইতে আর্য্যজাতি ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সেইদিন হইতে আমাদিগের পৃথক ধর্ম্ম প্রণালী, আমাদিগের সভ্যতা, আমাদিগের ইতিহাস আরম্ভ হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব : আলোক দেবগণ

অদিতির পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলেই আমাদের শকুন্তলা নাটকের শেষ অংশটুকু মনে পড়ে। দুষ্মন্ত রাজা ভ্রান্তিবশত শকুন্তলার সহিত অনেক দিন বিচ্ছেদ সহ্য করিলে পর সেই শকুন্তলাকে পাইলেন। হীনমতি কবি এরূপস্থলে কেবল প্রণয়ী সমাগম সুখ বর্ণনা করিতেন, কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস সেই সম্মিলন সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্য সেই প্রণয়ী দম্পতিকে ইন্দ্রের পিতা মাতা, দেব ও মনুষ্যের পিতা মাতা, কশ্যপ ও অদিতির নিকট লইয়া গেলেন। কশ্যপ মরীচির পুত্র, অতএব ব্রহ্মার পৌত্র ; অদিতি দক্ষের তনয়া, অতএব তিনিও ব্রহ্মার পৌত্রী। পবিত্রাত্মা কশ্যপ ও অদিতি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পবিত্ররসে পাঠকদিগের হৃদয় প্লাবিত করিয়া কালিদাস নাটক শেষ করিলেন।

অদিতির এই পৌরাণিক মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, কিন্তু অদিতির বৈদিক মূর্ত্তি ইহা অপেক্ষাও সরল, পবিত্র ও মহৎ। ঋগ্বেদের অদিতি কে? ঋগ্বেদে ঋকেই তাহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হইতেছে।

"অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা অদিতিই পুত্র। অদিতিই সমস্ত দেবমণ্ডলী, অদিতিই পঞ্চ শ্রেণী মনুষ্য ; যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সমস্তই অদিতি, যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিবে সে সমস্তই অদিতি।"

(১ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ১০ ঋক্)

দো ধাতু অর্থে ছেদন বা খণ্ডন, অদিতি অর্থে এই অখণ্ড অসীম ব্রহ্মাণ্ড। আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য্য ও আদিত্যগণ, ঋগ্বেদের দেবগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, অতএব অদিতির সন্তান। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত পৃথিবীতে মনুষ্য দৃষ্টি যতদূর যায়, তাহার বহির্ভূত স্থলে মনুষ্য কল্পনা যতদূর সঞ্চরণ করে, সেই অসীমতা, সেই অনন্ততা, সেই অননুভবনীয় মহত্ত্বকে সরল হৃদয় প্রাচীন ঋষিগণ অদিতি বলিয়া উপাসনা করিতেন। দিবাকরের গৌরবান্বিত মণ্ডল দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া সবিতা বা সূর্য্য বলিয়া ডাকিতেন, বৃষ্টিদাতা আকাশের হিতকর কার্য্যে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহারা সেই আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু যখন সমস্ত আকাশ পৃথিবী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একেবারে দর্শন বা কল্পনা

করিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইতেন, তখন তাঁহারা সেই অনন্ততাকে অসীম বা "অদিতি" ভিন্ন অন্য নাম দিয়া ডাকিতে জানিতেন না। অদিতি দেবীর এই আদিম অর্থ,—আজি চারি সহস্র বৎসর পর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে Infinite বলেন।

বৈদিক অদিতির কথাটি পুরাণে যেরূপ ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে "দিতি"রও সেইরূপ। অদিতির নামের দেখাদেখি "দিতির" নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে এই "দিতি" শব্দটি তিনবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। একবার অদিতি অর্থে দিতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে আর দুইবার অদিতি শব্দের সহিত একত্র দিতির ব্যবহার হইয়াছে, দিতি শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইল, কিন্তু ক্রমে উপাখ্যান বাড়িতে লাগিল এবং পুরাণে আমরা সে উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখিতে পাই। পৌরাণিক দিতি অদিতির ন্যায় ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দৈত্যদিগের মাতা।

মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋগ্বেদে একজন ঋষিমাত্র, অন্যান্য ঋষির ন্যায় মন্ত্রের দ্বারা দেবদিগের স্তুতি করিতেছেন (১ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত দেখ)। পুরাণে সেই কশ্যপ অদিতির পতি এবং দেবদিগের পিতা।

আবার আমরা পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা পাইয়া থাকি। পৌরাণিক সে দ্বাদশ আদিত্য এই—

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জ্জন্যো দশমঃ স্মৃত॥
তত স্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

কিন্তু ঋগ্বেদ রচনার সময় দ্বাদশ আদিত্য ছিলেন না, সাতজন মাত্র আদিত্য ছিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের প্রথম ঋকে ছয়জন আদিত্যের নাম আছে, যথা—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এবং প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের ১২ ঋকে ও ১৯১ সূক্তের ৯ ঋকে ও অন্যান্য স্থানেও সূর্য্য বা সবিতাকে আদিত্য বলা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ৮ সূক্তের ৯ ঋকে স্পষ্টই লিখিত আছে যে অদিতির আট সন্তান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া আর সাতজনকে দেবদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানটির আদিম প্রাকৃতিক অর্থ কি, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমাদিগের স্বদেশীয় টীকাকারগণ এ উপাখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ

নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।*

যে সাতজন আদিত্যের নাম উপরে দেওয়া হইল তাহার মধ্যে বরুণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দিয়াছি। দক্ষ অর্থে ক্ষমতা বা শক্তি, শতপথব্রাহ্মণে (২।৪।৪।২) এই দক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং পুরাণে দক্ষ শক্তির পিতা, এবং শিবের শ্বশুর। এই পৌরাণিক গল্পের অর্থ দুর্ব্বোধ্য নহে, শক্তি অর্থে সৃষ্টি ক্ষমতা, সে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিরই কন্যা, এবং ধ্বংস ক্ষমতার (শিবের) সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত আছে। অংশও এক জন আদিত্য; অংশ অর্থে বিভাগ,—অনন্ত আলোকের বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ বা অংশ। "ভগ" সূর্য্যের নামান্তর মাত্র, পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন "অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, "ভগ" সেই কালের সূর্য্য।" অবশিষ্ট তিনজন আদিত্য, অর্থাৎ মিত্র অর্য্যমা ও সূর্য্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক।

মিত্র আর্য্যদিগের একজন পুরাতন দেব, সুতরাং হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে তাঁহার যেরূপ উপাসনা দেখা যায়, ইরাণীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও তাঁহার উপাসনা দেখা যায়। হিন্দুদিগের "মিত্র" দিবা বা আলোক, † ইরাণীয়দিগের মধ্যে "মিথ্র" সূর্য্য বা সূর্য্যালোক।

মিত্র সম্বন্ধে "জেন্দ অবস্তা" হইতে আমরা একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিব। "অহুরো মজ্দ স্পিতিমা জারা থস্ত্রকে কহিলেন, 'যখন আমি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, হে স্পিতিমা! আমি তাঁহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম।'...

"আমরা মিথ্রকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি। তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে, তাঁহার দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে। তিনি বলবান, অনিদ্র, চিরজাগরুক।" (জেন্দ অবস্তা, মিহির যাস্ত)

ঋগ্বেদে মিত্রর স্বতন্ত্র স্তুতি প্রায় নাই, বরুণের সহিত মিত্রের একত্র স্তুতি আছে,—বরুণ নৈশ আকাশ বা নৈশ অন্ধকার, মিত্র দিবার আলোক।

* See Max Muller's translation of the Hymns to the Maruts, Vol. 1. (1859) P. 241.

† "মৈত্রং বৈ অহরীতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ।

জেন্দ অবস্তায় অনেক স্থলে অহুর মজদের স্তুতির সহিত মিথ্রের স্তুতি একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন ইরাণীয় অহুর মজ্‌দ হিন্দুদিগের বরুণের প্রতিরূপ।

মিত্র যেরূপ আর্য্যদিগের প্রাচীন দেব অর্য্যমাও সেইরূপ, এবং হিন্দু আর্য্য ও ইরাণীয় আর্যদিগের মধ্যে তাঁহারও উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের অর্য্যমা সূর্য্যের একটি নাম। সায়ণ বলেন তিনি দিবা ও রাত্রির বিভাগকারী সূর্য্য অর্থাৎ প্রাতঃকালের সূর্য্য।* পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে অর্য্যমা কহেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণের সহিত অর্য্যমার স্তুতি একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত বরুণ এবং মিত্র অর্য্যমা যাহাকে রক্ষা করেন, কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না।

"তাঁহারা যে মনুষ্যকে নিজ হস্ত দ্বারা ধনপূর্ণ করেন ও হিংস্রক হইতে রক্ষা করেন, সে মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"বরুণাদি রাজাগণ সেই মনুষ্যদিগের জন্য শত্রুদিগের দুর্গ বিনাশ করেন, শত্রুদিগকেও বিনাশ করেন, পরে সেই মনুষ্যদিগের পাপ অপনয়ন করেন।

"হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আসিবার পথ সুগম্য ও কণ্টক রহিত; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই।

"হে নেতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ঋজু পথ দিয়া আইস, সেই যজ্ঞে তোমাদিগের উপভোগ হউক।

"হে আদিত্যগণ! তোমাদের অনুগৃহীত মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া সমস্ত রমণীয় ধন সম্মুখেই প্রাপ্ত হয়।

"সখাগণ! মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণের মহত্ত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করিব?" (১ মণ্ডল, ৪১ সূক্ত ১ হইতে ৭ ঋক্)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইরাণীয়দিগের মধ্যেও অর্য্যমার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের মধ্যেও যেরূপ, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ "অর্য্যমন" প্রথমে আলোক বা সূর্য্যদেব। তিনি অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন ইরাণীয়দিগের বিশ্বাস। যখন পাপমতি অঙ্গ্রমৈন্যু ৯৯৯৯৯ প্রকার রোগ সৃষ্টি করিলেন, তখন ইরাণীয়দিগের প্রধান দেব অহুর মজ্‌দ তাহার

---

* "অর্য্যমা অহোরাত্রি বিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ।" সায়ন। মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি; "অর্য্যমা উভয়োঃ মধ্যবর্ত্তী দেবঃ" সায়ণ।

প্রতিকারের জন নৈরসংঘকে (সংস্কৃত নরাশংস অগ্নির নাম) দূত করিয়া অর্য্যমনের নিকট পাঠাইলেন।

"পরম কমনীয় অর্য্যমন সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু ও যাতু ও পৈরিক ও জৈনিদিগকে ধ্বংস করুন।" (জেন্দ অবস্তা, ২২ ফার্গার্দ)

সূর্য্য আদিম আর্য্য জাতির আরও পুরাতন দেব, সুতরাং আর্য্য জাতির অনেক শাখার মধ্যে তাহার একই নামে উপাসনা হয়, এরূপ দেখা যায়। গ্রীকদিগের Helios, লাটিনদিগের Sol, টিউটনদিগের Tyr, এবং ইরাণীয়-দিগের "খোরশেদ" এই "সূর্য্য" শব্দের রূপান্তর মাত্র!

আমরা পুরাণে সূর্য্যের হরিৎ নামক অশ্বের কথা শুনিতে পাই, ইন্দ্রের হরি নামক অশ্বের বিষয় পাঠ করি, অগ্নির রোহিত নামে অশ্ব আছে তাহা জানি। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ অতি সরল এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, অগ্নির আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, বৃষ্টি পতনের পর আকাশের আলোক পুনরায় চারিদিকে বিস্তারিত হয়, এই জন্য ঋগ্বেদের কবিগণ সেই ধাবমান বা বিকাশমান আলোককে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই আলোক সমূহ লোহিত বা উজ্জ্বল বর্ণ সুতরাং অশ্ব সমূহের হরিৎ, অরুণ, অরুষ, হরি, রোহিত ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছিল, এ সকল শব্দগুলিই উজ্জ্বল বর্ণব্যঞ্জক। কালে ক্রমে আমরা এ সুন্দর উপমাটি ভুলিয়া যাইলাম এবং সূর্য্যের অশ্বের নাম হরিৎ, ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি ইত্যাদি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। বেদের সরল প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপমাগুলিকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা পুরাণে বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার উপন্যাস ও উপাখ্যানে পরিপূরিত করিয়াছি।

কেবল যে আমরা এইরূপ করিয়াছি তাহা নহে। সূর্য্যের প্রথম সুন্দর কিরণকে ঋগ্বেদের ঋষিগণ "হরিৎ" নাম দিয়াছিলেন; আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে সেই নামটি লইয়া গ্রীকগণ Charites (The three Graces) সম্বন্ধে সুন্দর গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং অগ্নির অশ্ব "অরুষে"র নামটি লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমের দেবতাকে Eros (Cupid) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইরাণীয়গণও সূর্য্যের ধাবমান কিরণ দেখিয়া সূর্য্যকে অশ্ববান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"অন্ধকার ও অন্ধকার জাত দেবগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যাতু ও

পৈরিকদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, অদৃষ্টভাবে আগন্তুক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যে মনুষ্য অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে যজ্ঞ প্রদান করে সে আহুরো মজ্‌দকেই যজ্ঞ প্রদান করে।"

(জেন্দ অবস্তা, খোরশেদ যাস্ত)

সূর্য্য সম্বন্ধে আমরা ঋগ্বেদ হইতে একটি সুন্দর স্তুতি এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ; প্রকৃতির শোভা দর্শনে প্রাচীন ঋষিদিগের হৃদয় কতদূর ভক্তিরসে আলোড়িত হইত, এই স্তুতি পাঠে আমরা অবগত হইব।

"সূর্য্য দীপ্তিমান ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য উর্দ্ধে বহন করিতেছে।

"সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায়।

"দীপ্তিমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।

"হে সূর্য্য! তুমি মহৎ পথ ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্তিমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ।

"তুমি দেবলোকগণের সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গ লোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও।

"হে শোধনকারী অনিষ্ট নিবারক সূর্য্য! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর, সেই আলোক দ্বারা রাত্রির সহিত দিবাকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগের অবলোকন করিয়া তুমি বিস্তীর্ণ দিব্য লোকে ভ্রমণ কর।

"হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।

"সূর্য্য রথবাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করিলেন সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।

"অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ দেব সূর্য্যের নিকট গমন করি। তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতি।"

(১ মণ্ডল, ৫০ সূক্ত ১ হইতে ১০ ঋক্)

সবিতা সম্বন্ধে আমরা আর একটি মাত্র ঋক্ এখানে উদ্ধৃত করিব, সেটি জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী। গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম এবং এই ছন্দে ঋগ্বেদে অনেক

স্তুতি ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যহ উচ্চার্য্য এবং সেইটিকেই এক্ষণে সাধারণতঃ "গায়ত্রী" বলিয়া লোকে জানে। সেটি এই—

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

(৩ মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ১০ ঋক্)

ইহার অর্থ, "যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"

আদিত্যদিগের কথা এই স্থানে শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে অন্যান্য আলোক দেবদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

আলোক দেবদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ভিন্ন ঋগ্বেদে পূষা, অশ্বিদ্বয় এবং উষার অনেক স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ঋভুগণও সূর্য্যের রশ্মিস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

পূষা সূর্য্যের একটি নাম। সায়ণাচার্য্য প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের টীকায় পূষাকে পৃথিবী অভিমানী দেব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এটি তাহার ভ্রম। যাস্ক নিরুক্ততে লিখিয়াছেন, পূষা "সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ" এবং এই অর্থই প্রকৃত। সূর্য্যই পূষা তাহা বেদের অনেক সূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সরল হৃদয় গোমেষপালকগণ সূর্য্যের যে প্রকৃতিকে অর্চ্চনা করিত, পূষা সেই প্রকৃতির সূর্য্য। তাহারা সর্ব্বদা এক গোচর হইতে অন্য গোচরে গমনাগমন করিত, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিত, এবং পথে অনিষ্ট বা বিপদ না হয়, ভোজনীয় অন্ন ও পানীয় জল পাওয়া যায়, এই জন্য সরল হৃদয়ে পূষাকে সর্ব্বদাই স্তুতি করিত; সুতরাং পূষা একরূপ পথ ভ্রমণকারীদিগের বিশেষ দেব হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক পূষার স্তুতিগুলি পাঠ করিলে তৎকালে পথ ভ্রমণে কি বিপদ আপদ ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আমরা এখানে একটি স্তুতি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও, বিঘ্নহেতু পাপ বিনাশ কর। হে মেঘ-পুত্র-দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

"হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয় তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

"সেই মার্গ প্রতিবাধক তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

"যে কেহ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অপহরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা! তাহার পর-সন্তাপক দেহ তোমার পদ দ্বারা দলিত কর।

"হে শত্রু বিনাশী ও জ্ঞানবান পূষা! যেরূপ রক্ষণ দ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

"হে সর্ব্বধন সম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত ও লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি ধনসমূহ দানে পরিণত কর।

"বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।

"শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।"

(১ মণ্ডল, ৪২ সূক্ত, ১ হইতে ৮ ঋক্)

অন্যান্য স্থানেও পূষার এইরূপ আরাধনা আছে আমরা আর দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"পূষা আমাদিগের গোসমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন, পূষা আমাদিগের অশ্বসমূহ রক্ষা করুন, পূষা আমাদিগের অন্ন প্রদান করুন।

"হে পূষা! অভিষবকারী যজমানের গোসমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, আমরা স্তব করিতেছি, অতএব আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ কর।

"(পথে) যেন কিছু নষ্ট না হয়, কিছু ক্ষতি না হয়, কিছু গর্ত্তে পতিত না হয়, সমস্ত (গাভীর) সহিত নিরাপদে আইস।

"পূষা! আপন দক্ষিণ হস্ত চারিদিকে বিস্তৃত করুন, আমাদিগের নষ্ট (গাভী সকল) পুনরুদ্ধার করিয়া দিন।"

(৬ মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত, ৫, ৬, ৭, ও ১০ ঋক্)

"ছাগই পূষার বাহন, তিনি পশুসমূহ পালন করেন, তিনি অন্নের ঈশ্বর, আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজক, এবং বিশ্ব ভুবনে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।" ইত্যাদি। (৬ মণ্ডল, ৫৮ সূক্ত, ১ ঋক্)

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পূষারূপী সূর্য্যকে কিরূপে আরাধনা করিতেন, কিভাবে পূজা করিতেন তাহা উপরিউক্ত ঋক্‌গুলি হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

চারিদিকে অনার্য্য শত্রু বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যপল্লীর অধিবাসিগণ আপনাদিগের গো অশ্বাদির রক্ষার জন্য, পথে বিপদের অপনয়নার্থ এবং সুন্দর তৃণপূর্ণ নূতন নূতন গোচর প্রদেশ প্রাপ্তির জন্য সরল হৃদয়ে পূষাকে উপাসনা করিতেন। যে সকল "আঘাতকারী, অপহরণকারী, দুষ্টাচারী"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা অনার্য্য আদিমবাসিগণ ভিন্ন আর কেহ নহে। আর্য্যগণ আসিবার পূর্ব্বে তাহারাই ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিল, আর্য্যগণ সিন্ধু তীরে বাস করিলে পর সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উপদ্রব করিত। অদ্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের শাসন স্থিরীকৃত হওয়াতেও যে তাস্তিয়া ভিল সচ্ছন্দে কয়েক বৎসরাবধি গো, অশ্ব ও ধন অপহরণ করিতেছে পথে ও গ্রামে লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্য-পল্লীগুলিতে সেইরূপ উপদ্রব করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে?

ঋভুগণ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। একটি বৈদিক প্রবাদ আছে, যে, ঋভুগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, পর ত্বষ্ট্ নির্ম্মিত একখানি সোম পাত্র নিজ শিল্পচাতুর্য্যে চারিখান করিয়া দেবদিগকে তুষ্ট করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সূর্য্যলোকে বাস করিতে লাগিলেন। সায়ণাচার্য্য ১ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। যদি ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি হয়েন, তবে তাঁহাদিগের শিল্প চাতুর্য্যের প্রবাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতপ্রবর মক্ষমূলর বলেন যে, পূর্ব্বকালে বৃবু নামে এক সূত্রধার বংশ কার্য্যগুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোন উপাস্য দেব ছিল না। অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল এবং কালক্রমে সেই বৃবু বংশীয়দিগের পাত্রাদি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণও সেই নৈপুণ্যের খ্যাতি লাভ করিলেন। এই মীমাংসাটি ঠিক কিনা তাহার বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

গ্রীকদিগের মধ্যে একটি গল্প আছে যে Orpheus নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তাঁহার গীত দ্বারা মৃত্যুরাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সহিত স্ত্রীর দিকে চাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। মক্ষমূলর বলেন যে Orpheus ঋভু বা

অভুর্ব রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য উষার দিকে চাহিলেই, অর্থাৎ উদয় হইলেই উষা অদৃশ্য হইয়া যান।

এক্ষণে আমরা অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। পুরাণে তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে পরিচিত এবং তাঁহাদিগের অশ্বিনীর গর্ভে জন্ম হওয়ার উপাখ্যান আছে। কিন্তু বেদ রচনার প্রথমাবস্থায় সে উপাখ্যান স্থষ্ট হয় নাই, বেদে তাঁহাদিগের নাম অশ্বিনীকুমার নহে, তাঁহাদিগের নাম "অশ্বিন্" অর্থাৎ অশ্ববিশিষ্ট।

প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রথম আর্য্যরা অশ্বিদ্বয় বলিয়া পূজা করিত, সে বিষয়ে অনেক প্রাচীন পণ্ডিতের অনেক প্রকার মত আছে। যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন, "অশ্বিদ্বয় কাহারা? কেহ কেহ বলেন আকাশ ও পৃথিবীই অশ্বিদ্বয়। কেহ কেহ বলেন দিবা ও রাত্র। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র সূর্য্য, কেহ কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় দুইজন পূণ্যবান্ রাজা ছিলেন।"

যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় শেষ রাত্রিতে আকাশে যে অন্ধকার ও আলোকে বিজড়িত থাকে, তাহাকেই প্রথম আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু, গোল্ডষ্টুকর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। মক্ষমূলর বলেন উভয় সন্ধ্যা, অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যাকেই আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন।

যদি সায়ংকালের বা প্রথম উষার আলোকই যমকদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগের অশ্বিদ্বয় নাম দেওয়া হইল কেন? বেদজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে এটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ইন্দ্রের (অর্থাৎ—আকাশের) আলোক ধাবমান হয়, অগ্নির আলোক ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোকসমূহকে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হরি, হরিৎ, বা রোহিত নামক যে ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অশ্ব আছে, তাহার প্রথম অর্থ উজ্জ্বল বর্ণ আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে এটি অতি প্রাচীন বৈদিক উপমা এবং বেদের সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। "অশ্বিন্" শব্দেরও সেই অর্থ—অশ্বযুক্ত, অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং "অশ্বিদ্বয়" নাম হইতে একটি গল্প উৎপন্ন হইল যে সূর্য্য ও উষা—অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন,

এবং তাঁহাদিগের পুত্র অশ্বিদ্বয়। তখন বেদের "অশ্বিদ্বয়" পুরাণের "অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ে" পরিণত হইলেন!

অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যথা;—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় বহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল; মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাহার ন্যায় একজনকে সৃষ্ট করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় তিনি অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিলেন; সরণ্যু মিথুনদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

এই সূক্তের অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

বিবস্বান্ অর্থ—সূর্য্য এবং সরণ্যু—ঊষা। কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করার কোনও কথা এখানে নাই।

সে গল্প যাস্কের নিরুক্তে পাওয়া যায়। তিনি উক্ত সূক্তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করিলেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান ও তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপ অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" যাস্ক আরও বলেন, অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন সে দেবীর নাম সবর্ণা, এবং বিবস্বানের দ্বারা সবর্ণার যে পুত্র হয় তিনিই বৈবস্বত মনু। এইরূপে পুরাণের অনন্ত উপাখ্যান আরম্ভ হইল।

কিন্তু যদিও প্রথম আর্য্যগণ আকাশের ধাবমান আলোককে অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন, তথাপি অচিরেই সেই অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা-কুশল দেবদ্বয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে তাঁহাদিগের কৃত আরোগ্য বর্ণিত আছে। তাঁহারা শত্রু দগ্ধ অত্রি ঋষিকে শান্তি দিয়াছিলেন, গোতম ঋষিকে মরুভূমিতে জল দিয়াছিলেন, সমুদ্রে মজ্জমান্ তুগ্র পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ জীর্ণাঙ্গ চ্যবন ঋষিকে যৌবন

দিয়াছিলেন,* বন্দন ঋষিকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন, ইন্দ্র দধীচির শিরচ্ছেদন করিলে তাঁহার মস্তক জুড়িয়া দিয়াছিলেন, বধ্রিমতীকে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, বৃক-গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বিশপলা রাজ্ঞীর একটি পা ছিন্ন হইলে সেই পা জুড়িয়া দিয়াছিলেন, নেত্রহীন ঋজ্রাশ্বকে চক্ষু দিয়াছিলেন, জাহুষ ও প্রথুশ্রবা রাজাকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি আপন পুত্র হারাইলে অশ্বিদ্বয় সেই পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, বিমদ্ রাজের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন, এবং দেবদিগের মধ্যে একটি দৌড় হওয়ায় অশ্বিদ্বয় সকলের অগ্রগামী হইয়া সবিতার কন্যা সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এইরূপ অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। পাঠকগণ প্রথম মণ্ডলের ১১২ অথবা ১১৬ সূক্তটি পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইবেন।

এক্ষণে আমরা উষাদেবী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রকৃতির মধ্যে উষা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আর নাই, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের পক্ষে উষা সম্বন্ধে স্তুতিগুলি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, সেইরূপ স্তুতি আর নাই।

কিন্তু কেবল ঋগ্বেদের ঋষিগণ কেন? প্রাচীন আর্য্যমাত্রেই উষাকে উপাসনা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ঋগ্বেদে উষার যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলিই গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়;—ইহার অর্থ এই যে হিন্দু আর্য্য ও গ্রীক আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন একত্র মধ্য আসিয়াতে বাস করিতেন, তখন উষাকে এই নামগুলি দিয়া ডাকিতেন ও উপাসনা করিতেন।

ঋগ্বেদের	অর্জ্জুনী	গ্রীকদিগের	Argynoris,
ঋগ্বেদের	বৃসয়	গ্রীকদিগের	Briseis,
ঋগ্বেদের	দহনা	গ্রীকদিগের	Daphne,
ঋগ্বেদের	অহনা	গ্রীকদিগের	Athena,
ঋগ্বেদের	উষা	গ্রীকদিগের	Eos,

* Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাকে অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে সমস্ত গল্পের মূল প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র।

ঋগ্বেদের	সরমা	গ্রীকদিগের	Helena,
ঋগ্বেদের	সরণ্যু	গ্রীকদিগের	Erinys, *

উষা সম্বন্ধে দুই একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব।

"গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া উষা আগমন করেন...

"তুমি চেষ্টাবান পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, ভিক্ষুকদিগকে প্রেরণ কর; তুমি নীহারবর্ষী এবং ক্ষণস্থায়িনী। তুমি উদয় হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায় অবস্থান করে না।

"তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে শত রথের দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আগমন করিতেছেন।

"তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন; ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে ও শোষকদিগকে দূর করিতেছেন।

"হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদ কর, জ্যোতির সহিত উদয় হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।"

(১ মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, ৫ হইতে ৯ ঋক্)

"নর্ত্তকীর ন্যায় উষা আপন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। গাভী যেরূপ দোহনকালে স্বীয় ঊধঃ প্রকাশিত করে, উষাও সেইরূপ নিজ বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ শীঘ্র গোষ্ঠে গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করিতেছেন, অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

"আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে আসিয়াছি, উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা মিষ্টবাদীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য যেন স্বীয় দীপ্তিতেই হাসিতেছেন। আলোক-বিকশিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।"

"পশুপালক যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা ও পূজনীয়া উষা সেইরূপ তেজ বিস্তার করিতেছেন। মহতী নদী যেরূপ প্রবাহিতা হয়; মহতী উষা সেইরূপ জগৎ ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।"

(১ মণ্ডল, ৯২ সূক্ত, ৪, ৬, ও ১১ ঋক্)

---

* See Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. *Primitive Aryans.*

"অদ্যও যেরূপ কল্যও সেইরূপ, উষাদেবী সর্ব্বকালেই অনবদ্যা। প্রতিদিন বরুণের অবস্থিতি স্থান হইতে ত্রিংশত যোজন অগ্রে অবস্থিত হয়েন। একই উষা উদয়কালে গমন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।*

"দেবী! কন্যার ন্যায় নিজ শরীর বিকাশ করিয়া তুমি যোগাভিলাষী দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর। যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তি বিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার সম্মুখে বক্ষস্থল অনাবৃত কর।

"মাতা দেহ মার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ আপন উজ্জ্বল শরীর সকলের দর্শনার্থ প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার কার্য্যে ব্যাপ্ত হইবে না।"

(১ মণ্ডল, ১২৩ সূক্ত, ৮, ১০, ১১ ঋক্)

"উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইয়া দিক্‌সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন; পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গে থাকিয়া উভয়কে নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিতেছেন, এবং বিস্তীর্ণরূপে প্রোথিত হইতেছেন।

"যুবতী উষা পূর্ব্ব দিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণবর্ণ অমরগণকে রথে যোজিত করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করিতেছেন। গৃহে গৃহে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে।

"হে উষা তোমার উদয় হওয়ায় পক্ষিগণ কুলায় হইতে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতেছে, অন্নার্থী মনুষ্যগণ চারিদিকে গমন করিতেছে। হে দেবি! গৃহী হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য ধন আনয়ন কর।"

(১ মণ্ডল, ১২৪ সূক্ত, ৫, ১১, ১২ ঋক্)

"মনুষ্য যেরূপ রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করে, সূর্য্য সেইরূপ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন। † এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহু যুগ প্রচলিত যজ্ঞকর্ম্ম বিস্তার করেন, সুফলের জন্য কল্যাণকর্ম্ম সম্পন্ন করেন।"

(১ মণ্ডল, ১১৫ সূক্ত, ২ ঋক্)

* এই ঋকের টীকায় সায়ণ লিখিয়াছেন যে সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন। 'The reckoning of the sun's daily journey, cited by Sayana perhaps from some text in the *Vedas*, is much nearer the truth than that of the puranas, being something more than 20,000 miles and being infact the Equatorial circumference of the Earth".—Bentley, *Hindu Astronomy*. P. 185. Wilson's Note.

† ঋগ্বেদে যেটি উপমামাত্র, গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সেটি উপাখ্যান হইয়া গিয়াছে। Apollo দেব Daphne দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পলায়মানা Daphne পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিলেন। অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইলে উষা অন্তর্হিত হইলেন।

"উষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও অভিষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐ নিত্য-যৌবন-সম্পন্না, শুভ্রবসনা, আকাশ-দুহিতা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দর্শন গোচর হইতেছেন; তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে; অদ্য উদয় হও।

"কতকাল হইতে উষা উদয় হইতেছেন! কতকাল পর্য্যন্ত উদয় হইবেন। বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে অনুকরণ করিতেছেন; আগামী উষাগণ এই দীপ্তিমতী উষাকে অনুকরণ করিবেন।"

"যাঁহারা পূর্ব্বকালে উষাকে উদয় হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা গত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন।"

(১ মণ্ডল, ১১৩ সুক্ত, ৬, ৭, ১০, ১১, ঋক্)

অনন্ত প্রবাহিনী, অতুলসৌন্দর্য্যোপেতা উষাকে দেখিয়া যে চিন্তালহরী যে উপমালহরী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল ঋগ্বেদের পত্রে পত্রে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে, আমরা চারি সহস্র বৎসর পরে তাঁহাদিগের সেই অনপনেয় সুন্দর চিন্তাগুলি দেখিতে পাইতেছি। এই চিন্তাগুলি পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন আমরা অদ্যকার আড়ম্বরপূর্ণ বৃথা বিবাদপূর্ণ আধুনিক জগতে নাই, যেন সিন্ধুতীর-নিবাসী সরল হৃদয় সবল বাহু পূর্ব্ব পুরুষদিগের শান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিতেছি, তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছি, তাঁহাদিগের মনের ভাব ও চিন্তা জ্ঞাত হইতেছি। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উর্ব্বরা ক্ষেত্রে যবাদি শস্য চাষ করিতেছেন, গোচর হইতে অন্য গোচরে পশু লইয়া যাইতেছেন, অরুণবর্ণ উষা বা জলন্ত সূর্য্য দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে দ্রবীভূত হইতেছেন, প্রাতঃকালে অগ্নি জ্বালিয়া সেই প্রকৃতির অনন্ত মহিমার স্তুতি করিতেছেন, আবার যুদ্ধের সময় সকলে অস্ত্র ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্য অধিকার, আর্য্য নাম, আর্য্য গৌরব, বিস্তার করিতেছেন। চারি সহস্র বৎসর পর সেই সরলতাপূর্ণ পরাক্রান্ত মহাত্মা পিতৃদেবদিগকে নমস্কার করি।

চতুর্থ প্রস্তাব : অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ

অগ্নি মনুষ্য সভ্যতার একটি প্রধান সাধন, মনুষ্য সুখের একটি প্রধান উপকরণ। সুতরাং আদিম আর্য্যজাতি সেই অগ্নির আরাধনা করিত। পরে যখন সেই জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখনও সেই পুরাতন দেবকে সেই পুরাতন নামেই আরাধনা করিতে লাগিল।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, যে গ্রীসদেশে অগ্নিকে যে যে নামে পূজা করা হইত, সে সমস্ত নামই হিন্দুদিগের ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অগ্নি সকল সময় যুবা, কেননা সকল সময়ই নূতন রূপে প্রজ্বলিত হয়েন, এবং এই হেতু ঋগ্বেদে অগ্নিকে সর্ব্বদাই "যবিষ্ট" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মার Hephaistos নাম এই "যবিষ্ট" নামের রূপান্তর মাত্র। এই Hephaistos দেবকে রোমকগণ Vulcan বলিয়া ডাকিত, উপরি উক্ত পণ্ডিতদিগের মতে Vulcan শব্দ—উল্কা শব্দের প্রতিরূপ-মাত্র। আবার দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ—বা মন্থন করিলে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইজন্য অগ্নিকে "প্রমন্থ" বলা যায়। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন গ্রীকদিগের যে Prometheus দেব স্বর্গ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি আনিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এই "প্রমন্থ" নামের রূপান্তর মাত্র। স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিবার গল্প যেরূপ গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেইরূপ হিন্দুদিগের ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুবংশীয়দিগের জন্য অগ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন; (১ মণ্ডল, ৬০ সূক্ত, ১ ঋক্)। পুরাণে মাতরিশ্বা বায়ু; ঋগ্বেদে মাতরিশ্বা বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অর্থে—অগ্নি।*

"অগ্নি" নামটিও ইউরোপে পাওয়া যায়। লাটিনগণ অগ্নিকে Ignis কহিত, শ্লাভগণ Ognis কহিত। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের মধ্যে অগ্নির বড়ই সম্মান, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অহুর মজ্‌দের পুত্র, এবং "অতর" নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির "নরাশংস" ও "তনূনপাৎ" বলিয়া দুইটি বিশেষ

---

* "তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উকথ্যং।"

(৩ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত, ২ ঋক্)

নাম আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটিরও প্রতিরূপ শব্দ "নৈর্য্যোসঙ্ঘ" ইরাণীয়-দিগের জেন্দ অবস্তায় পাওয়া যায়। যথা,—

"আমরা অহুরো মজ্‌দের পুত্র অতর্‌কে যজ্ঞ প্রদান করি। আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি। রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্য্যোসঙ্ঘকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।" (জেন্দ অবস্থা, দ্বিতীয় সিরোজা)

অগ্নি না হইলে হিন্দুদিগের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এইজন্য ঋগ্বেদে অগ্নিই দেবদিগের যজ্ঞনির্ব্বাহক পুরোহিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক মণ্ডলের প্রথম সূক্তগুলি অগ্নির স্তুতি। দেবদিগের যজ্ঞকার্য্যে অগ্নিতেই হব্য নিক্ষেপ করা হইত, এই জন্য অগ্নিই দেবদিগের হব্যপক্ষ ও দূত। যজ্ঞ করিলেই ধন পাওয়া যায়, এইজন্য অগ্নিই ধন দাতা, তিনি দ্রবিণোদা। আমরা এখানে ঋগ্বেদ সংহিতার সর্ব্ব প্রথম অংশটুকু অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি উদ্ধৃত করিব।

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্, অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

"অগ্নি পূর্ব্বে ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতি-ভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

"অগ্নি দ্বারা যজমান ধনলাভ করে, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

"হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না, এবং সে যজ্ঞ দেবগণের নিকট গমন করে।

"অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্যপরায়ণ এবং প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করুন।

"হে অগ্নি, তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন কর, হে অঙ্গিরা! সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

"হে অগ্নি আমরা দিন দিন দিবস ও রাত্রিতে মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করত তোমারই সমীপে আসিতেছি। তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল।

"পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ হও; আমাদিগের কল্যাণের জন্য নিকটে বাস কর।"

(১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ১ হইতে ৯ ঋক্)

পাঠক দেখিবেন যে, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে অঙ্গিরা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নি অঙ্গিরা বংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ, অর্থাৎ প্রথম অঙ্গিরা ছিলেন, এরূপ কথা ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দেখা যায়। আবার অঙ্গিরাগণ প্রথমে অগ্নিকে ধারণ করেন, পরে অন্যান্য লোক অগ্নির উপাসনায় রত হয়, এরূপ কথাও অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, মাতারিশ্বা মনুর জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশীয়গণ ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসনা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা অগ্নির আর একটি স্তুতি এখানে উদ্ধৃত করিব। সেটি দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্ত হইতে উদ্ধৃত এবং তাহাতে অগ্নিকেই সর্ব্বদেবাত্মক বলিয়া সম্বোধন করা করা হইয়াছে।

"হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমিই ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কার যোগ্য। হে ধনবান্ স্তুতির অধিপতি! তুমিই ব্রহ্মণস্পতি। তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহুপ্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর।

"হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ। তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুদিগের পালক, অতএব তুমি অর্য্যমা, তোমার দান সর্ব্বব্যাপী। তুমি অংশ, হে দেব! তুমি আমাদিগকে যজ্ঞে ফল দান কর।

"হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্য্যাকারীর বীর্য্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য-সকল তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ।

"হে অগ্নি! তুমি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, তুমি মরুৎগণের বল স্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধারস্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে গমন কর। তুমি পূষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পরিচালক ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর।

"হে অগ্নি! তুমি অলঙ্কারকারী যজমানের পক্ষে দ্রবিণোদা, অর্থাৎ

স্বর্ণদাতা। তুমি দ্যোতমান্ সবিতা, রত্নের আধার স্বরূপ। হে নৃপতি! তুমি ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্য্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর।

"হে অগ্নি! লোকে নিজ নিজ গৃহে তোমাকে প্রাপ্ত হয় ও তোমাকে ভূষিত করে। তুমি মনুষ্যগণের পালক, দীপ্তিমান্ এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ সম্পন্ন। তোমার সেনা অতি উত্তম, তুমি সমস্ত হব্যের ঈশ্বর, তুমি তুমি সহস্র শত, ফল দান কর।

"হে অগ্নি। লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যে হেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্ম্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাহাদিগের শরীর দীপ্ত করিয়া দাও। যে তোমার পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার পুত্র হও। তুমি সখা, তুমি শুভকারী ও শত্রুনিবারক হইয়া পালন কর।

"হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্ব্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার ছেদনের জন্য ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠাদি দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্ব্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর।

"হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা ভারতী, তুমি স্তুতি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা, তুমি দান সমর্থ। হে ধনপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।

"হে অগ্নি! উত্তমরূপে পোষিত হইলে তুমিই উত্তম অন্ন। তোমাতে স্পৃহনীয় এবং উত্তমবর্ণ ঐশ্বর্য্য অবস্থিতি করে। তুমিই অন্নস্বরূপ, তুমিই তার কর, তুমিই বৃহৎ, তুমি বহুল ও সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ।

"হে অগ্নি! আদিত্যগণ তোমাকে মুখ করিয়াছেন; হে কবি! শুচি দেবগণ তোমাকে জিহ্বা করিয়াছেন। দানকালে সমবেত দেবগণ যজ্ঞে তোমার অপেক্ষা করেন, এবং তোমাতেই আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন।"

(২ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৩ হইতে ১৩ ঋক্)

বায়ুও আদিম আর্য্যদিগের আরাধ্য দেব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুরাতন সাধারণ নাম লইয়া সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিগণ তাঁহার আরাধনা করিত। গ্রীক ও লাটিনদিগের Pan ও Favonius সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিরূপ, এবং ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তায় এই দেব "বায়ু" নামেই

উপাসিত হইয়াছেন, এবং বায়ুর সাহায্যে থে্রতেয়ন অহিকে বিনাশ করেন এরূপ বিবরণ আছে, যথা—

"থে্রতেয়ন বায়ুর নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন হে উর্দ্ধ-বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও, যেন আমি তিনমুখ ও তিন মস্তকযুক্ত অহি দহককে পরাস্ত করতে পারি।...

"উর্দ্ধ-বিচারী বায়ু সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজদের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে সেই বর দিলেন।" (জেন্দ অবস্তা। রাম যাস্ত)

ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ুর বড় অধিক স্তুতি নাই, আমরা একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে রমণীয় বায়ু আইস, এই সোমরস সমূহ অভিষুত হইয়াছে। ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

"হে বায়ু! যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে।

"হে বায়ু! তোমার সোমগুণ প্রকাশক বাক্য সোমপানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে।"

(১ মণ্ডল, ২ সূক্ত, ১ হইতে ৩ ঋক্)

মন্দ মন্দ বায়ু অপেক্ষা ঝড়ের প্রবল বাত্যা সরল হৃদয় প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ অধিক পরিমাণে আলোড়িত করিয়াছিল, সুতরাং ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ু অপেক্ষা প্রবল মরুৎগণের অধিক স্তুতি দেখিতে পাই। দুই একটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে নরগণ! তোমাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারিদিক পরিচালিত করিতেছ।

"হে মরুৎগণ! তোমাদিগের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মনুষ্য গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, কেন না তোমাদের গতিতে বহু পর্ব্বযুক্ত গিরিও সঞ্চালিত হইতেছে।

"তাঁহাদিগের গতিতে পদার্থসমূহ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, পৃথিবীও বৃদ্ধ জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হইতেছে।" (১ মণ্ডল, ৩৭ সূক্ত, ৬, ৭, ৮ ঋক্)

"প্রশ্রুতস্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে; মরুৎগণ বৃষ্টিদান করিতেছে।

"উদকধারী মেঘের দ্বারা মরুৎগণ দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।

"মরুৎগণের গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি কম্পিত হইতেছে, মনুষ্যগণ কম্পিত হইতেছে।

"হে মরুৎগণ! তোমাদিগের দৃঢ় হস্তের সহিত বিচিত্র তটশালিনী নদী দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর।

"তোমাদিগের রথের নেমি দৃঢ় হউক, অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলি বল্গা-ধারণে সুদীক্ষিত হউক।"

(১ মণ্ডল, ৩৮ সূক্ত, ৮ হইতে ১২ ঋক্)

"মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণকে সেবা করিতেছেন। সূর্য্য যেরূপ অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, দীপ্তশরীরা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎদিগের রথে উঠিয়া শীঘ্র আগমন করিতেছেন।

"যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তরুণ মরুৎগণ তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী তাহাদিগের সহিত সঙ্গতা হইতেছেন। যজমান মন্ত্র ও হব্য ও সোমাভিষব দান করিয়া মরুৎগণের পরিচর্য্যা করত স্তব করিতেছেন।"

(১ মণ্ডল, ১৬৭ সূক্ত, ৫ ও ৬ ঋক্)

শেষের দুই ঋকে রোদসী মরুৎদিগের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রোদসী অর্থে এখানে বিদ্যুৎ, কবি সুন্দর কল্পনা পরবশ হইয়া বিদ্যুৎকে প্রবল ঝড়ের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার অন্যান্য স্থানে রোদসী রুদ্রের স্ত্রী, মরুৎগণের মাতা। "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা।"

[সায়ণ, ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের ব্যাখ্যা]

ঋগ্বেদে অনেক স্থানে এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। পুরাণের দেবদিগের ন্যায় ঋগ্বেদের দেবদিগের ততটা ব্যক্তিগত পার্থক্য নাই, দেবদিগের পিতা, পুত্র, মাতা, ভার্য্যা, দুহিতা ও বংশাবলির বিবরণ ততটা স্থিরীকৃত হয় নাই। সরল স্বভাব উপাসক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের স্তুতি করিতেছেন, ভক্তি ও কল্পনায় দ্রবীভূত হইয়া আহ্বান করিতেছেন, হৃদয় যে নাম

বলিয়া দিতেছে, সেই নাম দিয়া আহ্বান করিতেছেন। ঋগ্বেদের উপাসনার প্রাচীনত্ব ও সরলত্ব ইহা দ্বারাই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।*

ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে পৃশ্নিই মরুৎদিগের মাতা এবং রুদ্র মরুৎদিগের পিতা। পৃশ্নি অর্থে সায়ণ পৃথিবী করিয়াছেন, কিন্তু যাস্ক আকাশ করিয়াছেন। যাস্কের অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, আকাশই ঝড়ের মাতৃস্থানীয়া। রোথ ও লাংলোয়া পৃশ্নি অর্থে মেঘ বিবেচনা করিয়াছেন। মারুৎদিগের পিতা রুদ্র সম্বন্ধে আমরা ইহার পরের প্রস্তাবে লিখিব।

মরুৎগণের বাহন পৃষতী। সে পৃষতী কি?

ঐতিহাসিকগণ বলেন শ্বেত বিন্দুচিহ্নিত মৃগই পৃষতী এবং উহাই মরুৎগণের বাহন। নৈরুক্তগণ, বলেন নানা বর্ণ মেঘমালাই পৃষতী। মেঘকে ঝড়ের বাহন বলিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব নহে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে দেবদিগের সাধারণ নাম মরুৎ হইয়া গিয়াছে এবং দেবপতি ইন্দ্রকে "মরুতাং পতি" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তাহার উৎপত্তি ঋগ্বেদেই স্পষ্ট দেখা যায়। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ঝড়ের সহায়তায় বৃষ্টি দান করেন ; সুতরাং ঋগ্বেদে একটি কল্পনা আছে যে, ইন্দ্র যখন মেঘরূপ অহিকে হনন করিয়া বৃষ্টিদান করেন, তখন মরুৎগণ, অর্থাৎ ঝড়, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। অতএব বৃষ্টিদাতা ইন্দ্রকে মরুৎদিগের পতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে ইন্দ্র ও মরুৎগণের একত্র স্তুতি আছে। কিন্তু বোধ হয় এইরূপ একত্র স্তুতি হওয়াতে কোন কোন ঋষি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বকালে আপত্তি ছিল ; তাঁহারা ইন্দ্রকে অতিশয় বড় মনে করিতেন, এবং

*"The mythology of the Veda is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar.......The whole nature of these so-called gods is still transparent ; their first conception in many cases clearly perceptible. There are as yet no genealogies, no settled marriages between gods and goddesses. The father is sometimes the son, the brother is the husband, and she who in one hymn is the mother, is in another the wife. As the conceptions of the varied, so varied the nature of these gods. Nowhere is the wide distance which separates the ancient poems of India from the most ancient literature of Greece so clearly felt than when we compare the growing myths of the Veda with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The Veda is the real Theogony of the Aryan races." Maxmuller's Comparative Mythology. Selected Essays, Vol. 1 (1881) P. 381.

মরুৎদিগকে তাঁহার উপযুক্ত সহায় বলিয়া মনে করিতেন না। প্রথম মণ্ডলের ১৬৯ নং সূক্তে এই ভাব কিছু কিছু লক্ষিত হয়। সেই সূক্তে ইন্দ্র ও মরুৎগণের কথোপকথন আছে, ইন্দ্র একাকীই অহিকে বিনাশ করিয়াছেন, একাকীই উপাসনার পাত্র এইরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মরুৎগণ ইন্দ্রের অনেক স্তুতি করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন।

ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও ব্রহ্মণস্পতির পরশু তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের রূপ বিধান করেন, সমস্ত জীবের রূপ ব্যক্ত করেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের রূপ বিধান করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। ত্বষ্টার সৃষ্ট পান পাত্র ঋভুগণ চারিখণ্ড করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং ত্বষ্টার কন্যা সরন্যুর বিবাহ সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র ত্বষ্টাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গৃহে সোমপান করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণ আছে। (৩।৪৮।৪ এবং ৪।১৮।৩) এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন এরূপও আখ্যান আছে। (১।৮।৯)। এ আখ্যানের উৎপত্তি ও অর্থ বুঝিতে পারি পাই।

ঋগ্বেদে পর্জ্জন্য শব্দ কখনও মেঘ অর্থে, এবং কখনও মেঘরূপ বৃষ্টিদাতা দেব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৩৮।৯ ঋকে আছে যে মরুৎগণ উদক-ধারী পর্জ্জন্য দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিয়াছেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে কেবল মেঘমাত্র, মেঘরূপ দেব নহে। আবার ৫ মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে এবং ৭ মণ্ডলের ১০১ ও ১০২ সূক্তে পর্জ্জন্যকে বৃষ্টিদাতা ও বজ্রধারী দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। ডাক্তার বূলর ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য লিথুনীয়দিগের বজ্রদেব পর্জ্জনকে একই দেব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

সোমরস প্রাচীন আর্য্যদিগের যজ্ঞের একটি প্রধান সাধন, সুতরাং সোমকে প্রাচীন আর্য্যগণ দেব বলিয়া উপাসনা করিত, এবং জেন্দ অবস্তায় হওমার অনেক স্তুতি দৃষ্ট হয়, যথা,—

"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হওমাকে যজ্ঞ দান করি; আমরা হর্ষদাতা হওমাকে যজ্ঞদান করি; তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন। আমরা হওমাকে যজ্ঞদান করি। তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন।"

(জেন্দ অবস্তা, দ্বিতীয় সিরোজা)

"যে মনুষ্য হওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে।"

(জেন্দ অবস্তা, বহরাম যান্ত।)

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আমরা দেখিতে পাই যে সবিতা আপন দুহিতা সূর্য্যাকে সোমরাজার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আবার ৯।১১৩।৩ ঋকে আছে, যে, সূর্য্যের দুহিতা পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত সোমকে আনয়ন করেন। ইহার প্রকৃত অর্থ কি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। ৯।১।৬ ঋকে আছে, সূর্য্যের দুহিতা পরিশ্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্য কিরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ ?

এক্ষণে আমরা যম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পুরাণের যম কে, তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাহাকে "যম" বলিত ? বিবস্বানের দ্বারা ত্বষ্টা-কন্যা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাহার ভগিনী যমীর জন্ম হয়, তাহা আমরা অশ্বিদ্বয়ের বিবরণে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বিবস্বান অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে উষা। আকাশ উষাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের পুত্র যম কে ? মক্ষমূলর উত্তর করেন দিবস বা সূর্য্যই যম। আখ্যানে আছে যে, সরণ্যু যমকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন,—তাহার অর্থ উষা অদৃশ্য হইল, দিবস হইয়াছে। আবার আখ্যানে আছে যে বিবস্বান দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন ;—তাহার অর্থ সায়ংকালের সন্ধ্যা আকাশকে আলিঙ্গন করিল।

এই মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দিবস বা সূর্য্য এবং রাত্রিকেই প্রথম ঋষিগণ যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। এই মতটি গ্রহণ করিবার পক্ষে আমরা তিনটি প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি।

(১) যম—বিবস্বান ও সরণ্যু ; অর্থাৎ আকাশ ও উষার সন্তান বলিয়া ঋগ্বেদেই বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ ও উষার সন্তান দিবস বা সূর্য্য হওয়াই সম্ভব।

(২) যম শব্দের অর্থই যমক সন্তান। দিবস ও রাত্রিকে যমক সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা সম্ভব।

(৩) পুরাণেও যমকে সূর্য্য না বলুক সূর্য্যের সন্তান বলে।

দিবস বা সূর্য্যরূপ যম পুরাণের মৃত্যুরাজ হইলেন কিরূপে ? তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিককে উৎপত্তি স্থল মনে

করিতেন, পশ্চিম দিককে সেইরূপ জীবনের অবসান বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্য বা দিবস পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অন্তর্হিত হয়েন, অর্থাৎ জীবনের ভ্রমণ শেষ করিয়া পরলোকের পথ দেখান। এইরূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল যম পাপাত্মাদিগের শাস্তি দেন, এ কথার উল্লেখ ঋগ্বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ সমস্ত গল্প পৌরাণিক, কালে ক্রমে কল্পিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ অবস্থায় যমকে "যিম" বলে। বেদে যেরূপ যমের পিতা বিবস্বান্, জেন্দ অবস্থায় যমের পিতা বিবন্ঘৎ। বেদে যেরূপ পুণ্যাত্মা লোক যমের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করে, জেন্দ অবস্তায়ও সেইরূপ পুণ্যাত্মা লোকও উৎকৃষ্ট পশু পক্ষী যিমের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জগতে বাস করিতে পায়। পৌরাণিক যমপুরী ঠিক ইহার বিপরীত,—পাপীদিগের নরক।

পরে ইরাণে এই গল্প আরও বাড়িতে লাগিল এবং সেই গল্প অবলম্বন করিয়া পারসীক কবি ফেদ্রসী তাঁহার রচিত শাহনামায় যিমকে যমশিদ্ নামে একজন পরাক্রান্ত সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই যমশিদ্ যে ঋগ্বেদের যমতারা তাহা অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণূফ (Burnouf) প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়াছেন, যে, ফেদ্রসীর ঐতিহাসিক যমশিদ্, ফেরুদিন্ ও গশাস্প আর কেহ নহে, জেন্দ অবস্থায় যিম, থ্রেতেয়ন, এবং কেরেশাস্প, এবং জেন্দ অবস্থার এই তিনজন আদিম মনুষ্য আর কেহ নহে ঋগ্বেদের যম, ত্রিত, কৃশাশ্ব!

১০ মডলের ১০ সূক্তের যম ও তাহার ভগিনী যমীর একটি কথোপকথন আছে। যমী তাঁহার ভ্রাতাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে বার বার লালসা প্রকাশ করিতেছেন, এবং যম সে প্রস্তাব পাপ জনক বলিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগিনীকে অন্য স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ দিলেন। ১০ মডলের ১৪ সূক্তে যমের সম্বন্ধে পরলোকের কথা আছে, আমরা তাহা হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ব্রাহ্মণদিগের অন্তেষ্টি ক্রিয়ায় এই ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করিতে হয়।

"যে পথ দিয়া আমাদের পূর্ব্বে পিতাগণ গিয়াছেন, সেই পুরাতন পথ দিয়া গমন কর। স্বধায় হৃষ্টে উভয় যম ও দেব বরুণ রাজাদ্বয়কে দেখিবে।

"পিতৃদিগের সহিত সম্মত হও; যমের সহিত সম্মত হও, পরম স্বর্গে যজ্ঞ ফল লাভ কর। দোষ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রবেশ কর, দ্যোতমান শরীর ধারণ কর।

"এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, শীঘ্র প্রস্থান কর, পিতৃগণ তাঁহার জন্য এই লোক প্রস্তুত করিয়াছেন। যম তাঁহাকে দিবস এবং জল ও আলোক দ্বারা ব্যক্ত একটি আবাস দিয়াছেন।

(১০ মণ্ডলের, ১৪ সূক্ত, ৭, ৮, ৯ ঋক্)

পঞ্চম প্রস্তাবঃ সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ।

ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র। বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি।

ঋগ্বেদে যে সকল দেবীর স্তুতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ভারতবর্ষে এক্ষণে উপাসিতা হয়েন না; অদিতি বা উষার উপাসনা এক্ষণে প্রচলিত নাই। আবার এক্ষণে যে সকল দেবীর উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, শক্তি, কালী, দুর্গা, উমা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি আধুনিক দেবীগণ ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগের উপাসনা ঋগ্বেদে রচনার অনেক পর কল্পিত হইয়াছে। প্রাচীনা দেবীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সরস্বতীর পূজাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষে যেন যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত বিদ্যার আদর থাকে।

ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী দেবীও বটেন, বাক্‌দেবীও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী; ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপাসিত হইত। বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋগ্বেদের পবিত্র মন্ত্র ও স্তুতি উচ্চারিত হইত, সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী অর্থাৎ বাগ্দেবী হইয়া গেলেন। নিম্ন স্তোত্রে সরস্বতীর উভয় প্রকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে।

"পবিত্রা, অন্ন যুক্তযজ্ঞ বিশিষ্টা ও যজ্ঞ ফলদায়িনী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।"

"সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী, দেবী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করুন।"

"সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন। (১ মণ্ডল, ৩ সূক্ত ১০, ১১, ১২ ঋক্)

৭ মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে সরস্বতীকে সরস্বৎ নামক এক দেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঋষি স্পষ্টই "সরস্বতী" স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, নচেৎ সরস্বৎ নামে ঋগ্বেদে পৃথক

দেবী নাই। সরস্বতী যে নদী তাহা ঋষিগণ স্পষ্টই জানিতেন, তাঁহাদের সমস্ত স্তুতিতেই সেই সরস্বতী নদীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণে ইলা মনুর কন্যা, ঋগ্বেদে ইলা একজন উপাস্যা দেবী, কিন্তু মনুর কন্যা নহেন। ঋগ্বেদে ইলার আদি অর্থ কি ঠিক করা দুষ্কর। সায়ণ অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবী বা ভূমি, এবং অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ (Burnouf) ইলার এই দুই অর্থ করিয়া গিয়াছেন বাক্য ও ভূমি। ১ মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে আছে যে দেবগণ ইলাকে মনুর ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছেন।

বর্ণুফ বলেন মনু অর্থে মনুষ্য, ইলা অর্থে বাক্য, দেবগণ বাক্য দ্বারাই মনুষ্যের জ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছেন।

ইলার সঙ্গে ঋগ্বেদের অনেক স্থলে মহী বা ভারতী এবং সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ণ ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক করিয়া সরস্বতী অর্থে অন্তরীক্ষস্থ বাক্ এবং মহী বা ভারতী অর্থে স্বর্গস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। আবার ভারতী অর্থে ভারত নামক আদিত্যের পত্নী বলিয়া কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১।২২।১০ ঋকের টীকা দেখ।) ঐ ঋকে হোত্রা ও বরুত্রী ধিষনারও উল্লেখ আছে ; সায়ণ হোত্রা অর্থে অগ্নি পত্নী এবং ধিষণা অর্থে বাগ্দেবী করিয়া গিয়াছেন।

Muir বিবেচনা করেন যে ইলা ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধিষণা এ সকলগুলিই যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশ বাচক শব্দ, ক্রমে দেবী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

পৃথিবী দ্যুর পত্নী এবং দেবগণের মাতা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রুদ্রের পত্নী রোদসীর বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী, অগ্নির স্ত্রী অগ্নায়ী এই সকল দেবের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে মাত্র, কোনও পৃথক স্তুতি নাই। পুংলিঙ্গ দেববাচক শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া ঋষিগণ দেবীর কল্পনা করিয়াছেন মাত্র পুরাণে সে কল্পনা সম্পূর্ণতা লাভ করিল। পুরাণের ইন্দ্রাণী কেবল নাম মাত্র নহেন, রূপ লাবণ্য বিশিষ্টা নানা গুণোপেতা স্বর্গের মহিষী, এবং অনন্ত পৌরাণিক উপাখ্যানের আধারভূতা।

ঋগ্বেদের দেবদেবীর কথা প্রায় সাঙ্গ হইল, কেবল তিন জনের কথা বলিতে বাকী আছে ; পুরাণে যাঁহারা সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও ধ্বংস কর্ত্তা, ঋগ্বেদে তাহাদের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা বলিয়া দেবতা নাই; ব্রহ্মা অর্থে প্রার্থনা, ঋগ্বেদে ব্রহ্মা অর্থে প্রার্থনাকারী একজন পুরোহিত বিশেষ। ব্রহ্মণস্পতি অথবা বৃহস্পতি নামে ঋগ্বেদে একজন দেব আছেন, তিনি প্রার্থনার পতি। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে তিনি অগ্নির রূপান্তর মাত্র।

"ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই অস্ত্রে মন্ত্রে বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন।

"হে দেবগণ! সে মন্ত্র সুখের উৎপত্তি হেতু এবং হিংস দোষ রহিত, আমরা যজ্ঞে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি। হে নেতৃগণ! যদি তোমরা মন্ত্র কামনা কর, তাহা হইলে কমনীয় মন্ত্রসকল তোমাদিগের নিকট উপনীত হইবে।

"যিনি দেবগণকে কামনা করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? যিনি যজ্ঞের জন্য কুশ ছিন্ন করেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিকদিগের সহিত যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছেন, বহু ধনোপেত গৃহে গমন করিয়াছেন।"

(১ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত, ৫।৬।৭ ঋক্)

এই ঋক্‌গুলিতে এবং এই রূপ ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক ঋক্‌গুলিতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রার্থনার পতি। এই ব্রহ্মণস্পতিকেই ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে "ব্রহ্মা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে;—"

(৪।৫০ সূক্তের ৮ ও ৯ ঋক্ দেখ)

ঋগ্বেদে বিষ্ণুরও নাম পাওয়া যায়, এবং তিনি তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন,—এ কথাও পাওয়া যায়।

"বিষ্ণু সপ্ত ধামের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

"বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম, সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।"

"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরম পদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করে।

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।" (১ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ১৬ হইতে ২১ ঋক্)

বিষ্ণু তিন প্রকার পদ বিক্রম করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কি? ঋগ্বেদের বিষ্ণু কে?

শাকপুণিঃ ও ঔর্ণবাভ নামক ঋগ্বেদের দুইজন পুরাতন ব্যাখ্যাকার ছিলেন, তাঁহাদিগের মত যাস্ক নিরুক্ততে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্গাচার্য্য কৃত নিরুক্ত ব্যাখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বিষ্ণু আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য। শাকপুণির মতে সেই বিষ্ণু পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং স্বর্গে সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান আছেন,—এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ। ঔর্ণবাভের মতে সেই সূর্য্যরূপ বিষ্ণু সমারোহণের সময় উদয়গিরিতে, দ্বিপ্রহরে সময় মধ্য আকাশে এবং অস্ত যাইবার সময় অস্তগিরিতে পদ বিক্ষেপ করেন, এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ।

এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপ স্বরূপ একটি বৈদিক উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন, বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল, এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ ও বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের, দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া জগৎ পাইলেন! আবার ঐ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই কথা পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণু বামন অবতার ও বলি রাজার দমন সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে!

ঋগ্বেদে রুদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনিও পৌরাণিক রুদ্র নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদে রুদ্র মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, অথচ রুদ্র অগ্নির রূপ বিশেষ তাহাও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।* আর রুদ ধাতু

*"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"। যাস্ক। "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে"। সায়ণ।

অর্থে ক্রন্দন করা বা শব্দ করা, রুদ্র ঝড়ের পিতা, শব্দকারী অগ্নিরূপী দেব। এখন আমরা রুদ্রের বৈদিক অর্থ বুঝিলাম, রুদ্রের আদি অর্থ বজ্র !

এক্ষণে একটি বিষম প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে প্রার্থনা, ব্রহ্ম অর্থে একজন পুরোহিত, ব্রহ্মণস্পতি অর্থে প্রার্থনার দেব, অগ্নির রূপ বিশেষ, তাঁহাকেও কখন কখন ব্রহ্মা নাম দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য তিনি একজন সামান্য দেব, ইন্দ্রের সখা বলিলে তাঁহার স্তুতি করা হইল। রুদ্র অর্থে ঝড়ের উৎপাদক অগ্নিরূপী বজ্র। প্রার্থনা দেব বাচক ও সূর্য্য বাচক ও রুদ্র বাচক তিনটি শব্দ লইয়া পুরাণের স্থিতি প্রলয়কারীর মহৎ অনুভব কিরূপে উদয় হইল ? পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মহৎ অনুভব অর্থাৎ এক জগদীশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস কার্য্যের অনুভব কোথা হইতে উঠিল ?

বিশেষ অনুশীলন করিয়া দেখিলে এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। আমরা পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছি যে বেদ রচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বা বিস্ময়কর বা ভয়ঙ্কর দেখিতেন তাহাই উপাসনা করিতেন। আকাশের অনন্ত বিস্তৃতিকে বরুণ বলিয়া, বৃষ্টিকারী আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া কমনীয় উষা বা জলন্ত সূর্য্য, দীপ্তিমান্, অগ্নি বা কমনীয় বায়ুকে ভক্তিভাবে স্তুতি করিতেন। প্রকৃতির যাহা কিছু দেখিয়া সেই সরল চিত্ত পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয় আলোড়িত হইত। প্রকৃতির যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ও পশ্বাদি পালন করিয়া জীবনধারণ করিতেন, ভক্তিভাবে নত হৃদয়ে সেই সকল সৌন্দর্য্য, সেই সকল কার্য্যের স্তুতি করিতেন।

কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদিগের আলোচনা শক্তির বৃদ্ধি হইল। জ্ঞানের উন্নতি হইল। তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সমস্ত কার্য্য একই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত ! সূর্য্য আমাদিগকে পালন করিতেছেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করিতেছেন, অগ্নি ও জল আমাদিগকে পালন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য্য ও বায়ু, অগ্নি ও নদী একই নিয়ম শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, অতএব সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও জলের একজন পরিচালক, একজন নিয়ন্তা আছেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বা প্রজাপতি বলিয়া ডাকিলেন, উপনিষদের প্রণেতাগণ তাঁহাকে আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ বলিয়া ডাকিলেন।

তাহার পর পৌরাণিক কালে সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে তিনটি নাম দেওয়া হইল। কি নাম দেওয়া হইবে? বেদে সৃষ্টি কর্ত্তা ঠিক নাম পাইলেন না। "আরাধ্য" দেবের নাম নাই, অথবা তাঁহার নাম "আরাধনার দেব" বা 'ব্রহ্মা"। পালন কার্য্য দ্বারা যিনি সমস্ত জগৎ পরিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার পদধূলিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে, অতএব পালনকারী জগদীশ্বরের নাম "বিষ্ণু"। আর বজ্ররূপী সংহারকর্ত্তা ঋগ্বেদের "রুদ্রের" নামটিও পরমেশ্বরের সংহার কার্য্যের উপযুক্ত নাম হইল। এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের অনুভব উদয় হইল। ঋগ্বেদের সময় এবং ঋগ্বেদের বহুকাল পরে টীকাকার শাকপুণি, ঔর্ণবাভ ও যাস্কের সময় ঈশ্বরবাচী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম ভারতবর্ষে বিদিত ছিল না। বলা বাহুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি পুরাণের অসংখ্য দেব ঋগ্বেদের অপরিচিত।

আমরা লিখিয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির অনন্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ হইতে সে বিষয়ে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

"কোন্ স্থানে, কি অবলম্বনে, কোথা হইতে বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবী সৃজনকালে নিজ ক্ষমতায় স্বর্গ বিকাশিত করিলেন?

"যাঁহার চক্ষু সকল স্থানে, যাঁহার মুখ সকল স্থানে, যাঁহার বাহু সকল স্থানে, যাঁহার পদ সকল স্থানে, সেই এক দেব স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার বাহু ও পদ দ্বারা পরিচালিত করেন।" (১০ মণ্ডল, ৮১ সূক্ত, ২, ৩, ঋক্)

"স্বর্গ হইতেও বহির্ভূত, পৃথিবী হইতেও বহির্ভূত, দেব ও অসুর হইতেও বহির্ভূত কি এক গর্ভজল সমূহ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল দেবগণকে দেখা গিয়াছিল?

"সমস্ত দেবগণ যে গর্ভে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, জল সমূহ সে গর্ভধারণ করিয়াছিল। যাহাতে বিশ্বভুবন স্থাপিত ছিল, তাহা সেই জন্মশূন্যের নাভিদেশে অর্পিত ছিল।

"যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে কখনও জানিতে পারিবে না, তোমাদের মধ্যে ও তাঁহার মধ্যে অন্তর আছে। স্তোত্র রচয়িতাগণ নীহারে আবৃত হইয়া বৃথা জল্পন করিয়া এই জীবনেই তুষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছে।"

(১০ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৫, ৬, ৭ ঋক্)

"হিরণ্য গর্ভ জন্ম গ্রহণ করিয়া একাকী ভূতমাত্রের অধিপতি হইলেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ ধারণ করিলেন। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যিনি আত্মা দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবগণ পালন করেন, যাঁহার ছায়া অমরত্ব, যাঁহার ছায়া মৃত্যু। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?"

"যিনি মহত্ব দ্বারা জাগৃত ও সুপ্ত জগতের রাজা হইয়াছেন, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের অধিপতি। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?"

"যাঁহার মহত্ব দ্বারা এই হিমবান পর্ব্বত রহিয়াছে, নদীর সহিত সমুদ্র আছে, এই প্রদেশ সকল যাঁহার বাহু, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যাঁহার প্রভাবে স্বর্গ উগ্র এবং পৃথিবী স্থির, যাঁহার দ্বারা আকাশ, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষে জগৎ পরিমাণ করিয়াছেন, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"হে প্রজাপতি! তুমি ভিন্ন কেহ বিশ্ব ভূতজাতকে চারিদিকে বেষ্টন করে না। আমরা যে কামনায় যজ্ঞ করিতেছি তাহা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন অর্থ লাভ করি।" (১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত, ১ হইতে ৫ এবং ১০ ঋক্)

এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদের ধর্ম্মকে কি ধর্ম্ম বলিব? কূটতর্কে প্রবেশ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই, কোন বিশেষ মতামত সমর্থন করিবার আমাদিগের রুচি নাই, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। যেটি স্পষ্টত দেখিতেছি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহাই বলিব। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্য সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের স্তুতিতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের এক নিয়ন্তা, ঈশ্বরের আরাধনায় শেষ হইয়াছে। From Nature up to Nature's God.

আর একটি কথা মাত্র আমাদিগের বলিবার আছে। ঋগ্বেদে যাহা পাইলাম অন্য কোন জাতির কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। অন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কেবল প্রকৃতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের স্তুতি আছে অথবা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তার স্তুতি আছে। কার্য্যকলাপের অনুশীলন হইতে কিরূপে মনুষ্য চিন্তা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তা পর্য্যন্ত আরোহন করে, প্রকৃতির আলোচনা হইতে মনুষ্য ক্রমে, বহুকালে, বহু পরিশ্রমে, কিরূপে প্রকৃতির ঈশ্বরকে চিনিতে পারে, তাহা জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল ঋগ্বেদ সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব : আচার ব্যবহার ও সভ্যতা

পূর্ব্বের পাঁচ প্রস্তাবে আমরা ঋগ্বেদের দেবদিগের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি প্রস্তাবের ভিতর দেওয়া অসম্ভব। কেবল দু' একটি অতি জ্ঞাতব্য বিষয়ে একটি মাত্র কথা আমরা বলিতে পারি।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদীতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, এবং সিন্ধুর শাখানদীগুলির তীরে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে নিবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপনিবেশের চারিদিকে অনার্য্য-অসভ্য জাতিগণ তখনও অরণ্যে বাস করিত, এবং আর্য্যদিগের সহিত সর্ব্বদাই ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইত। ঋগ্বেদের শতশত স্থানে এই অনার্য্যদিগের শত্রুতা বিষয়ে উল্লেখ আছে, ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবকে দস্যুদিগের বিনাশ সাধন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কালক্রমে সবলবাহু আর্য্যগণ আপনাদিগের উপনিবেশ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, অগ্নিদ্বারা অরণ্যদাহ করিয়া ক্রমেই কৃষি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, আপনাদিগের গো, মেষ ও অশ্ব সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে আধুনিক পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করিয়া তথায় 'আর্য্যনগর ও গ্রাম' আর্য্য শিল্পকার্য্য ও আর্য্য কৃষিকার্য্য বিস্তার কবিলেন। ক্রমে তাঁহারা সরযূও অতিক্রম করিয়া গেলেন—

"হে ইন্দ্র! তুমি সরয়ূর অপর পারে অর্ণ ও চিত্ররথকে হনন করিয়াছ।"

(৪ মণ্ডল, ৩৬ সূক্ত, ১৮ ঋক্)

এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ খণ্ডে—আর্য্যগণ শতশত গ্রাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ঋগ্বেদে গ্রামের বিষয় অনেক স্থানে উল্লেখ আছে।

"হে প্রভা সম্পন্ন ধনবান্ অগ্নি! তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্ব্বাগামী উষার পর দীপ্ত হও, তুমি গ্রাম সমূহের রক্ষক।"

(১ মণ্ডল, ৪৪ সূক্ত, ১০ ঋক্)

"যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।"

(১ মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত ১ ঋক্)

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থান করিয়া আর্য্যগণ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি চাষ করিতেন, গো মেষাদি চতুষ্পদগণকে পালন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে সেই গো মেষাদির আহার্য্য উৎকৃষ্ট তৃণক্ষেত্রের অন্বেষণে এক দেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন করিতেন।

"পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় ঋতু বারবার আনিয়াছেন কৃষক যেরূপ গরুদ্বারা বারবার যব চাষ করে।"

(১।২৩।১৫)

"যে জল আমাদিগের গাভী সকল পান করে সেই জল দেবীকে আহ্বান করি, যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে হব্যদান করা বিধেয়।"

(১।২৩।১৮)

"যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে শস্যাদি দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।"

(১।১১২।১৮)

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গলদ্বারা চাষ করাইয়া, যব বপন করাইয়া শস্যের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ও বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।"

(১।১১৭।২১)

এই প্রকার শত শত ঋক্ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, তৎকালের গ্রামবাসী হিন্দুগণ এক্ষণকার গ্রামবাসীদিগের ন্যায় লাঙ্গল দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্বাহ করিয়া, শস্য উৎপাদন করিয়া এবং গো মহিষ রক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু তখন একটি ভয় ছিল অন্য যাহা নাই। আর্য্য গ্রামঞ্চলের প্রান্তে অন্যান্য দস্যুগণ বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে রাজা ছিল, সেনা ছিল এবং তখনও তাহাদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। জঙ্গলে বা নদীবক্ষে তাহারা সর্ব্বদাই আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত; কখনও বা তাহাদিগের কৃষ্ণকায় সৈন্য আর্য্যদিগের গৌরবর্ণ যোদ্ধাদিগের সম্মুখে যুদ্ধে উপনীত হইত। গ্রামবাসীদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, কৃষকগণও আয়ুধ ধারণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্র, নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল।

কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রামের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একটি শুক্ত এখানে উদ্ধৃত করিব।

"আমাদিগের সাথীর ন্যায় ক্ষেত্রপতির সহিত আমরা বিজয়লাভ করিব ; তিনি আমাদিগকে সুখী করুন।"

"হে ক্ষেত্রপতি ! গাভী যে রূপ দুগ্ধ দেয়, তুমি সেইরূপ মিষ্ট ও প্রচুর ও মধুশ্চুত ও ঘৃতের ন্যায় জল দাও। যজ্ঞপতি আমাদিগকে সুখী করুন। ওষধি সমূহ আমাদিগর পক্ষে মধুযুক্ত হউক, আকাশ জল অন্তরীক্ষ আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, আমরা যেন শত্রুকর্ত্তৃক নিবারিত না হইয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করি।

"আমাদের উক্ষগণ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে পরিশ্রম করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহগুলি সুখে বন্ধন করুক, সুখে প্রতোদ প্রেরণ কর।

"শুন ও সীর ! আমাদিগের স্তুতিবাক্যে তুষ্ট হও, এবং আকাশে সৃষ্ট বৃষ্টিজল দ্বারা এই পৃথিবী সিঞ্চন কর।

"হে সৌভাগ্যবতী সীতা ! * তুমি প্রসন্ন হও, আমরা তোমার স্তুতি করি ; যেন তুমি আমাদিগের পক্ষে সুভগা ও সুফলা হও।

"ইন্দ্র সীতাকে ধারণ করুন, পূষা তাহাকে লইয়া যাউন ; সীতা উদকপূর্ণ হইয়া বৎসর বৎসর (শস্য) দোহন করুন।

"লাঙ্গলের ফাল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, বলদের রক্ষক সুখে বলদের সঙ্গে সঙ্গে যাউক, পর্জন্য সুখে বৃষ্টিদান করুন। শুন ও সীর আমাদিগকে সুখ দান করুন।" (৪ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত)

কিন্তু ঋগ্বেদে কেবল যে কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণ ও গ্রাম সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, শিল্পকার্য্য ও নগরেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত শতপুরী ধ্বংস করিয়াছেন।" (৪।৩০।৪০)

"সোম পানে হৃষ্ট হইয়া আমি (ইন্দ্র) শম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংস করিয়াছি, অবশিষ্ট এক নগর দিবোদাসের নিবাসের জন্য দান করিয়াছি, সেই অতিথিকে আমি যজ্ঞে রক্ষা করিয়াছি।" (৪।২৬।৩)

এইরূপ অনেক স্থানে নগরের উল্লেখ আছে ; কোন কোন স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত বা লৌহময় নগরের উল্লেখ আছে, কোথাও বা শতভূজী নগরের উল্লেখ

* লাঙ্গলের ফলায় ভূমিতে যে রেখা করে, তাহার নাম সীতা। ঋগ্বেদে তিনি স্তুত হইয়াছেন, যজুর্ব্বেদে তিনি দেবী হইয়াছেন, রামায়ণে তিনি মহাকাব্যের নায়িকা হইয়াছেন। উপাখ্যানের এইরূপ উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

আছে। অতএব সে সময়ে যে সিন্ধু ও গঙ্গা যমুনাতীরে আর্য্যগণ বড় বড় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। প্রস্তর নির্ম্মিত নগর অথবা প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত নগর ছিল এরূপও বোধ হয়, কেননা পর্ব্বত সঙ্কুল দেশে প্রস্তর খণ্ড আনিয়া তদ্বারা গৃহ প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু লৌহময় নগর বোধ হয় কেবল ঋষিদিগের কল্পনা সৃষ্ট; অতি দুর্গম নগরকে উপমাস্থলে লৌহময় নগর বলিয়া গিয়াছেন।

নগরবাসিগণ যে নানারূপ শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১২ সূক্তে এবং ১০ মণ্ডলের ৯৭ সূক্তে সূত্রধার, চিকিৎসা, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি ও যে নারীগণ ধান ভানে,—তাহাদিগের উল্লেখ আছে।

শকট নির্ম্মাণের অনেক উল্লেখ আছে; এবং ধাতুদ্বারা নানারূপ পত্রাদিও অস্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত। তন্তুবায়ের ব্যবসায় বিলক্ষণরূপে পরিচিত ছিল; টানা ও পোড়েনকে "তন্তু" ও "ওতু" বলিত,—"আমি তন্তুও জানি না, ওতুও জানি না।" (৬।৯।১)

অন্য স্থানে আছে উষাও রাত্রি বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে গমনাগমন করত যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থে পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন। (২।৩।৬)

এই উপমা হইতে উপলব্ধি হয় তৎকালে দুইজন নারী একত্র পরিশ্রম করিয়া টানা ও পোড়ন সঞ্চালন করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত।

তৎকালে সমুদ্র-গামী নৌকা প্রস্তুত হইত; অশ্বিদ্বয় মজ্জমান ভুজ্যুকে শত-দাঁড় নৌকায় উঠাইয়া সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন (১।১১৬।৩)। অন্যান্য অনেক স্থলে সমুদ্র গমনের কথা আছে।

ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বস্ত্রাদি সুবর্ণের অলঙ্করাদি—রুক্ম (বক্ষের অলঙ্কার), স্রক্ অর্থাৎ হার, খাদি অর্থাৎ বালা ও মল, এবং শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, নিষঙ্গ, বর্শা, পরশু প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রাদির নানা প্রকার শিল্পের উল্লেখ আছে, সুতরাং আর্য্যরা ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন,—স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনবানদিগের দানের কথা আছে, নর্ত্তকীদিগের বেশভূষার কথা আছে; (১।৯২।৪) এবং সুভূষণ সম্পন্না বন্দীদাসীদিগেরও উল্লেখ আছে। (৮।৪৬।৩৩)

কিন্তু সে সময়ে নরনারীগণ কি প্রকার বেশ করিত; কি প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত, তাহার বিশেষ বর্ণনা আমি পাই নাই।

আর্য্যগণ যেমন আর্য্যবর্ত্তে বিস্তৃত হইতে লাগিল তেমনিই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সংস্থাপন করিতে লাগিল। সিন্ধুনদী হইতে সরযূতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশখণ্ড এক রাজার অধীন ছিল না, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। ভব্যরাজা সিন্ধুতীরে বাস করিতেন (১।১২৬।১)। চিত্র ও অন্যান্য রাজাগণ সরস্বতী তীরে রাজত্ব করিতেন (৮।২১।১৮)। দশজন রাজা সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন (৭।৩৩।৩)। অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক রাজাদিগের ও তাঁহাদিগের নিবাস স্থানের উল্লেখ আছে। দেবদিগের বর্ণনা হইতে তৎকালের রাজাদিগের সমৃদ্ধি ও অবস্থা অনেকটা অনুভব করা যায়। রাজাদিগের ন্যায় ইন্দ্র বহুস্ত্রী বেষ্টিত হইয়া বাস করেন (৭।১৮।২)। মিত্র ও বরুণ সহস্র স্তম্ভ শোভিত সহস্র দ্বার বিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করেন (২।৪১।৫); (৫।৬২।৬); (৭।৮৮।৫)। বরুণ সুবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দূত পরিবেষ্টিত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন (১।২৫।১০ ও ১৩)।

রাজাদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ অনেক ঋত্বিক ও পুরোহিত থাকিত, এবং কখন কখন রাজাগণ তাঁহাদিগকে অনেক স্বুবর্ণ রৌপ্য শকট ও গো-অশ্বাদি দান করিতেন। অনার্য্যদিগের সহিত বা অন্য আর্য্য রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ হইলে নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া প্রস্তুত হইতেন। মহাভারতের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও ভিন্ন ভিন্ন নরপতিদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, সভ্যতা ও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়; ঋগ্বেদের সময় সেরূপ দেখা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যসমাজও সেই ছাঁচে গঠিত; ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যগণ সেইরূপ ভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে বাস করিতেন, এবং সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত লিপ্ত হইতেন।

নরপতিদিগের অধীনে নগরের "পুরপতি" এবং গ্রামে "গ্রামণী" থাকিতেন।
(১।১৭৩।১০) ও (১০।৬২।১১)

যব প্রভৃতি নানারূপ শস্য মনুষ্যের আহার দ্রব্য ছিল। বৃষ পাক করারও উল্লেখ আছে (১।১৬৪।৪৩)। অশ্ব পাক করাও প্রচলিত ছিল (১।১৬২ সূক্ত)। মহিষাদি পাক করারও উল্লেখ আছে, তৎকালের আর্য্যগণ সোমরস-ভক্ত ছিলেন, এবং সুরা ও সুরাবিক্রেতারও উল্লেখ আছে। (১।১১৬।৭) ও (১।১৯১।১০)

এক পুরুষের সহিত সচরাচর এক নারীরই বিবাহ হইত, কিন্তু ধনাঢ্য লোক ও নরপতিগণের মধ্যে বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল।

"সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, সেইরূপ এই পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তিসকল আমাকে সন্তাপ দিতেছে।"

(১।১০৫।৮)

"ইন্দ্র একাই সমস্ত নগর অধিকার করিলেন, যেমন একপতি স্ত্রী সমূহকে গ্রহণ করে।" (৭।২৬।৩)

অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিতেন, এবং তাঁহারা পিতৃ-সম্পত্তির অংশ পাইতেন,—তাহাও দেখা যায়। বিধবাদিগের চির-বৈধব্যের প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। অথর্ব্ববেদে নারীর দ্বিতীয় স্বামীর কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"যে নারী প্রথম পতি হারাইয়া অন্য পতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা অজ পঞ্চৌদন প্রদান করিলে আর বিচ্ছিন্ন হয় না।

"দ্বিতীয়বার বিবাহিতা পত্নী তাহার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত একলোকে বাস করে, যদি সে অজ পঞ্চৌদন প্রদান করে।"

(অথর্ব্ববেদ ৯।৫।২৭ ও ২৮)

ঋগ্বেদের সময় সতীদাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে বিধবার প্রতি এই আদেশ,—"নারী উত্থান কর, জীব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিয়া আছ, তাঁহার জীবন গত হইয়াছে। আমাদের নিকট আইস। যে পতি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তোমাকে মাতা করিয়াছেন, তাহার প্রতি তুমি পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ।"

পুত্রহীন বিধবা তাঁহার দেবরকে বিবাহ করিবার মনুসংহিতায় যে বিধান আছে ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"অক্ষক্রীড়ায় যাহার অর্থনাশ হয়, তাহার পত্নীকে অন্যে সম্ভোগ করে।"

(১০।৩৪।৪)

মন্দ লোকদিগকে ভ্রাতৃহীন নারী ও পতি-বিদ্বেষিণী পত্নীদিগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (৪।৫।৫)

কুপথগামিনী গোপনে প্রসূতা হইয়া সন্তানকে দূরে ফেলিয়া আইসে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। (২।২৯।১)

গৃহস্থা নারী স্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ-কার্য্যাদি সম্পাদন করেন, যজ্ঞকালে স্বামীর সহিত একত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন,

তাহার ভুয়োভূয় উল্লেখ ঋগেদে পাওয়া যায়। বিদ্যাবতী রমণী ঋগ্বেদে ঋষি বলিয়া পরিচিতা হইয়া স্তোত্র রচনা ও উচ্চারণ করিতেন, ঋত্বিকের কার্য্য করিতেন, যজ্ঞও সমাধা করিতেন।

(৫।২৮।সূক্ত)

আদিম হিন্দুদিগের দেবদেবী ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি সম্বন্ধে দু' একটি কথা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেখিলেন এ দেশ অরণ্যপূর্ণ এবং সেই অরণ্যে অসংখ্য বর্ব্বর জাতি বাস করে। তখন হইতেই "আর্য্য" ও "অনার্য্য" এই দুই জাতির সৃষ্টি হইল। "ইন্দ্র দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্য 'বর্ণ'কে রক্ষা করিয়াছেন!" (৩।৩৪।৯)। ঋগ্বেদ রচনার সময় অন্য কোন জাতি ছিল না ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি ছিল না। গৃহপতি নিজেই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুত্রাদি সে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিতেন। এইরূপ পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের সকলের কুশলের জন্য, কৃষির সফলতার জন্য, গো-বৎসাদির রক্ষার জন্য, অথবা দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ধ্বংসের জন্য সোমরস ও ঘৃতাহুতি দিয়া আকাশের কল্পিত দেবদিগের আরাধনা করিতেন। পুরোহিত ডাকাইবার আবশ্যক ছিল না।

তথাপি সমাজের মধ্যে বিজ্ঞগণ মন্ত্র রচনায় ও যজ্ঞ-সম্পাদনে অধিক নৈপুণ্য লাভ করিতেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ঋত্বিকের ব্যবসা অবলম্বন করিতেন। নরপতিগণ ও ধনাঢ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া এই ঋত্বিকগণকে ডাকাইতেন, এবং এক একটি বড় যজ্ঞে ১৬ জন ঋত্বিকও নিযুক্ত হইতেন। ধনাঢ্যগণ ঋত্বিকদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দান করিতেন, এবং তাঁহাদিগের গৃহেও অনেক বেতনভোগী ঋত্বিকও বাস করিতেন।

সে সময় অঙ্গিরা, মনু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ যজ্ঞ সম্পাদন ও মন্ত্র রচনায় নৈপুণ্যলাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি পাইয়াছিলেন, এবং ঋগ্বেদে সমস্ত মন্ত্র বংশানুক্রমে তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহারা পুত্র-কলত্র বেষ্টিত হইয়া, ভূমি ও গো-অশ্বাদি অধিকার করিয়া সাংসারীর ন্যায় সংসারে বাস করিতেন এবং বেদের অনুশীলনা ও যজ্ঞাদি সম্পাদন দ্বারা কালযাপন করিতেন। আবার অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহারাই যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। বনবাসী ফলমূলহারী ঋষি বা তপস্বী ঋগ্বেদের সময় ছিল না।

সে সময়ে দেবদেবীর মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। আকাশই দেবদিগের অনন্ত অক্ষয় মন্দির, আলোক বা সূর্য্য, মরুৎগণের ভীষণ গতি বা বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দই তাঁহাদের দেবতা। প্রকৃতির সরল স্বভাব সন্তানগণ প্রকৃতিকেই উপাসনা করিতেন, সেই গৌরবান্বিত প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে প্রকৃতির আদি নিয়ন্তাকে তাঁহারা অনুভব করিলেন।

কুম্ভকারের দ্বারা বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মনুষ্য গৃহে সে বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া, বেতনভোগী পুরোহিতের দ্বারা তাহার নিকট কতকগুলি অবোধগম্য মন্ত্র পাঠ করান,—আর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমহিত হইয়া স্বয়ং ভক্তিভাবে প্রকৃতির নিয়ন্তাকে আহ্বান করা—এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে কতদূর প্রভেদ! ভারতবর্ষে আর্য্যগণ সত্যের পথ হইতে কালক্রমে বহুদূর বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে, সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা,--শ্রেণী বিশেষের স্বার্থপরতা ও সকল শ্রেণীর মানসিক বলহীনতাই ইহার প্রধান কারণ। জ্ঞানালোকের সহিত আবার হিন্দুজাতি সরল পথ প্রাপ্ত হইবে, জাতি হিতৈষী হিন্দু মাত্রেরই ইহা একান্ত প্রার্থনা।

পরিশিষ্ট-১

ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল

ইংরাজী ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-সচিবের নিকট ভারতীয় ভূমিকর সম্বন্ধে একটি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। আমি ভিন্ন বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, বম্বের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার জন জার্ডিন, মান্দ্রাজের রাজস্ব বন্দোবস্তের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ পাকৃল্, বাঙ্গালার মিঃ রেনল্ড্স্, বম্বের মিঃ রজার্স, মান্দ্রাজের মিঃ গারৃষ্টিন এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অবসর-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারিগণ উক্ত আবেদনের স্বাক্ষরকারী ছিলেন। সেই আবেদন পত্রে ভারতীয় ভূমিকর সুসঙ্গতি এবং সুবিচারের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ" নামক প্রবন্ধে এই আবেদন পত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম উহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার মন্ত্রিসভায় সেই প্রস্তাবগুলি যাবৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

কৃষকের নিকট হইতে খরচ বাদ আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেক গ্রহণ

আবেদনকারিগণ যে প্রথম নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার ভাষা এইরূপ—মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে যেখানে ভূমিকর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকের নিকট হইতে লওয়া হয়—সেখানে চাষের খরচার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের দাওয়া আসল উৎপন্নের মূল্যের অর্দ্ধাংশের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এমন কি, ভারতবর্ষের সেই সকল প্রদেশে, যেখানে আনুমানিকরূপে আসলের অর্দ্ধাংশ, তাবৎ-উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেখানেও সাধারণতঃ তাবৎ-উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশকে অতিক্রম করা উচিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রথমাংশের ভিত্তি (যাহা গবর্ণমেণ্টের দাওয়াকে আসল উৎপন্নের অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ করিতেছে) স্যর চার্লস উডের ১৮৬৪ সালের প্রেরিত পত্রের উপর সংস্থাপিত। ইহা ভারত গভর্ণমেণ্ট বাক্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তাঁহার রেজোলিউশনে বলিয়াছেন, "প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, মান্দ্রাজ প্রদেশের আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেকের নিয়ম

বিকল্পে গৃহীত হয়।” তজ্জন্য আবেদনকারিগণ কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করেন নাই, কেবল যেখানে ভূমিকর কৃষকদের দ্বারা সাক্ষাতে সরকারে প্রেরিত হয়, সেই স্থলে সেই স্বীকৃত নিয়ম ন্যায়ানুগত ও সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে কার্য্যকারী করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র। বোম্বাই প্রদেশে ভূমিকর আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেকাংশে সীমাবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। আর মান্দ্রাজ প্রদেশে সচরাচর এরূপ রাজস্ব আদায় করা হয় যে, রাজস্ব-বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারীর নিজের সাক্ষ্য দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, তথায় ভূমির কর আসল উৎপন্নের সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলে। আমি এইমাত্র অনুরোধ করিয়াছি যে, যে নিয়ম কথায় গৃহীত হইয়াছে তাহা যথাযথরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া কৃষক সম্প্রদায়কে আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক ভূমিকর হইতে রক্ষা করা হউক। লর্ড কার্জ্জন তদীয় রেজোলিউশনে এরূপ রক্ষা পাইবার কোন উপায় করেন নাই। ইহাতে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কৃষি ভূম্যধিকারীগণের ভূমিকর পূর্ব্বেরই ন্যায় অনিশ্চয় রহিয়াছে। এই অনিশ্চয়তাতে কৃষিজীবীদিগকে নীতিভ্রষ্ট করিয়া ভারতীয় কৃষিকার্য্যকে উচ্ছন্ন দিবার উপক্রম করিতেছে।

উপরোক্ত নিয়মের দ্বিতীয়াংশে বলা হইয়াছে যে যখন ভূমিকর কৃষক-দিগের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারে দেওয়া হয়, উহার সর্ব্বোচ্চ হার তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশে সীমাবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য। লর্ড কার্জ্জন নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছেন—

“আবেদনকারীগণ যে তাবৎ উৎপন্নের হার প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যদ্যপি বিধিবদ্ধরূপে প্রচলিত করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বত্র করবৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হইবে। মধ্য প্রদেশের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎপন্নের সহিত তাবৎ খাজনার অনুপাত এক-ষষ্ঠমাংশ হইতে এক চতুর্দ্দশাংশ পর্য্যন্ত, এবং ঐ হার প্রবর্ত্তিত করিলে রায়তদিগের দায়িত্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। বঙ্গীয় রিপোর্টে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সমূলক যে যুক্তি পাওয়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হয় যে তথায় খাজনা সাধারণতঃ তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অনেক নিম্নে অবস্থিত। এবং অস্থায়ীরূপে বন্দোবস্তী-কৃত গভর্ণমেণ্টের মহালের রায়তেরা, এই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূস্বামীর অধীনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থাপন্ন। মান্দ্রাজের উত্তরে লিখিত আছে যে ‘যদ্যপি গভর্ণমেণ্ট রায়তদিগের নিকট

হইতে যথার্থ তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশ লয়েন, তথায় ভূমির রাজস্ব এখন অপেক্ষা দ্বিগুণিত করিতে হইবে।'....সুতরাং আবেদনকারীরা যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, বিপরীত ফল প্রসব করিবে, তদনুসারে রাজ প্রতিনিধি ও তাঁহার সদস্যগণ এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

উদ্ধৃত সমগ্র মন্তব্যেই গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি ভুল বুঝিয়াছেন। আবেদনকারীরা এরূপ বলেন নাই যে পঞ্চমাংশই ভূমিকরের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে। তাহারা বলেন নাই যে গভর্ণমেণ্টকে প্রজার নিকট হইতে প্রকৃত সমগ্র শস্যমূল্যের পঞ্চমাংশ লইতেই হইবে। তাঁহারা কেবলমাত্র প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সমগ্র শস্যমূল্যের পঞ্চমাংশকে যেন অতিক্রম করা না হয়। ১৮৮৩ সালে সার এনটনি ম্যাক্‌ডোনাল্‌ বাঙ্গালার জমিদারগণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার চার্লস উডের ১৮৬৪ সালের নিয়ম অনুসারে গভর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক মাত্র ভূমিকর গ্রহণ করেন, পূরা নহে। তথাপি তাহা অনেক সময়ে সমগ্র উৎপত্তির পঞ্চমাংশ অতিক্রম করিয়া যায়। ১৮৮০ সালের ফেমিন কমিশনের নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে, কোন কোন তালুকের ভূমিকর তাবৎ উৎপত্তির $\frac{৩১}{১০০}$ অংশ পর্য্যন্ত আছে। এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ড এইরূপ বুঝাইতেছেন যে এই উচ্চ হার অতি ক্ষুদ্র প্রদেশেই ঘটিয়াছে, এবং $\frac{১২}{১০০}$ হইতে $\frac{২৮}{১০০}$ অংশ ধরিলে প্রকৃত সত্য অনেক পরিমাণে বজায় থাকে। ১৯০০ সালের ফেমিন কমিশনের নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে মোটের উপর গুজরাটের ভূমিকর সমগ্র উৎপত্তির $\frac{২০}{১০০}$ অংশ; সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে গুজরাটের অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ তালুক এবং গ্রামে ভূমিকর এই অংশ অপেক্ষা অধিক অথবা এই অংশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আবেদনকারীগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই প্রকার অতি মাত্রায় করের হার নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া না হয়। এবং ভূমিকরের হার জমির গুণানুসারে অল্পাধিক হইলেও কোন প্রকারেই তাবৎ উৎপত্তির $\frac{২০}{১০০}$ অংশ অতিক্রম করা উচিত নহে। আবেদনকারিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সার এন্‌টনি ম্যাক্‌ডোনাল্‌ বাঙ্গালার বে-সরকারী ভূম্যধিকারীদিগের প্রাপ্য করের যে চূড়ান্ত সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাই কৃষক প্রজাদিগের গভর্ণমেণ্টকে দেয় করেরও সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বড়ই দুর্ভাগ্য যে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি এইরূপ ভুল বুঝিলেন;

একটী স্বকপোল কল্পিত নিয়ম যাহা আবেদনকারীরা কখনও প্রস্তাব করেন নাই তাহারই সম্ভাবিত অমঙ্গল ব্যাখ্যা করিলেন এবং কৃষকদিগের দেয় ভূমিকরের চরম সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে অস্বীকার করিলেন।

ভারতবর্ষে যত প্রকার লোক গভর্ণমেণ্টকে ভূমিকর প্রদান করে তাহাদের মধ্যে মান্দ্রাজ এবং বম্বের কৃষকেরা যে পরিমাণে নিরুপায় ও অসহায় এরূপ আর কেহই নহে। উত্তর ভারতের জমিদারেরা নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করিতে সক্ষম কিন্তু দক্ষিণে ভারতের কৃষাণ ভূস্বামিগণ তাহা পারে না। উত্তর ভারতবর্ষের জমিদারেরা 'সাহারণপুরের অর্দ্ধ ভূমিকর নিয়মে'র আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা কর সীমা স্পষ্টতঃ নির্দ্ধারিত আছে। দক্ষিণ ভারতের কৃষাণ ভূস্বামীরা সেরূপ কোন স্পষ্ট সীমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্যই আবেদনকারিগণ ইহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত একটি দুই প্রকারে নির্দ্ধারিত সীমা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যে খরচ বাদ অর্দ্ধ শস্য-মূল্য গ্রহণের নিয়ম অতি দৃঢ়ভাবে এবং সর্ব্বত্রই কার্য্যতঃ রক্ষিত হয়; এবং একটি দ্বিতীয় ও অতিরিক্ত নিয়ম এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সমগ্র উৎপত্তির পঞ্চমাংশের অধিক কর গৃহীত না হয়। লর্ড কার্জ্জন প্রস্তাবদ্বয়ের কোনটি গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে ফেমিন কমিশন যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত করেন, তাহাতেও বড়লাট বাহাদুর দক্ষিণ ভারতের দীন অসহায় কৃষাণ ভূস্বামীদিগের উপর গভর্ণমেণ্টের দাবী সম্বন্ধে কোন প্রকার স্পষ্ট, সরল এবং বোধগম্য সীমা নির্দ্দিষ্ট করিলেন না। বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুণ্ন হইয়াছি। কারণ কৃষীজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা এবং বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথায়ও তত নহে। রাজার দাবীর অনিশ্চয়তা কৃষিকার্য্যকে একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলে এবং এই সর্ব্বনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষে সকল কৃষিচেষ্টার সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে। যতদিন না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তার অভ্যুদয় হইতেছে যিনি প্রজাদিগের আরও একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্য আরও একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষাণদিগের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, যে জমি উৎপত্তির কতখানি পর্য্যন্ত মাত্র গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে

দাবী করিতে পারেন এবং কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্ম্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্য্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না,—ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি মহা শুভদিন যেদিন এরূপ বাণী ভারতবর্ষীয় কৃষাণ প্রজাদিগের প্রতি উচ্চারিত হইবে। ভূপৃষ্ঠে অন্য কোন প্রজার ইহার এতটা আবশ্যক নাই।···

জমিদারদিগের পক্ষে অর্দ্ধ ভূমিকরের নিয়ম

আবেদনকারীদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব এইরূপ ছিল:—যেখানে ভূমিকর জমিদারে দেন, সেখানে যে সকল জমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, এরূপ স্থলে সর্ব্বত্রই ১৮৫৫ সালের সাহারাণপুর-বিধি প্রচলিত থাকা উচিৎ—যাহা দ্বারা প্রকৃত প্রজাকরের অর্দ্ধেক গভর্ণমেণ্টকে দেয় করের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসির গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপিত এবং প্রচারিত সাহারাণপুর নিয়মাবলীর ৩৬শ নিয়ম এইরূপ—

"কোন সম্পত্তির আয় সূক্ষ্মরূপে প্রায়ই নিশ্চয় করা যায় না কিন্তু খরচ বাদে গড় আয় সম্বন্ধে আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ইহা দ্বারা কর নির্দ্ধারণ অতিরিক্ত দাঁড়াইতে পারে, কারণ প্রকৃত গড় আয়ের দুই তৃতীয়াংশ কোন ব্যক্তি বা সমাজ বহুকাল ধরিয়া সহজে দিয়া উঠিতে পারেন না, এইজন্য গভর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদিগের প্রতি আদেশের ৫২ প্যারায় লিখিত নিয়ম এই পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যে, খরচ বাদে গড় আয়ের অর্দ্ধাংশের মধ্যেই রাজার দাবী সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে প্রত্যেক সম্পত্তির গড় উৎপত্তির অর্দ্ধাংশই রাজকররূপে লওয়া হইবে। কিন্তু এই বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে কালেক্টরের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সাবধানে নির্ণীত খরচ বাদ আয়ের, পূর্ব্বের ন্যায় দুই তৃতীয়াংশ নহে, অর্দ্ধাংশ মাত্রই গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হইবে। যে জমি বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার আয় সূক্ষ্মরূপে জানিবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উক্ত আদেশাবলীর ৪৭ হইতে ৫১ প্যারায় যেরূপ সাবধান হইবার কথা বলা হইয়াছে তদ্বিষয়ে কালেক্টরের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।"

উক্ত নিয়মের মধ্যে খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধির পর সম্পত্তির সম্ভাবিত আয় সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা নাই। "খরচ বাদ গড় আয়" "প্রকৃত গড় আয়" এবং "সাবধানে নিরূপিত খরচ বাদ আয়" এই কথা এবং এইরূপ কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়া মাত্র থাকিতে পারে না। লর্ড ডালহৌসির গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তির তৎকালীন প্রকৃত আয়ের বিষয়ই ভাবিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সম্ভাবিত আয়ের বিষয় নহে।

এই রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত, এবং কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অন্যায়রূপে এড়াইয়া মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব কিরূপে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল তাহা মিঃ জে. বি. ফুলারের স্বাক্ষরিত ১৮৮৭ সালের ১৮ই মে তারিখের একখানি পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তখন যেরূপ কর নিরূপণের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রদেশের কোন অংশে যে কর্ম্মচারী রাজস্বের বৃদ্ধি সঙ্গত মনে করেন, এবং তাহাই ঘটাতে চাহেন, তাহার পক্ষে আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশের মধ্যে রাজস্বকে সীমাবদ্ধ করে এমন রাজনিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা অসম্ভব ছিল, যদি না আয় শব্দটাকে অত্যন্ত শিথিল এবং অনিশ্চিত অর্থ প্রদান করা হইত। কার্য্যতঃ, প্রত্যেক মহালের আয় অর্থাৎ খাজনামূল্য কতকগুলি গড় তালিকা দৃষ্টে সম্ভাবিত অনুমানের তুলনা হইতে নির্দ্ধারণ করা হইত; কোনও গ্রামে, যাহাতে ভূমির বিশেষত্বজাত বিভিন্ন হারের ভূমিকর পাওয়া যাইত, তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকর পক্ষে উক্ত-প্রকার করের হার ধরিয়া যে অনুমিত আয়ে পৌছান যায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানসমূহের মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রধান। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমিকর উক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইলে ভূস্বামীগণের তরফে খাজনার নূতন বন্দোবস্তের যে যোগাড় করা হইত তাহা দ্বারা তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনা কতদূর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত, তাহারই উপর, উক্তরূপে সরকারকল্পিত মহালের আয়ের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিত কিনা তাহা নির্ভর করিত।

"উপরন্তু, ইহাও বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, সম্প্রতি যেরূপ বন্দোবস্ত বিধানে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে আইন দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে গতবারের বন্দোবস্তের সময় যে প্রকারে আয়ের অর্দ্ধাংশ করগ্রহণেব নিয়ম অন্যায় কৌশলে ভঙ্গ করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

অর্দ্ধাংশ নিয়ম খাটাইবার সময় এখন আর প্রকৃত ও নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত মূল্য মহালের খাজনা মূল্য বলিয়া ধরিলে চলিবে না।"

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই ফুলার সাহেবই এখন ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এবং লর্ড কার্জ্জনের "ল্যাণ্ড রেজলিউশন" স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং সেইজন্যই ১৮৮৭ সালে যাহাকে তিনি নিজে অর্দ্ধ-উৎপত্তি নিয়মের ব্যতিক্রম করা বলিয়াছেন তাহাকেই ১৯০২ সালে সঙ্গত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফুলার সাহেব একজন উপযুক্ত এবং গুণশালী কর্ম্মচারী, ভারতবর্ষের রাজস্ব-কার্য্যে তাঁহার বিস্তর বহুদর্শিতা আছে, এবং তিনি যে উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু হায়! আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ১৮৮৭ সালে তিনি নিজে যাহাকে রাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজনিয়ম ভঙ্গ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন ১৯০২ সালে তাহাকেই সঙ্গত প্রমাণ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ঐ উচ্চপদের একটি সর্ব্ব প্রথম কার্য্য হইবে।"

১৯০২ সালে তিনি এইরূপ লিখিতেছেন :—

"অতএব যাহা আদায়ের অর্দ্ধাংশ নিয়ম বলিয়া জ্ঞাত, তাহা যে কোথাও জমিদারদিগের সমগ্র নগদ আদায়ের অর্দ্ধাংশের অনধিক মাত্র সেই জিলা হইতে প্রাপ্য রাজস্বরূপে গ্রহণ করিতে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করে, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্তই ভুল। এ বিষয়ে যে কোন কঠোর আজ্ঞা নাই শুধু তাহাই নহে, কিন্তু আদায় কথাটির যে অর্থ তখন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীকে প্রকৃত নগদ খাজনা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিচালন করিতে, ভবিষ্যতে সম্ভাবিত আয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিতে, যে প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিশেষ সত্ত্বের অধিকারী এরূপ প্রজার জমির আয় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে, এবং যেখানে জমি কেবলমাত্র চাষি-জমিদারের অধিকৃত সেখানে "স্থির" অথবা উদ্বাস্ত জমির কর মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ইহাই দাঁড়াইত যে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব কর্ম্মচারিদিগের কথিত ও কল্পিত আদায়ের অর্দ্ধেক মাত্র হইলেও সচরাচর প্রকৃত আদায়ের অর্দ্ধাংশের অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গ্রাস করিত।"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যাহা রাজবিধির ব্যতিক্রম বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছিল, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাহারই এইরূপ সমর্থন চেষ্টার কোন প্রকার সমালোচনাই

অপ্রীতিকর হইবে। সন্তোষের বিষয় এই যে রাজবিধির অজ্ঞতা জন্যই হউক বা ইচ্ছাজনিতই হউক উক্ত প্রকার অন্যায় করনির্দ্ধারণ প্রথা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইদানীন্তন উৎকৃষ্টতর প্রথা পূর্ব্বোক্ত ল্যাণ্ড রেজলিউশনে বর্ণিত হইয়াছে।

"যাহা হউক সম্প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর সমভাবেই কমিয়া আসিতেছে, উত্তর-পশ্চিম এবং অন্যান্য জমিদারী প্রদেশে জমির "সম্ভাবিত" আয় এখন আর গণ্য করা হয় না। জমিদারকৃত জমির উন্নতি, ফসলের অনিশ্চয়তা ও স্থানীয় অবস্থার জন্য কর নির্দ্ধারণে কিঞ্চিৎ ছাড় দেওয়া হইয়া থাকে। এবং রাজস্ব ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আয়ের উপরই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ভূম্যধিকারীর নিজ খাসের ও প্রজাবিলি জমির ন্যায্য খাজনা উক্ত আয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভূমিকর এইরূপে জমিদারের পক্ষে হ্রাস করিয়া গড়ে আয়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম করা হইতেছে। অযোধ্যায় পুনর্বন্দোবস্ত, যাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তাহাতে ভূমিকর গড়ে আয়ের শতকরা ৪৭ অংশেরও কম দাঁড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ইংরাজশাসনে শাসিত মধ্যপ্রদেশ, যেখানে মারাট্টাশাসনকাল হইতে প্রচলিত ভূমিকর, কোনও কোনও স্থলে, প্রকৃত আয়ের শতকরা ৭৫ অংশ গ্রাস করিত, সেখানেও উক্ত কর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহা এখনও উত্তর পশ্চিম-প্রদেশের সাধারণতঃ প্রচলিত অতি সঙ্গত ও স্বল্পহারে এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। কালে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যে অধিকতর শ্রম ও অর্থনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ আরও হ্রাস হইবে আশা করা যায়; এবং ইহারই মধ্যে (মধ্যপ্রদেশের রিপোর্টে ইহা দেখান হইয়াছে) উক্ত প্রদেশের উত্তরস্থ তিনটি জেলায় বহুকালব্যাপী বন্দোবস্তের শেষে যে সহসা করের অতিবৃদ্ধি সম্ভাবিত হয়, তাহারই প্রশমনমানসে, সম্প্রতি নূতন কর নির্দ্ধারণে আদায়ী খাজনার শতকরা ৫০ অংশ ভূমিকরের হার স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উড়িষ্যায় গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্যাংশের ক্রমসংক্ষেপ আরও স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। ১৮৮২ সনে সরকারী স্পষ্ট আদেশক্রমে ভূমিকর আয়ের শতকরা ৮৩$\frac{3}{10}$ অংশ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল; ১৮৩৩ সনে উহাকে শতকরা ৭০।৭৫ অংশে নামাইয়া আনা হইয়াছিল; ১৮৪০ সনে শতকরা ৬০ অংশে; আর সেদিন মাত্র যে পুনর্বন্দোবস্ত শেষ হইল তাহাতে উহা শতকরা ৫০$\frac{1}{2}$ অংশে দাঁড়াইয়াছে।"

মহামান্ত বড়লাট বাহাত্বর শেষাংশের মন্তব্যগুলি সম্ভবতঃ আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা হিসাবে প্রকাশ করেনই নাই ; কিন্তু তথাপি আমার বোধ হয় আমি ন্যায়তঃ যৎকিঞ্চিৎ কৃতিত্ব গ্রহণ করিতে পারি। কেন না, উড়িষ্যার বন্দোবস্ত অ্যাক্‌টিং কমিশনাররূপে আমারই পর্য্যবেক্ষণাধীনে সংসাধিত হয়, এবং গভর্ণমেণ্ট সঙ্গত নিয়মে বন্দোবস্ত বিধান করিবার এই অনুমতি দানের সময় আমার মন্তব্য ও পরামর্শলিপি সরকার বাহাত্নরের সম্মুখে ছিল।

মোটামুটি ও সাধারণতঃ বলিতে গেলে ভারত গভর্ণমেণ্ট আবেদন পত্রে উল্লিখিত নিয়ম স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু উহাকে বিধিবদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। সরকারী রেজলিউশনে বলা হইতেছে—

"এই সারসংগ্রহে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে যদিও শতকরা ৫০ অংশ কুত্রাপিও নিশ্চয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধিরূপে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি সমস্ত স্বল্পকালের জন্য বন্দোবস্তী জমিদারী জেলার সর্ব্বত্রই উক্ত অংশের নিকটস্থ হইবার ক্রমশঃবর্দ্ধিত চেষ্টা বরাবরই ছিল ও আছে, এবং অসাধারণ অবস্থাধীনে উহাপেক্ষা অনেক অল্পাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। যে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মতলব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত এবং যাহাতে, স্থানীয় অবস্থাগুণে সঙ্গত ও আবশ্যক না দাঁড়াইলে, কার্য্যগত সমব্যবহার এতই সাধারণ তৎসম্বন্ধে কোনও নূতন নিয়ম প্রকাশ করা গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক মনে করেন না।"

আবেদনকারিগণ এই মন্তব্য প্রচারে এক প্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কেন না ইহা অবশেষে সম্ভাবিত বা ভবিষ্যৎ খাজনা আয়ের অংশ হিসাবে সম্পত্তির ভূমিকরনির্দ্ধারণ প্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্জন প্রচারিত করিতেছে। লর্ড কার্জ্জনের গভর্ণমেণ্ট আরও একটু দৃঢ়ভাবে এবং ভাষায়--লর্ড ডালহাউসির গভর্ণমেণ্ট ব্যবহৃত প্রমাদসম্ভাবনাশূন্য স্পষ্ট বাক্যে—অর্দ্ধাংশ ভূমিকরনিয়ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে বর্ত্তমান রাজ্যপরিচালক মহোদয়গণের যশোবৃদ্ধিই হইত এবং ভারতবাসিগণ সেই স্পষ্ট আশ্বাস লাভ করিত, যাহা তাহাদের পক্ষে এতই আবশ্যক!

সকল বন্দোবস্তেই ৩০ বৎসরের নিয়ম

এই বিষয়ে লর্ড কার্জ্জনের মন্তব্যেও আমাদিগের আশার কারণ আছে। আবেদনকারীদিগের প্রস্তাব ছিল যে কোনও প্রদেশেই ভূমিকরের পুনর্বন্দোবস্ত

৩০ বৎসরের কমে করা না হয়। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের রেজলিউশন এইরূপ।

"ইহার পর যে প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহা এই যে, অচিরস্থায়ী বান্দোবস্তী স্থানে কোনও বন্দোবস্তকাল ৩০ বৎসরের ন্যূন না হয়। সংক্ষেপে বন্দোবস্তের ইতিবৃত্তের সারসংগ্রহ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, বোম্বাইয়ের ডিরেক্টরসভা সুদূর ১৮৩৭ সনে ৩০ বৎসর বন্দোবস্তকাল নির্দ্দিষ্ট করেন। তথা হইতে ইহা মান্দ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে প্রচারিত হইয়া গত অর্দ্ধশতাব্দীকাল চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৭ সনে উড়িষ্যা বন্দোবস্তের বৃদ্ধির সময় এবং ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সনের মধ্যে নির্দ্ধারিত মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ বন্দোবস্তেরই গ্রাহ্যকরণ সময়ে উক্তনিয়মেরই অনুসরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কখনই পঞ্জাবে সাধারণতঃ প্রচলিত হয় নাই; উক্তপ্রদেশের অধিকাংশেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পকাল ২০ বৎসরই স্বীকৃত নিয়মরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮০৫ সনে ভারতসচীব মহোদয় এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা ও বিচার করিয়া চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়াছিলেন যে ৩০ বৎসরই মান্দ্রাজ, বম্বে ও উত্তরপশ্চিম বিভাগে বন্দোবস্তের সময়রূপে চলিতে থাকিবে, পঞ্জাবে ২০ বৎসরই সাধারণ নিয়ম হইবে (কোনও কোনও স্থলে ৩০ বৎসরও গ্রাহ্য হইবে), এবং মধ্যপ্রদেশেও ২০ বৎসর। উড়িষ্যায় সম্প্রতি যে পুনর্বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তকাল গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও আসামের ন্যায় পিছুপড়া স্থানে এবং অসাধারণ অবস্থায়,—যেমন সিন্ধু প্রদেশে অল্পকালস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদিত হইয়া থাকে, এই পার্থক্যের কারণ সকলেই জানেন এবং সহজবোধ্য। যেখানে ভূমি সম্পূর্ণরূপে কর্ষিত হইয়াছে, কর সুসঙ্গত, ও কৃষিফল অতিক্রম হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনাধীন নয়, সেখানে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য প্রতি ৩০ বর্ষে অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের জীবিতকালে একবার মাত্র পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইলেই যথেষ্ট। যেখানে বিপরীত অবস্থার প্রাবল্য, বিস্তর জমি পতিত আছে, কর স্বল্প এবং ফসলের পরিমাণ অতি হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত, অথবা যেখানে রাস্তা, রেলপথ ও খাল নির্ম্মাণবশতঃ বা প্রজাসংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা ফসলের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য ত্বরিতপদে সম্পদোন্নতি ঘটিতেছে, সেখানে এত দীর্ঘকাল পুনর্বন্দোবস্ত ফেলিয়া রাখিলে প্রজাদিগেরও ক্ষতি হইয়া থাকে—কেন না সহসা ও এককালীন খাজনার অতিবৃদ্ধি সহ্য করা তাহাদের অসাধ্য,—এবং সাধারণ ট্যাক্সদাতারও

ক্ষতি হইয়া থাকে, কেন না কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য বর্দ্ধিত কর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দোবস্তের ৩০ বৎসরাপেক্ষা স্বল্পকালের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রাবল্যের সহিত আজকাল প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না, এবং আজকাল পারিলেও সময়ের গতিতে সেই প্রয়োগের প্রাবল্য হ্রাস হইয়া আসিবে কি না, এ দুইটি অতি গুরুতর প্রশ্ন এবং কোন্ উপযুক্ত সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সযত্ন মনোনিবেশ করিবেন।"

শেষ কথাটিতে আমাদের যৎপরোনাস্তি আশার সঞ্চার হইয়াছে। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ "পিছুপড়া স্থান" নয়; তাহারা অর্দ্ধশতাব্দী বৃটিশ শাসনে আছে; বিশিষ্ট রেলপথাবলী তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়াছে; তাহাদিগকে বারম্বার অবন্দোবস্তাধীন করা হইয়াছে। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশও এখন ৩০ বৎসর নিয়ম কেন স্পষ্টতঃ ও চূড়ান্তরূপে প্রসারিত হইবে না তাহার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা সত্বেও প্রত্যেক পুনর্বন্দোবস্তই জনসাধারণের পীড়াদায়ক; স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্তে উন্নতির সর্ব্বপ্রবৃত্তিই এবং উদ্বৃত্তির সর্ব্বসম্ভাবনাই লোপ করিয়া দেয়; দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ও কৃষাণ উভয়কেই আশা ও উৎসাহ প্রদান করে, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণের অর্থ এবং কর্ম্মচেষ্টা ও সাহস বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণেই উত্তর ভারতে ১৮৩৩ সন হইতে অর্থাৎ উত্তর ভারত বৃটিশ শাসনাধীনে আসিবার একপুরুষকাল পরেই, দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং সেইরূপ দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত বোম্বাইয়ে ১৮৩৭ সনে, অর্থাৎ শেষ পেশওয়ার রাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইবার ২০ বৎসর মাত্র পরেই, করা হইয়াছিল। নিশ্চয়ই পঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে অর্দ্ধশতাব্দী বৃটিশশাসনের পর স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি এখন আর বর্ত্তমান নাই; এবং লর্ড কার্জ্জন যে ভারত-সচীবমহোদয়কে তাঁহার ১৮৯৫ সনের রায়ের পুনর্বিচার করিতে ও এই দুইটি প্রাচীন ও সুব্যবস্থিত প্রদেশে ৩০ বৎসরের নিয়ম প্রসারিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন এরূপ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কৃষকদিগের করবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করা

এ বিষয়ে আবেদনকারীদিগের প্রস্তাবিত নিয়ম এই যে যেখানে ভূমিকর কৃষক প্রজার নিকট পাওয়া যায়, সেখানে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি অথবা গভর্ণমেণ্টের

নিজ খরচায় প্রস্তুত খাল প্রভৃতির দ্বারা ক্ষেত্রের জলসেচসুবিধাসম্ভূত জমির শ্রীবৃদ্ধি—এই দুই কারণ ব্যতীত কোনও রূপ করবৃদ্ধি করা হইবে না।

যে সকল স্পষ্ট ও সঙ্গত কারণে ভূমিকর বৃদ্ধি করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট করাই আবেদনকারিগণের অভিপ্রায় ছিল। জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে এ বিষয়ে এই প্রকারের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঙ্গলার ভূমিকর আইনে বিধিবদ্ধ আছে, এবং এই সকল স্পষ্ট ও বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন প্রকার করবৃদ্ধিই আদালতে মঞ্জুর হয় না। কৃষি প্রজার নিকট গভর্ণমেণ্টের ভূমিকরের দাবী সম্বন্ধে সেরূপ কোনও স্পষ্ট ও বিশিষ্ট করবর্দ্ধন কারণ বিধিবদ্ধ করা হয় নাই, এবং এ বিষয়ে আদালতে কোন প্রকারের নালিস মঞ্জুর নয়। ইহার ফল এই হয় যে, যে সকল কৃষিজীবিগণ গভর্ণমেণ্টকে সাক্ষাৎ স্বরূপে ভূমিকর প্রদান করে, তাহারা চিরন্তন অনিশ্চয়তার অবস্থায় বাস করে; তাহারা জানে না কি কারণে সরকার বাহাদুর আগামী বন্দোবস্তের সময় করবৃদ্ধির দাবী করিবেন, তাহারা বুঝিতেই পারে না কেন সরকারী দাবী বৃদ্ধি করা হইল। এই স্থলটি লিপিবদ্ধ করিবার সময়ই সম্মুখস্থ একখানি সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে মালাবারের সম্প্রতিকৃত বন্দোবস্তে ভূমিকর, শতকরা, পলেঘাটে ৮৫ অংশ, কালিকটে ৫৫ অংশ, কুরুম্ব্রানাটে ৮৩ অংশ ও ওয়ালাভানাডে ১০৫ অংশ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। আমার জ্ঞানগোচরে ভারতে কোনও জমিদার কোনও বেসরকারী জমির পুনর্বন্দোবস্তে এরূপ ভয়ানক করবৃদ্ধি কস্মিনকালেও করেন নাই; এবং এরূপ করবৃদ্ধি সরকারের খাস প্রজাদিগকে চিরন্তন ও নিরবছিন্ন দৈন্যের অবস্তায় নিশ্চয়ই রাখিবে। আরও অধিক অমঙ্গল এই যে প্রজারা জানে না ও বুঝিতেই পারে না, সে কারণগুলি কি যাহার জোরে সরকার বাহাদুর পুনর্বন্দোবস্তকালে এরূপ করবৃদ্ধি দাবী করেন, এবং এই অনিশ্চয়তা সর্ব্বপ্রকার কৃষিচেষ্টাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রবৃত্তিকে মরণমুখে আনীত করে। আবেদনকারীগণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে সরকারী খাস প্রজারা বেসরকারী প্রজাদের মত নিরাপদ অবস্থায় সমুন্নীত হয়। ইহা অপেক্ষা সঙ্গত ও ন্যায্য প্রস্তাব আর হইতেই পারে না; এবং সরকার বাহাদুর জমীদারের কার্য্যের বিরুদ্ধে যে সীমাসংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অতি ন্যায্য ভাবেই করিয়াছেন, সেই সীমাই নিজ কার্য্যের বিরুদ্ধেও স্থাপিত করিতে গভর্ণমেণ্টের ইতস্ততঃ কারা অনাবশ্যক ও অনুচিত।

অস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রদেশে আজকাল যে অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট ছায়াময় কারণে ভূমিকর বর্দ্ধিত করা হইয়া থাকে তাহা বোম্বাইয়ের প্রথা সম্বন্ধে মল্লিখিত প্রকাশ্যপত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

"দক্ষিণের কৃষাণ সম্বন্ধে এই ঘটে যে শান্তির সুখসৌভাগ্য ও সুসভ্য রাজশাসনের উপকারপুঞ্জ হতভাগ্যের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে, কেন না, উন্নতিপ্রাপ্ত রাজপথ ও দেশের সাধারণ অগ্রসরণ করবৃদ্ধির কারণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ত্মরাজি ও গমনাগমন ও সম্বাদাদির সুবিধায় যদি উৎপন্ন ফসলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট কারণে করবৃদ্ধি ন্যায্য ও সঙ্গত। কিন্তু যদি ইঁহাতে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষাণ তদ্দ্বারা কি উপকার লাভ করিল এবং তাহার 'ধনশালী প্রতিবেশী' মহোদয় রেলে যাতায়াত করিতে পারেন বা তাহার সুদখোর মহাজন মহাশয় হাতের কাছেই দেওয়ানী আদালতের সুবিধা ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পাইয়াছেন বলিয়া তাহার দেয় কর কেন বর্দ্ধিত করা হইবে? দেশের সাধারণ উন্নতিতে কৃষাণের যেটুকু প্রকৃত সুবিধা লাভ ঘটে তাহা ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতেই লক্ষিত হয়, এবং তাহাই ভূমিকর বৃদ্ধির একটি ন্যায্য ও বিধিসম্মত কারণ। যখন ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই তখন করবৃদ্ধির এক অতিরিক্ত কারণ যোগাড় করিয়া লওয়ার অর্থ এই যে কৃষাণ বেচারা যে উপকার নিজে কোনওরূপে ভোগ করিল না তাহারই জন্য তাহাকে করদানে বাধ্য করা, এবং ইহাতে প্রতি বারের বন্দোবস্তের পর তাহাকে দীনতর করিয়া তোলা হয়।"

এ যুক্তি আমার নয়; এই প্রকারের যুক্তি বর্ত্তমানকালে যত রাজপ্রতিনিধি ভারতাভিমুখীন হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চসহানুভূতিদীপ্ত ও উদারহৃদয় মারকুইস্ অফ্ রিপন মহোদয়ের করুণ হৃদয়েই উদিত হইয়াছিল। সুদূর ১৮৮২ সনে রিপন বাহাদুর একটি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একবার জরিপ ও বন্দোবস্ত করা স্থানে ফসলের মূল্যবৃদ্ধিরূপ ন্যায্য কারণ ব্যতীত ভূমিকর কোনও প্রকারে ও কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হইবে না। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পুরাকালে ডিরেক্টার সভা যেরূপ ভারতকর-সমূহের চিরন্তন ও অবিশ্রান্ত বৃদ্ধির জন্য অতি ব্যাকুল ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তদ্বিষয়ে তেমনি অতি ব্যাকুল ইণ্ডিয়া অফিস লর্ড রিপনের সহজ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর নিয়ম নামঞ্জুর করিয়া, ভারতপ্রজাকে পুনর্ব্বার অনিশ্চয়তা ও

নৈরাশ্যতলে নিমজ্জিত করিলেন। এই মারাত্মক ও নৈতিক বিকৃতিবাহী অনিশ্চয়তার দূরীকরণ ও গভর্ণমেণ্ট কি কি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট কারণে ভূমিকরের বৃদ্ধির দাবী করেন কৃষাণগণকে তাহা জানিতে দেওয়াই আবেদনকারীদিগের অভিপ্রায় ছিল। সেইজন্য তাঁহারা লর্ড রিপনের নিয়মের মত একটি নিয়ম সংগঠিত করিয়াছিলেন ও আশা করিয়াছিলেন, যে বেসরকারী জমিদারগণের অধীনস্থ কৃষিজীবীদের রক্ষার যে উপায় করা হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের নিজের অধীন কৃষীপ্রজাদের পক্ষেও সেই সংরক্ষণোপায় প্রসারিত করার আবশ্যক লর্ড কার্জ্জন বুঝিবেন। কার্জ্জন বাহাদুর তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন লিখিয়াছেন—

"যে ফসলাদির দামের সাধারণ গড় তালিকা নিজেই ভূমিমূল্যাদি নির্দ্ধারণের একটি প্রমাদময় ও আংশিক উপায়মাত্র, তাহা হইতে অনুমিত ভূমিমূল্যবৃদ্ধি ব্যতীত আর সমস্ত প্রকারের উক্ত বৃদ্ধির অংশবিশেষে গভর্ণমেণ্টের অধিকার অস্বীকার করার ফল এই হইবে যে কতকগুলি ব্যক্তিকে তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত নয় এরূপ বৃদ্ধি অকারণে ও অকাতরে অর্ঘ্যদান করা হইবে।"

ব্যাপারটিকে এরূপ চক্ষে দেখা অনুদার ও রাজনীতিবিশারদের অযোগ্য ক্ষুদ্র দৃষ্টির ফল। এবং এস্থলে ইহা ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে যে কৃষাণকুলকে এরূপ বৃদ্ধি "অর্ঘ্যদান" না করিলে তাহাদিগকে সেই চিরন্তন দুর্গতি ও দারিদ্র্যে মগ্ন রাখা হইবে যাহা ভারতে বৃটিশ শাসনের চিরকলঙ্ক।

সর্ব্বপ্রকার স্থানীয় সেস্ সীমাবদ্ধ করা

আবেদনকারীদিগের শেষ প্রস্তাব এইরূপ ছিল—একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হউক, যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্থানীয় সেসের দ্বারা ভূমিকরকে ভারাক্রান্ত করিতে দেওয়া হইবে না; প্রস্তাবিত সীমা ছিল শতকরা ১০ অংশ।

১৮৫৫ সনে যখন নিয়ম করা হইয়াছিল যে উত্তর ভারতে সরকারী ভূমিকর সম্পত্তির প্রাপ্য খাজনার অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং সার চার্লস উড্, যিনি পরে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স হইয়াছিলেন, তিনি যখন নিয়ম করেন যে দক্ষিণ ভারতে ভূমিকর খরচবাদ আয়ের, যাহাকে ইকনমিক্ রেণ্ট

বলা হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ হইবে, তখন ভূমিকরের উপর যোগ করিয়া দিবার সেস্‌সমূহ হয় অতি তুচ্ছ ছিল, নয় মোটেই ছিল না। তাহার পরে ঐ সেস্‌গুলি বহুগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভূমিকরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তযুক্ত বঙ্গ বিভাগে ঐ সেস্‌গুলি জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর ধরা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তহীন, অন্যান্য বিভাগে উক্ত সেস্ ভূমিরাজস্বের উপর ধরা হয়।* আবেদনকারিগণ সাগ্রহে প্রতিপন্ন করেন যে এই সেস্‌গুলির একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। সেসের নাম করিয়া ভূমিকরের উপর ক্রমাগত এবং সীমা ও বাধাশূন্য হইয়া যথেষ্ট কর সংযোগ করিবার ক্ষমতা যদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভূমিকর খাজনার অর্দ্ধাংশে বা উদ্ধৃত্ত আয়ের (ইকনমিক্ রেণ্টের) অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ করায় কিছুমাত্র লাভ নাই। প্রাইমারি অর্থাৎ নিম্নতম সাধারণ-শিক্ষাদান ও পোষ্ট অফিসের জন্য করগ্রহণ সঙ্গত ও ন্যায্য; কিন্তু তাহার জন্য ভূমিকরের বৃদ্ধি করা অন্যায়। ভূমিকরকে খাজনার অর্দ্ধাশে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার পর সেসের ছদ্মবেশের আবরণতলে সেই ভূমিকরেরই কলেবরে সীমারহিতভাবে পুষ্টিযোগ করিয়া যাওয়ায়, প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা বাক্যটি শোনায় ঠিক, কিন্তু প্রাণে মারা হয়।

অতএব আশা করা যায় যে, যদি ওরূপ সেস্ গ্রহণ করাই হয়, তাহা হইলে সেগুলি ভূমিকরের কোন একটি অংশের ভিতর সীমাবদ্ধ হইবে যে সীমা কিছুতেই ও কখনই অতিক্রম করা হইবে না, এবং ভূমিকরের শতকরা ১০ অংশ এক প্রকার ন্যায্য সীমা। গভর্ণমেণ্টের রেজলিউশনের নিম্নোদ্ধৃতাংশে একটি অতি ক্ষীণ আশার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

"সিন্ধু, মান্দ্রাজ ও কুর্গ ব্যতীত আর কোনও প্রদেশেই স্থানীয় ট্যাক্স আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে না; এই তিনটি প্রদেশে ঐ সকল উপরি কর প্রজার দেয় রাজস্বের যথাক্রমে শতকরা ১২$\frac{1}{8}$, ১০$\frac{1}{2}$ ও ১৩$\frac{1}{8}$ অংশ জমির প্রকৃত করমূল্যের উপর গণনা করিয়া দেখিলে ইহা যে প্রচুর পরিমাণে স্বল্পতর অংশ প্রমাণিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ অভিমত এই যে, উপযুক্তরূপে চাপাইয়া

* আমি ভ্রমক্রমে ১৯০০ সনে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে মধ্যপ্রদেশে সেস্‌সমূহ জমীদারপ্রাপ্য খাজনার উপর ধরা হয়; গভর্ণমেণ্টের রেজলিউশন্ আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। আবেদনকারিগণ কিন্তু এই ভুল এড়াইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা জানেন যে বঙ্গ ব্যতীত সর্ব্ব-প্রদেশেই সেস্‌সমূহ ভূমিরাজস্বের উপর ধরা হয়।

দিলে, স্থানীয় ট্যাক্স যে মোটের উপর গুরুভার বা অতিরিক্ত এরূপ বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই ; বরং সাধারণতঃ ইহা এখনই আবেদনকারিগণ যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করাইতে চান, তাহার নীচেই পড়িয়াছে। কিন্তু উহার বণ্টন যে অনেক সময় অন্যায় হয়, এবং জমিদারগণ যে আইনকর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজ স্কন্ধে স্থাপিত বোঝা প্রজার স্কন্ধে কৌশলে নামাইয়া দেন এরূপ সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে। দেশস্থ এত লোকের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অবস্থায় এই অবিচারের যথেষ্টরূপ নিরাকরণ অসম্ভব। এবং এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যে সমস্ত ট্যাক্স রাজবিধির ইচ্ছাতিরিক্ত কঠোরভাবে কৃষি প্রজাপুঞ্জকে প্রপীড়িত করে, উপস্থিত হইলেই সুবিধাক্রমে সেই ট্যাক্সগুলির প্রশমন চেষ্টা ভাল কি না? এরূপ শুশ্রূষার পথ পাইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট সুখী হইবেন।”

ভারতী :

আষাঢ়, ১৩০৯

পরিশিষ্ট-২

ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ

আমরা কৃষিজীবী। আমাদের যে নানারূপ শিল্প ও কারুকার্য্য ছিল, তাহা একে একে গিয়াছে। তাঁতীদিগের অন্ন জুটে না, ঢাকা ও মৈমনসিংহ অঞ্চলে তাঁতীদিগের পুরাতন গ্রাম সকল অরণ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। তাহাদিগের কৃত পুষ্করিণী দীঘি শুকাইয়া গিয়াছে, দেবালয়-সমূহ ইষ্টকাবশেষ হইয়া গিয়াছে, ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, তাঁতীগণ দেশ ছাড়িয়া সহরে চলিয়া গিয়া সামান্য চাকুরী দ্বারা বা সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গদেশে, বাঙ্কুরা বর্দ্ধমান অঞ্চলে সহস্র সহস্র লোক রেশমের কার্য্যে এবং লাক্ষা আদি Shell lac, lac dies, প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাও গিয়াছে। তাহাদিগের কারখানা সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। আমাদিগের প্রত্যহ ব্যবহার্য্য দ্রব্য ইউরোপ হইতে আমদানি হয়; ধুতি, চাদর, জুতা, মোজা, ছাতি, লাঠি, বাক্স, তোরঙ্গ, খেলনা, দেশলাই, বিছানার চাদর, মশারি সমস্তই বিলাত হইতে আইসে বা বিলাতী দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। ফলতঃ আমাদের সোনা রূপা এবং পিতল কাঁসার দ্রব্যাদি ভিন্ন প্রায় সমস্ত জিনিসই বিলাতী আমদানী।

এইরূপে সমস্ত শিল্পকার্য্যের ধ্বংস হওয়া বশতঃ আমাদিগের কৃষিকার্য্য ভিন্ন আর অবলম্বন নাই। যদি কৃষিকার্য্যটা ভালরূপে চলে, তাহা হইলে ভারতবাসী পেটে ভাত পায়, কৃষকের উপর অধিক খাজনা বসাইলে, সেটাও যায়, দেশের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গদেশে এবং অন্য কোন কোন প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার দরুণ কৃষকদিগের উপর অত্যাচার নাই, তাহাদিগের খাইবার পরিবার সংস্থান আছে, কিছু বাঁচাইবার ও উপায় আছে। মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রজার কর নিরূপণ করেন; তাঁহারা এরূপ কর স্থাপন করিয়াছেন, দেশটা এইরূপে শোষণ করিতেছেন, যে প্রজারা নিরুপায় হইয়াছে; একবার অনাবৃষ্টি হইলেই দুর্ভিক্ষ ও বহু লোকের প্রাণনাশ হয়।

বাঙ্গালা দেশের যে স্থানেই তুমি যাও না কেন, দেখিবে যে ক্ষেত্রের উৎপন্নের ষষ্ঠাংশের অধিক খাজনা আদায় প্রায় হয় না। যে ক্ষেতটার প্রতি বিঘায় আশুধান্য এবং রবি ফসলে বিঘায় ১২ টাকা মূল্যের শস্য হয়, সে জমির খাজনা প্রতি বিঘায় ২ টাকার অধিক নহে। যে উৎকৃষ্ট ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১৫ কি ১৮ টাকা মূল্যের হৈমন্তিক ধান্য হয়, সেখানেও প্রতি বিঘায় ২॥০ টাকা কি ৩ টাকার অধিক খাজনা নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও অনেকটা এইরূপ; তথাকার ছোটলাট সাহেব বিলাতে Currency Committee সভার সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন, যে, ক্ষেতের উৎপন্নের পঞ্চমাংশের অধিক খাজনা রূপে গৃহীত হয় না।

যেখানে গবর্ণমেণ্ট নিজে খাজনা নিরূপণ করেন, সেখানে একটু অধিক সদয় হইয়া খাজনা স্থির করা হইবে, এইরূপ লোকে আশা করিতে পারে। কেন না জমিদারের অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং প্রজার হিতকামনার সর্ব্বদা ভাণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কাজে সে হিতকামনাটুকু দেখা যায় না। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টই অধিকাংশ স্থলে জমিদার, এবং বন্দোবস্ত কার্য্য চিরকালই চলিতেছে। বন্দোবস্ত-কারিগণ বলেন, চাষের খরচ-খরচা বাদ দিয়া, যাহা বাকী থাকে, তাহার অর্দ্ধেক আমরা সরকারী খাজনাস্বরূপ লইব। মনে কর, ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১২ টাকা মূল্যের ফসল হয়; বন্দোবস্তকারিগণ চাষের বাবদ ৪ টাকা বাদ দিলেন, অবশিষ্ট ৮ টাকার অর্দ্ধেক চারি টাকা সরকারী খাজনা রূপে লইলেন। তাহাতেই প্রজারা নিঃস্ব এবং চিরদরিদ্র হইয়া থাকে।

মধ্য প্রদেশে এক শ্রেণীর জমিদার আছেন, তাহাদিগকে "মালগুজার" বলে। মালগুজারগণ প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে কি খাজনা পাইবেন, তাহা সরকারী বন্দোবস্তকারিগণ স্থির করেন। আমাদের পরিচিত ছোটলাট সার এলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী বাহাদুর মধ্য প্রদেশে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রজা মালগুজার উভয়েরই গলায় পা দেওয়া হইয়াছে। প্রজাদিগের নিকট ক্ষেতের ফসলের তৃতীয়াংশের অধিকও খাজনা স্থির করা হইয়াছে, এবং মালগুজারদিগকে বলা হইয়াছে, তোমরা এই খাজনা আদায় করিবে এবং তাহার মধ্যে শতকরা ৫০ কি ৬০ টাকার রাজস্ব এবং ১২॥০ টাকা কর গবর্ণমেণ্টকে দিবে। মালগুজারগণ সে খাজনা আদায় করিতে পারেন না। সে রাজস্বও দিতে পারেন না। দেশে খাদ্য নাই, অর্থ নাই, সম্বল নাই,

একবার অনাবৃষ্টি হইলেই দুর্ভিক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়।

সদয় এবং বিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিগণ দেশের লোককে এই বিপদ্ সমূহ হইতে ত্রাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৬০ সালের দুর্ভিক্ষের পর লর্ড কানিং মহোদয় সমস্ত ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় লর্ড কানিং শীঘ্র মারা গেলেন, এবং তাঁহার প্রস্তাবটি ফলে পরিণত হইল না। তাহার পর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ আর একটি প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাজে যে সকল জেলায় একবার রীতিমত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, তথায় নির্দ্ধারিত কর চিরস্থায়ী করা হউক। তাহার পর যদি ফসলের বাজারদর বাড়ে, নির্দ্ধারিত কর সেই হারে বাড়িবে; যদি বাজারদর কমে, নির্দ্ধারিত কর সেই হারে কমিবে; অন্য কোন কারণে করবৃদ্ধি বা করহ্রাস হইবে না। দুঃখের বিষয় লর্ড রিপণ এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পর এই প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য হইল। পুনরায় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আসামের শাসন-কর্ত্তা কটন সাহেব তথায়ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় সেটিও অগ্রাহ্য হইয়াছে।

যদি যথার্থই লর্ড কার্জ্জন প্রজাদিগের হিতকামনা করেন, তবে প্রজাদিগের রক্ষার্থ এইরূপ একটি বন্দোবস্ত করিবেন। এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে, কেবল মুখের কথায় এবং দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদা তুলিলে, ভারতবাসীর স্থায়ী উপকার হইবে না।

প্রভাত:
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭

নির্দেশিকা